স্মৃতি-কথা

তৃতীয় খণ্ড

শ্রীবিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়

অধ্যাপক, সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, কলিকাতা।

প্রাপ্তিস্থান :—

বিদ্যাসাগর বুকষ্টল
৪১, শঙ্কর ঘোষ লেন,
কলিকাতা—৬

দাশগুপ্ত এণ্ড কোম্পানী
৫৪।৩, কলেজ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

প্রকাশক ঃ
শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
বিদ্যাসাগর বুকষ্টল
৪১, শঙ্কর ঘোষ লেন,
কলিকাতা—৬

মূল্য—ছয় টাকা

কলিকাতা,
১০, বৃন্দাবন মল্লিক লেন,
অক্ষয় তৃতীয়া, ১৩৫৪

প্রিণ্টার—শ্রীসুনীল কৃষ্ণ দে
ডি. এম্ প্রেস
১৬/১/১, বৃন্দাবন মল্লিক লেন,
কলিকাতা—৯

আজ আমার প্রণতি গ্রহণ করো, পৃথিবী,
শেষ নমস্কারে অবনত দিনাবসানের বেদীতলে।
আজ রেখে যাব আমার ক্ষতচিহ্নলাঞ্ছিত জীবনের প্রণতি।
আরও রেখে যাব কয় মুষ্টি ধূলি
আমার সমস্ত সুখদুঃখের শেষ পরিণাম,
রেখে যাব এই নামগ্রাসী, আকারগ্রাসী, সকল পরিচয়গ্রাসী
নিঃশব্দ ধূলিরাশির মধ্যে।

হে উদাসীন পৃথিবী,
আমাকে সম্পূর্ণ ভোলবার আগে
তোমার নির্ম্মম পদপ্রান্তে
আজ রেখে যাই আমার প্রণতি॥

—রবীন্দ্রনাথ।

উৎসর্গ

মাতৃদেবী ৺কিরণ কুমারী দেবীর

শ্রীচরণে,

মা,

তোমার ছয় বৎসর বয়সের সময় পিতৃগৃহ ছেড়ে তুমি আমাদের বাড়ীতে এসেছিলে, তিয়াত্তর বৎসর বয়সে চিরবিদায় গ্রহণ করেছ। এর ভেতরের তোমার ৬৭ বৎসর জীবন আমাদের জন্য অতিবাহিত। সংসারই ছিল তোমার ধর্ম্মক্ষেত্র, কর্ম্মই ছিল তোমার সাধনা. আমার জন্মের পর তোমার যে কঠিন পীড়া হ'য়েছিল, বক্ষে তার ক্ষতচিহ্নই ছিল তোমার পুরস্কার। লোকচক্ষুর অন্তরালে বাঙ্গালী মায়েদের যে নীরব সেবা ও সাধনা শতাব্দীর পর শতাব্দী চলে আসছে আমার মায়ের ভেতর আমি তারই উজ্জ্বল প্রকাশ বারংবার লক্ষ্য করেছি। যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা,—তোমার শ্রীচরণে মাথা রেখে সেই দেবীকে প্রণাম জানাচ্ছি।

সেবক

বিনোদ

সূচীপত্র

স্মৃতি-কথা

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

১৯৪৪

(১)

আমার পঞ্চাশ বৎসর বয়সে "স্মৃতি-কথা"র তৃতীয় খণ্ড আরম্ভ হইল। এই সময়ের (১৯৪৪-১৯৪৯) মধ্যে আমার সংসারী জীবনের কর্ত্তব্যগুলি পরিসমাপ্তির দিকে চলিয়াছে। মানুষ শতায়ু হইলেও তাহার সমস্ত কাজ সম্পূর্ণ হয় না, কিছু কিছু বাকী থাকিয়া যায়,—ইহাই বিধির অলঙ্ঘ্য বিধান। কিন্তু ভগবানের দয়ায় এই ছয় বৎসরের মধ্যে আমার সাংসারিক কার্য্যগুলি শেষ হইয়াছে,—যাহা বাকী থাকিল তাহা আমার "আমাকে" লইয়া,—সে "আমার" উপর আর ইহ-সংসারের দাবী-দাওয়া কিছুই স্বীকার করিব না। তাই এই তৃতীয় খণ্ডের সহিত আমার "স্মৃতি-কথা" প্রকাশ শেষ হইল। আর কিছু লিখিব কি না, লিখিতে পারিব কি না জানি না,—যদিও লিখি তাহা প্রকাশ করিবার উপযুক্ত কি না, উপযুক্ত হইলেও প্রকাশিত হইবে কি না, আমার জীবনকালে অথবা মৃত্যুর পর প্রকাশিত হইবে,—এই সমস্ত

বিচারের ভার আমার কন্যা, ছাত্র ও বন্ধুগণের উপর রহিল। এ বিষয়ে আমার বলিবার কিছু রাখিলাম না।

(২)

১৯৪৪ খৃষ্টাব্দ। বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত গৃহস্থের পক্ষে দুর্ব্বৎসর। রেশনের দোকানে চাউল ১৬৲ টাকার কিছু উপর মূল্যে বিক্রয় হইতেছে, কাটা রুই মাছ ২৷৷৹ টাকা সের, ধুতি ৮৷৷৹ করিয়া দুই জোড়া নিজের জন্য কিনিলাম। সরিষার তৈল ১৷৵৹ সের। কয়লা পাওয়া যাইতেছে না। লুকাইয়া কোন কোন দোকানদার ৩৲ টাকা মণ বিক্রয় করিতেছে। তাহাও ওজনে কম। আলু অপেক্ষাকৃত সস্তা, আড়াই সেরের দাম ৷৷৵৹। ভেজিটেবিল ঘি ১৲ টাকা পাউণ্ড। রেশনের দোকানের চাউল পাঁচ রকম মিশান, ভাঙা, কাঁকর মিশ্রিত, অখাদ্য বলিলেই হয়। সাঁইথিয়া ও বোলপুরের উৎকৃষ্ট চাউল আমার আছে, সুতরাং রেশনের চাউল এখনও কিনি নাই। যুদ্ধের অবস্থা একঘেয়ে হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জার্ম্মানী ও জাপান পূর্ব্বের মত জয়লাভ করিতে পারিতেছে না। ইংরাজ ও আমেরিকা বলিতেছে, শীঘ্রই তাহারা জার্ম্মানী ও জাপানের বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করিয়া তাহাদিগকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিবে কিন্তু এই অভিযানের লক্ষণ এখনও দেখা যাইতেছে না। এদিকে যুদ্ধের তাপে ভারতবর্ষের প্রাণ শুষ্ক হইয়া উঠিয়াছে। এতদিন যুদ্ধ চলিবে এবং ভারতবাসীদিগকে এত দুঃখ সহ্য করিতে হইবে তাহা পূর্ব্বে আমরা ধারণা করিতে পারি নাই।

(৩)

২০শে জানুয়ারী, ৬ই মাঘ, বৃহস্পতিবার হঠাৎ মাত্র দুইদিনের আয়োজনে শ্রীমতী পূর্ণিমার বিবাহ হইয়া গেল। ঘটনাগুলি ধারাবাহিক-ভাবে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

ডিসেম্বর মাসের প্রারম্ভে ঘটক শ্রীযুক্ত সত্যভূষণবাবু পূর্ণিমার একটি সম্বন্ধের সংবাদ দিয়াছিলেন এবং তাঁহার উপদেশমত পাত্রের পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে কন্যা দেখিতে আসিতে অনুরোধ করিতে গিয়াছিলাম। পাত্রের পিতা শ্রীযুক্ত পঙ্কজবিহারী চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমার বাটি হইতে আন্দাজ দশ মিনিটের পথ ৪।৪ রামমোহন রায় রোডে নিজ বাটীতে বাস করেন। আমি ৪ঠা ডিসেম্বর সকাল প্রায় ৮ ঘটিকার সময় তাঁহার বাটীতে পৌঁছিলাম, জনৈক পাচক আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। নব-নির্ম্মিত সুন্দর ত্রিতল বাটী, বাহিরের ঘর বেশ সাজান। কৌচের উপর বসিয়া পঙ্কজবাবুর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া আছি, কাহারও দেখা নাই। লোককে বহুক্ষণ বসাইয়া রাখা বড়লোকের কায়দা, বাটীটি দেখিয়াও পঙ্কজবাবুকে অবস্থাপন্ন বলিয়া মনে হইল। মনে মনে ভাবিলাম বৃথাই এখানে আসিয়াছি, এরূপ অবস্থাপন্ন লোকের বাড়ীতে কন্যার বিবাহ দিবার মত আর্থিক সঙ্গতি আমার নাই। হঠাৎ জানালার বাহিরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবামাত্র সম্মুখের বাড়ীর প্রাঙ্গণে শিবমন্দির লক্ষ্য হইল। বিশ্বনাথ শিব আমার বড়ই প্রিয় দেবতা। সর্ব্বত্যাগী আশুতোষকে মনে মনে প্রণাম করিয়া বলিলাম—'ঠাকুর, তোমার গরীব ছেলেকে এ কোথায় লইয়া আসিয়াছ, এরকম ধনী লোকের সঙ্গে আমি কখনও তাল রাখিতে পারিব না। তুমি সব জান, তবু শুধু শুধু কেন "অভ্যর্থনাভঙ্গের" গ্লানির মধ্যে আমাকে আনিয়া ফেলিয়াছ।' এই কথা মনে হইতেই ঠাকুরের উপর অভিমানে আমার চক্ষে জল আসিল। ক্ষণকাল পরে পঙ্কজবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে কন্যা দেখিতে যাইতে অনুরোধ করিয়া আমি কর্ম্মান্তরে গমন করিলাম।

৫ই ডিসেম্বর, রবিবার কথামত পঙ্কজবাবু বেলা আন্দাজ ৯টার সময় তাঁহার ১২।১৩ বৎসরের একটি কন্যাকে সঙ্গে লইয়া পূর্ণিমাকে দেখিতে আসিলেন, অল্পক্ষণের মধ্যে দেখা শেষ হইল। পঙ্কজবাবু কিছুই খাইলেন না, মেয়েটি চা ও বিস্কুট খাইল। পরে তাঁহাদের মতামত আমাকে জানাইবেন বলিয়া পঙ্কজবাবু বিদায় গ্রহণ করিলেন।

১২ই ডিসেম্বর, রবিবার ঘটক সত্যভূষণবাবু আমার সহিত দেখা করিয়া পঙ্কজবাবুর মতামত জানিবার জন্য রামমোহন রায় রোডে চলিয়া গেলেন, আমি বাড়ীতে বসিয়া নিজের কাজ করিতে লাগিলাম। প্রায় একঘণ্টা পরে সত্যবাবু আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, সেখানে বিবাহ হইবে না, পঙ্কজবাবুর মত নাই। এরূপ নৈরাশ্য প্রায়ই ঘটিয়া থাকে, সুতরাং আমি বিস্মিত হইলেও দুঃখিত হইলাম না।

১৭ই জানুয়ারী, সোমবার। সার্পেনটাইন লেনে ছাত্র পড়াইয়া রাত্রি প্রায় ৯ ঘটিকার সময় বাড়ী ফিরিলাম। বাড়ীতে আসিবামাত্র আরতি বলিল, প্রায় পনর মিনিট পূর্ব্বে জনৈক ভদ্রলোক আসিয়া আমাকে ডাকিতেছিলেন। সেই সময়ে বাহিরের ঘরে পূর্ণিমা আমার বাড়ী ফিরিবার অপেক্ষায় বসিয়াছিল, আরতি রান্নাঘরে কাজ করিতেছিল। পূর্ণিমা ভদ্রলোকটিকে উত্তর দিলে তিনি বলেন, "বিনোদবাবু বাড়ীতে ফিরিলে তাঁহাকে বলিবেন, যে আমি ৪।৪ রামমোহন রায় রোড হইতে আসিতেছি। পঙ্কজবাবুর মধ্যম পুত্রের সহিত তাঁহার মেয়ের বিবাহের কথা বলিতে আসিয়াছিলাম। পঙ্কজবাবুর কনিষ্ঠ পুত্রের বিবাহ ২১শে জানুয়ারী শুক্রবার স্থির হইয়া গিয়াছে। তাঁহার মধ্যম পুত্রের বিবাহ এখন হইবে না ইহাই স্থির ছিল। কিন্তু পঙ্কজবাবুর গুরুদেব ভট্টপল্লী-নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, মধ্যম পুত্রের বিবাহ না দিয়া কনিষ্ঠ পুত্রের বিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ হইতে পারে না।

কিন্তু এদিকে কনিষ্ঠ পুত্রের বিবাহ ২১শে জানুয়ারী স্থির হইয়া রহিয়াছে, সে দিন পিছাইয়া দেওয়া চলিবে না। সুতরাং ২০শে জানুয়ারী পঙ্কজবাবুর মধ্যম পুত্রের বিবাহ দিতেই হইবে। অতএব বিনোদবাবু যদি ২০শে জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার তাঁহার মেয়ের বিবাহ দিতে প্রস্তুত থাকেন তাহা হইলে যেন পঙ্কজবাবুর সহিত শীঘ্র দেখা করেন।” আমি সমস্ত কথা আরতির নিকট শুনিলাম। ইতিমধ্যে ২।৩ জায়গা হইতে পূর্ণিমাকে দেখিতে আসিয়াছিল, সুতরাং পঙ্কজবাবুর কথা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিলাম। একটু স্থির হইয়া দেখিলাম যে, মাত্র দুইদিনের ব্যবধানে টাকার যোগাড় করা, বিবাহের জিনিষপত্র ক্রয় করা, অন্যান্য আয়োজন করা আমার পক্ষে প্রায় অসম্ভব, সুতরাং পঙ্কজবাবুর সহিত তাড়াতাড়ি দেখা করিবার প্রয়োজন নাই। ইহাই স্থির করিয়া নিশ্চিন্ত মনে আহার করিতে বসিলাম। রাত্রিতে শয্যাগ্রহণ করিবার পর পূর্ণিমা ও আরতি অভ্যাসমত আমার পা টিপিতে লাগিল। আমি পূর্ণিমা ও আরতিকে কথায় কথায় বলিলাম যে, এত শীঘ্র দুই দিনের মধ্যে বিবাহের আয়োজন করা অসম্ভব। আরতি সায় দিল। পূর্ণিমার দিকে তাকাইয়া তাহার মতামত জিজ্ঞাসা করায় সে মৃদু হাসিয়া বলিল, “এতো তাড়াতাড়ি কি ক'রে হবে? আপনি একলা মানুষ!” ইহার পর মেয়েরা নিজেদের ঘরে চলিয়া যাইল, আমি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

১৮ই জানুয়ারী, মঙ্গলবার। সকাল বেলা প্রায় ৭৷৷০ টার সময় ভবানীপুরে Lansdowne Road-এ ছাত্র শ্রীমান উমাপ্রসন্ন সান্ন্যালকে পড়াইতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছি। মনে হইল পঙ্কজবাবু বিবাহের প্রস্তাব করিয়া রাত্রিতে লোক পাঠাইয়াছিলেন, শিষ্টাচারের অনুরোধে একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমার অক্ষমতা জ্ঞাপন

করিয়া আমি সেইখান হইতেই Lansdowne রোডে পড়াইতে যাইব। পঙ্কজবাবুর বৈঠকখানায় উপস্থিত হইয়া দেখি, তিনি জনৈক ভদ্রলোকের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, তাঁহার হাতে একখানি রাশিচক্রের কাগজ। আমাকে বসিতে বলিলেন, এবং পূর্ব্ব রাত্রিতেই আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব তিনি আশা করিয়াছিলেন বলিলেন। তারপর তিনি আমাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া দ্বিতলে চলিয়া গেলেন। পঙ্কজবাবু উপরে যাইবার পর আমি জানালা দিয়া বাহিরের দিকে তাকাইলাম—সেই মহেশ্বরের মন্দির, প্রায় মাসাধিক কাল পূর্ব্বের আমার সেই অশ্রুজলে পরিচয়ের দেবতা! প্রায় পনর মিনিট পরে পঙ্কজবাবু ফিরিয়া আসিয়া আমাকে উপরের ঘরে যাইবার জন্য আহ্বান করিলেন।

দ্বিতলের প্রকোষ্ঠে পঙ্কজবাবুর সহিত একটি কৌচের উপর বসিলাম। তিনি পূর্ব্বোল্লিখিত ঘটনাবলী পুনরাবৃত্তি করিয়া আমি বৃহস্পতিবার বিবাহ দিতে প্রস্তুত কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, মাত্র দুই দিনের ব্যবধানে অলঙ্কার প্রস্তুত করা, নগদ টাকা যোগাড় করা এবং অন্যান্য আয়োজন করা আমার পক্ষে সম্ভবপর নহে। তিনি বলিলেন, অলঙ্কার এবং নগদ টাকা সমস্তই বিবাহের পরে সুবিধামত তাঁহাকে দিলেই চলিবে। আমি পুনরায় বলিলাম যে, সর্ব্বসমেত কত টাকা আমাকে এই বিবাহে খরচ করিতে হইবে তাহাও তিনি এ পর্য্যন্ত আমাকে বলেন নাই। পঙ্কজবাবু বলিলেন, তাঁহার দাবী নাই, আমি যাহা স্বেচ্ছায় বরকন্যাকে দিব তাহাই তিনি গ্রহণ করিবেন। আমি বলিলাম যে, নগদ, গহনা, বরাভরণ, ফুলশয্যা, প্রভৃতি সর্ব্বসমেত আমি তিন হাজার টাকা খরচ করিতে পারি। তিনি তৎক্ষণাৎ রাজী হইলেন। আমি বাহিরের শিবমন্দিরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম, মনে হইল ত্রিশূলধারী মহেশ্বর এই বিবাহের যজ্ঞেশ্বর হইয়া দণ্ডায়মান।

করুণার শ্বশুরবাড়ীর সহিত পঙ্কজবাবুর কিছু সম্বন্ধ ছিল তাহা আমি পূর্ব্বে হইতেই জানিতাম। শিবপুরের শ্রীযুক্ত ফকিরবাবু সম্পর্কে করুণার মামাশ্বশুর। করুণার বিবাহের সময় তিনি নিজে দাঁড়াইয়া বর ও কন্যাযাত্রীগণকে খাওয়াইয়াছিলেন, খাদ্যদ্রব্যের অপচয় নিবারণ করিবার জন্য ফকিরবাবু পরিবেশনকারীদিগকে পুনঃ পুনঃ সাবধান করিয়া দিতেছিলেন। আমার প্রতি তাঁহার এরূপ সদয় ব্যবহার তখনই আমাকে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিল। পরেও তাঁহাব সহিত আমার অনেকবার দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছে, আমাদের বাড়ীতে তিনি আসিয়াছেন। এই ফকিরবাবুর পুত্রের সহিত পঙ্কজবাবুব জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ হইয়াছিল। সেই সূত্রে পঙ্কজবাবুর বংশ অথবা অন্যান্য পরিচয় বিশেষ করিয়া লইবার আমার প্রয়োজন ছিল না।

আমি বিবাহে সম্মতি জ্ঞাপন করিলাম। পাত্র শ্রীমান্ সুকুমার B. Com. পর্য্যন্ত পড়িয়া তখন একটি ইংরাজী আফিসে প্রায় ৮০৲ টাকা বেতনে চাকুরী করিতেছিল। পাত্রকে দেখিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে পঙ্কজবাবু সুকুমারকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, আমি তাহাকে দেখিয়া প্রীত হইলাম। এইরূপ অপ্রত্যাশিত ভাবে শ্রীমতী পূর্ণিমার বিবাহের দিন ২০শে জানুয়ারী স্থিব হইয়া গেল।

বেলা প্রায় ৯টাব সময় পঙ্কজবাবুব বাড়ী হইতে বাহির হইলাম, তখন আকাশ পাতাল ভাবিতেছি। পোস্ট আফিসে পূর্ণিমার নামে মাত্র ৩৮০৲ টাকা জমা ছিল, ইহাই আমার সম্বল। তৎক্ষণাৎ কালীঘাটে বড় জামাই ফণীর নিকট যাত্রা করিলাম—সে যদি কিছু টাকা কয়েকদিনের জন্য আমাকে ধার দিতে পারে। ফণীব সেই সময় ভাগলপুর যাইবার কথা ছিল। যদি সে ভাগলপুর গিয়া থাকে তাহা হইলে আমাকে নিতান্ত অসুবিধায় পড়িতে হইবে এই আশঙ্কা পুনঃ পুনঃ মনে উদিত হইতে লাগিল।

কিন্তু বিশ্বজননীর কি অপার করুণা! তিনি যজ্ঞেশ্বর হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, কর্ম্মের ব্যাঘাতের কোন আশঙ্কা নাই, তাহা তখনও যেন ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই। ফণী বাড়ীতেই ছিল। তাহারা সকলে পূর্ণিমার বিবাহের কথা শুনিয়া আনন্দিত হইল। আমার অসুবিধা ও অনটনের সমস্ত কথা ফণীকে বলিলাম। সেই দিনই ফণী আমাকে এক হাজার টাকা দিতে পারিবে বলিল এবং অরুণা মেয়েদের লইয়া সেইদিনই বিকালে আমাদের বাড়ী যাইবে স্থির হইল। তখন ফণীকে সঙ্গে লইয়া তাহার দোকানের পাশের দোকান হইতে প্রফুল্লকে হাওড়ায় টেলিফোন করিতে যাইলাম। প্রফুল্ল আমার শক্তি, তাহাকে বাদ দিয়া আমার কোন কাজ হয় না। বিবাহের আয়োজন, মাছ প্রভৃতি যোগাড় করা, বিবাহের রাত্রিতে দাঁড়াইয়া বর ও কন্যাযাত্রীদের খাওয়ানর ব্যবস্থা করা সমস্তই তাহার উপর আমাকে নির্ভর করিতে হইবে। প্রফুল্ল পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর, কর্ম্মোপলক্ষে প্রায়ই তাহাকে মফঃস্বলে যাইতে হয়। ভয় হইতে লাগিল যদি প্রফুল্ল বাহিরে গিয়া থাকে তাহা হইলে কি হইবে! টেলিফোনে ডাকামাত্রই হাওড়া হইতে যে সাড়া দিল সে স্বয়ং প্রফুল্ল কুমার। সন্ন্যাসী মহেশ্বর যেন গৃহী পুত্রের জন্য নিজে ত্রিশূল কাঁধে করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন,—যাহাকে যাহাকে আমার প্রয়োজন তাহাকে তাহাকে সেইখানেই বসাইয়া রাখিয়াছেন। প্রফুল্ল সাড়া দিল, সমস্ত কথা তাহাকে বলিলাম, আমার শঙ্কিত মনের কথা তাহাকে জানাইলাম। তাহার প্রসন্ন মুখ হইতে মাভৈঃ মাভৈঃ শব্দ টেলিফোনে প্রতিধ্বনিত হইয়া আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। প্রফুল্ল আশ্বাস দিল, সে মাছ, মিষ্টি ও দই যোগাড় করিবে, আজই বিকালবেলা আসিয়া অন্যান্য পরামর্শ করিবে, বুধবার সকালে আসিয়া আমার সহিত পাত্র আশীর্ব্বাদ করিতে যাইবে, বিবাহের দিন উপস্থিত থাকিয়া কর্ম্ম সুসম্পন্ন করিতে সাহায্য করিবে।

কালীঘাট হইতে বিদায় লইয়া বেলা প্রায় ১১টার সময় কলেজে উপস্থিত হইলাম—ছুটি লইতে হইবে এবং প্রভিডেণ্ট ফণ্ড হইতে টাকা ধার করিতে হইবে। কলেজে প্রবেশ করিতেছি. সম্মুখে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বন্ধুবর সুধীর বাবু। অল্প সময়ের মধ্যেই চারিশত টাকা আমার প্রভিডেণ্ট ফণ্ড হইতে ঋণ লওয়ার ব্যবস্থা হইয়া গেল। কীর্ত্তীশের নিকট কয়েক দিনের জন্য পাঁচশত টাকা চাহিয়া লইব মনে করিয়া তাহাকে পত্র লিখিতে বসিব এমন সময় কীর্ত্তীশ আসিয়া উপস্থিত। তাহাকে সমস্ত কথা বলিলাম এবং আপাততঃ টাকার যোগাড় নাই বলিয়া তাহার নিকট পাঁচশত টাকা চাহিলাম। সে টাকা দিতে সম্মত হইল। শেষ পর্য্যন্ত অন্য উপায়ে বিশ্বজননী টাকার যোগাড় করিয়া দেওয়ায় কীর্ত্তীশের নিকট টাকা লইতে হয় নাই। কিরূপে আমাকে আড়ালে রাখিয়া বিশ্বেশ্বর নিজে সম্মুখে দাঁড়াইয়াছেন, তাঁহার কৃপায় অদ্ভুতভাবে সমস্ত বিষয় অতি সহজে ও শৃঙ্খলার সহিত পরিসমাপ্তির দিকে অগ্রসর হইতেছে, ইহা ভাবিয়া চোখের জল মুছিতে মুছিতে বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলাম।

বেলা প্রায় ১২টা—পূর্ণিমা ও আরতি উৎকণ্ঠিত হইয়া বাহিরের ঘরে বসিয়া আছে। তাহারা জানে আমি ছাত্র পড়াইতে গিয়াছি. পথে পঙ্কজবাবুর সহিত দেখা করিয়া যাইব আমার সে সঙ্কল্প তাহাদের নিকট অজ্ঞাত। অন্যদিন দশটার মধ্যে পড়াইয়া ফিরিয়া আসি. আজ প্রায় ১২টা হইতে চলিল। কলিকাতায় আজকাল ট্রাম ও বাস্ দুর্ঘটনা নিত্যই হইতেছে। সুতরাং মেয়ে দুইটি তখন অসহায় অবস্থায় ঘরে বসিয়া আমার বিপদের দুঃস্বপ্ন দেখিতেছে। বাড়ীতে বয়স্ক মেয়ে অথবা পুরুষ মানুষ এমন কেহ নাই যে, এই দুইটি বালিকাকে সান্ত্বনা দিতে পারে। আমি আসিয়া তাহাদের ডাকিতেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া দ্রুতপদে আসিয়া পূর্ণিমা আমাকে দরজা খুলিয়া দিল।

দুশ্চিন্তায় তাহাদের মুখ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে লক্ষ্য করিলাম। ধীরে ধীরে সমস্ত ঘটনা তাহাদের নিকট ব্যক্ত করিলাম। বিস্ময়ে ও আনন্দে উভয়ের মুখ তৎক্ষণাৎ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

প্রায় দশ মিনিট কাল একটু বিশ্রাম করিয়া প্রতিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইলাম। আমার বাড়ীর সংলগ্ন তাঁহার বাড়ী। বরযাত্রী মাত্র পঁচিশজন আসিবেন স্থির হইয়াছিল, স্থানাভাব এবং সময়াভাব বলিয়া আমি কন্যাযাত্রীর সংখ্যাও যথাসম্ভব সংক্ষেপ করিব স্থির করিয়াছিলাম। কিন্তু তথাপি আমার এই ক্ষুদ্র বাড়ীতে বিবাহ এবং লোক খাওয়ানর আয়োজন করা সম্ভবপর ছিল না। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বাবুর প্রশস্ত বাড়ীতে রান্নার ব্যবস্থা করিবার অনুমতি চাহিবার জন্য তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। সুরেন্দ্রবাবু তখন আহার করিতে বসিয়াছেন, তোষামোদ করিতে হইল না, অনুরোধ করিতে হইল না, বারংবার বলিতে হইল না, সমস্ত বিষয় তাঁহাকে একবার বলিবামাত্র তিনি আশ্বাস দিলেন যে, রন্ধনকার্য্য ও লোক খাওয়ানর ব্যবস্থা তাঁহার বাড়ীতেই হইবে এবং তিনি ও তাঁহার পরিবারস্থ সকলে আমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন। আমি বিশ্বজননীর মুখের দিকে তাকাইয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম।

মেয়েরা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে কারণ আমার স্নানাহার হয় নাই, কিন্তু তখনও কাজ একটু বাকী রহিয়াছে। সুতরাং আমি তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ ভাত খাইয়া লইতে বলিলাম। বিশেষ করিয়া পূর্ণিমা আজ হইতে যেন সংসারের কোন কাজ না করে এবং সময়মত সাধারণ মাছের ঝোল ও তরকারী দিয়া ভাত খায়, ইহাই নির্দ্দেশ দিলাম। গড়পার পোস্ট আফিস হইতে টাকা বাহির করিবার জন্য তখনই যাইতে হইল। ৩৭৮৲ টাকা পোস্ট আফিস হইতে বাহির করিলাম,—

একটু ভুলের জন্য আমাকে পোস্ট আফিসে দুইবার যাতায়াত করিতে হইল।

এইবার বাড়ী ফিরিয়া নিশ্চিন্ত মনে স্নান সমাপন কবিয়া ভাত খাইতে বসিলাম। গীতার কথা পুনঃ পুনঃ মনে পড়িতে লাগিল।

"অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।"

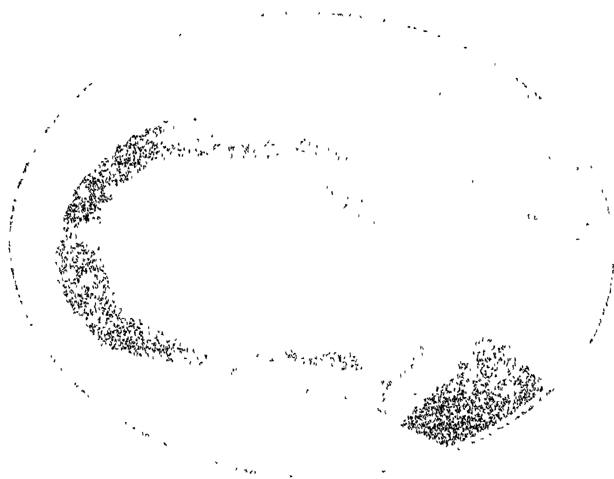
বিকালবেলা অরুণা ও তাহার তিন মেয়েকে লইয়া ফণী উপস্থিত হইল। সুরেন্দ্রবাবু লোক খাওয়ানর একটা ফর্দ্দ করিয়া জিনিষপত্র কিনিতে আরম্ভ করিলেন, তাঁহার পুরোহিত ডাকিয়া বিবাহের জিনিষপত্র ক্রয় করার ব্যবস্থা করিলেন। প্রফুল্ল মাছ, মিষ্টি ও দই হাওড়ার কোন পরিচিত দোকান হইতে বিবাহের দিন পাঠাইবার ব্যবস্থা করিল। ফণী বাজার করিতে বাহির হইল, আমি বিকালে নর্থ বৃটিশ ইনসিওর আফিসে যাইয়া আমার জীবন বীমা হইতে টাকা ধার লইবার ব্যবস্থা করিলাম। এই কোম্পানীর মূল্যবান কাগজপত্র যুদ্ধের জন্য কলিকাতার বাহিরে প্রেরণ করা হইয়াছিল সুতরাং বিবাহের পূর্ব্বে টাকা পাইবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু জনৈক কেরানী বাবুর উপদেশ মত Mr. Buxy নামক এক তরুণ অফিসারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত কথা বলায় তিনি আমার প্রতি অশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন, কেরানী-বাবুদিগকে ডাকিয়া তৎক্ষণাৎ আমার প্রাপ্য ধারের টাকার হিসাব করিতে বলিলেন এবং বৃহস্পতিবার দিন অর্থাৎ বিবাহের দিন ১৮৫০৲ টাকা ধার পাওয়া যাইবে বলিয়া আশ্বাস দিলেন। অপরিচিত ভদ্রলোক কি করিয়া আমার প্রতি এত সহানুভূতি সম্পন্ন হইলেন, তাহা চিন্তা করিতে করিতে প্রায় ৫৷৷০টার সময় বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম।

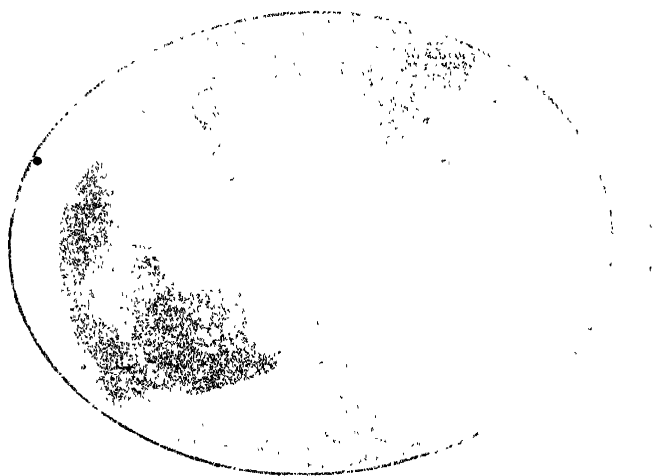
১৯শে জানুয়ারী, বুধবার। সকাল ৮টার সময় আমি, কীর্ত্তীশ, প্রফুল্ল ও ফণী পাত্র আশীর্ব্বাদ করিতে যাইলাম। অন্য দুইটি মেয়ের বিবাহের

সময় আমার বন্ধু ও আত্মীয়, সিটী কলেজের প্রফেসার, হেমেন্দ্র সঙ্গে ছিল কিন্তু এবার পায়ে বিষাক্ত ঘা হইয়া সে প্রায় শয্যাশায়ী, সুতরাং তাহাকে এবার সঙ্গে পাইলাম না। তাহার কথা আমাদের সকলেরই মনে হইল। পূর্ব্বদিন ফণী সোণার বোতাম কিনিয়া আনিয়াছিল, সেই বোতাম দিয়া আমি আশীর্ব্বাদ করিলাম। সারাদিন ফণী ও জীবন বাজার করিল, সুরেন্দ্র বাবুর ছেলেরা বিবাহের ও লোক খাওয়ানর জিনিষপত্র কিনিতে লাগিল, সুরেন্দ্রবাবু নিজে ফর্দ্দ লইয়া কতবার আমার নিকট যাতায়াত করিলেন তাহার নির্ণয় নাই। সন্ধ্যাবেলা পাত্রপক্ষ আসিয়া পূর্ণিমাকে আশীর্ব্বাদ করিল।

(৪)

২০শে জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার, শ্রীমতী পূর্ণিমার বিবাহের দিন। বিবাহের লগ্ন রাত্রিশেষে, ভোর প্রায় ৫টার সময়। বিবাহকার্য্য আমার বাড়ীতেই হইবে, বর ও কন্যাযাত্রী, পুরুষ ও স্ত্রীলোক সকলেই ডাক্তার বাবুর বাড়ীতে খাইবেন, ইহাই স্থির ছিল। ফণী আমার বড় ভায়রাভাই শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের খিদিরপুরের বাড়ীতে যাইয়া তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিল। বীরেশ্বরবাবুর স্ত্রী, শাশুড়ী ঠাকুরাণী ও তিনটি মেয়ে দ্বিপ্রহরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি দ্বিপ্রহর প্রায় দুইটার সময় আভ্যুদয়িক কার্য্য শেষ করিয়া নর্থ বৃটিশ ইন্‌সিওর আফিসে যাইয়া ১৮৫০৲ টাকার চেক আনিলাম। এদিকে গায়ে হলুদের জিনিষপত্র বেলা ১১টার সময় আসিল। প্রফুল্ল সকাল বেলায় প্রায় একমণ মাছ একটি কনেষ্টবলের সঙ্গে পাঠাইয়া দিয়াছিল, বিকালে সে নিজে দই ও মিষ্টান্ন দোকানদারের বাসে করিয়া লইয়া আসিল। ফণী আমার মাকে আনিবার জন্য তাহাদের গোমস্তা নৈহাটী-নিবাসী





শ্রীযুক্ত অশ্বিনী কুমারকে পাঠাইয়াছিল। সন্ধ্যার পর মা আসিয়া উপস্থিত হইলেন, বিনয় আসিল না। বিনয় মার হাতে পূর্ণিমার জন্য পনেরটি টাকা দিয়াছিল। করুণা কিছুদিন যাবৎ আমাশয়ের পীড়ায় শয্যাশায়ী হইয়াছিল, সে আসিতে পারিল না। রাত্রি প্রায় ৯টার সময় বর শ্রীমান্ সুকুমার চট্টোপাধ্যায় ও প্রায় ২০৷২২জন বরযাত্রী আসিলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগের আহারের ব্যবস্থা করা হইল, সুরেন্দ্রবাবু ও ফণী দাঁড়াইয়া সমস্ত কার্য্য সুচারুরূপে নিষ্পন্ন করাইলেন। ফণী ও জীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করিল। আমি যেন দূরাগত দর্শক, কার্য্যের কোন ভারই আমাকে স্পর্শ করিল না,—অনুক্ষণ ত্রিশূলধারী ও মহাকালীকে স্মরণ করিতে লাগিলাম। মেয়েরা সুরেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে আহারাদি করিল। স্ত্রী ও পুরুষ সর্ব্বসমেত প্রায় একশত পঁচিশ জন লোক সেদিন বিবাহ উপলক্ষে আহার করিয়াছিল। রাত্রি শেষে আমার বাড়ীতে শ্রীমতী পূর্ণিমার সহিত শ্রীমান্ সুকুমারের বিবাহ হইয়া গেল। আমি কন্যা সম্প্রদান করিলাম।

এই বিবাহের সময় ভগবানের দয়ার পরিচয় আরও নিবিড়ভাবে পাইলাম। আয়োজন নাই, লোকবল নাই, অর্থসঞ্চয় নাই অথচ কোথা হইতে কিরূপে সমস্ত কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গেল! যত দিন যাইতেছে ততই বিশ্বজননীকে Magician-রূপে দেখিতে পাইতেছি। কি করিয়া যে তিনি এই দুর্ভিক্ষের সময়ে আমার সংসার চালাইতেছেন তাহাই আমার হিসাবে আসে না। ইহার উপর বড় বড় ব্যাপারেও কেমন সহজে তিনি আমার হাত ধরিয়া দুর্গম পথ অতিক্রম করাইতেছেন তাহা দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইতেছি। এবারকার বিবাহে পূর্ব্বের মত ফণী খুব পরিশ্রম করিয়াছে, দিবারাত্র বাজার হাট করিয়া বেড়াইয়াছে। করুণার বিবাহের সময় আমি কিছু

কিছু পরিশ্রম করিয়াছিলাম, কিন্তু এবার ফণী ও জীবন আমাকে কিছুই পরিশ্রম করিতে দেয় নাই; সমস্ত ভার তাহারাই গ্রহণ করিয়াছিল। গৌরীর মা এবারেও আসিয়াছিলেন। তাঁহার শরীর খারাপ থাকা সত্ত্বেও একবার বলিবামাত্রই তিনি গৌরীকে সঙ্গে করিয়া আসিলেন, বিবাহের দিন সকাল হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি পর্য্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করিলেন। প্রফুল্লকে সব সময়েই দেখিতে পাইয়াছি। হাওড়ার প্রসিদ্ধ মিষ্টান্ন-বিক্রেতা তুলালচন্দ্র ঘোষের ২০২নং খুরুট রোডস্থ দোকান হইতে দই ও মিষ্টান্নের ব্যবস্থা প্রফুল্ল করিয়াছিল; হাওড়ার কোন পরিচিত ব্যবসায়ীর নিকট হইতে উৎকৃষ্ট মাছ আনিল, আমার ব্যয় সঙ্কোচ করিবার জন্য প্রফুল্ল নিজে চেষ্টা করিয়া, মিষ্টান্নাদির দাম যথাসম্ভব কমাইয়াছিল। অনেক বলা সত্ত্বেও প্রায় একমণ মাছের দাম মৎস্য-বিক্রেতা কিছুতেই প্রফুল্লর নিকট হইতে লইল না। বর্ত্তমানে একমণ মাছের মূল্য প্রায় দেড়শত টাকা, এই টাকা আমার ব্যয় করিতে হইল না, বিনা মূল্যে মৎস্য পাইলাম। জন্মান্তরের সম্বন্ধে বিশ্বাস না করিলে এই বন্ধুর ব্যবহারের কোন সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যাহাদের কথা এতক্ষণ লিখিলাম তাহারা প্রায় সকলেই পূর্ব্বে আমার দুইটি মেয়ের বিবাহে ঠিক এইরূপ সাহায্য ও পরিশ্রম করিয়াছিল, সুতরাং তাহাদের সহানুভূতি, ত্যাগ ও পরিশ্রম বিস্ময়কর হইলেও নূতন নহে। কিন্তু শ্রীমতী পূর্ণিমার বিবাহ উপলক্ষে আর একজন মহাপ্রাণ ব্যক্তির অন্তরের পরিচয় পাইলাম। আমি ভগবানকে দেখি নাই কিন্তু ভগবানের অন্তরের উপাদানে গঠিত অন্তর-বিশিষ্ট মানুষ আমি দেখিয়াছি। প্রতিবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ চৌধুরী মহাশয়ের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। পূর্ণিমার বিবাহের কথা স্থির হইবামাত্র তাঁহার বাটীতে রন্ধন কার্য্যের ব্যবস্থার জন্য

অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলাম। তিনি এবং তাঁহার দুইজন পুত্র বিবাহের খুঁটিনাটি জিনিষের ফর্দ্দ করিয়া বাজার হইতে সমস্তই ক্রয় করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, লোকজন খাওয়াইবার জন্য ময়দা, ঘৃত, তরীতরকারী, প্রভৃতি যে সমস্ত জিনিষ প্রয়োজন তাহার সম্পূর্ণ ভার লইয়াছিলেন। মাছকোটা ও দ্বিপ্রহরে গায়েহলুদের লোকগুলির জন্য রান্নার আয়োজন তাঁহার বাড়ীতেই হইয়াছিল, তাঁহার বাড়ীর মেয়েরাই আলু, কপি, ইত্যাদি সমস্ত তরীতরকারী কুটিয়াছিলেন। দই মিষ্টান্ন সমস্ত তাঁহার বাড়ীতেই রাখা হইয়াছিল। স্ত্রী ও পুরুষ, আমার মেয়ে, জামাই ও অন্যান্য আত্মীয়গণ, নিমন্ত্রিত বরযাত্রী সকলেই তাঁহার বাড়ীতে আহার করিয়াছিল। সমস্ত কাজ ঠিক নির্দ্ধারিত সময়ে সহজ ও সরলভাবে সম্পাদিত হইয়াছিল। রান্না কতদূর হইল, পাচক ও চাকরেরা ঠিক কাজ করিতেছে কি না, এ সমস্ত দেখিবার ইচ্ছা বা প্রয়োজন আমার একবারও হয় নাই। আমার একটি পয়সা যাহাতে অপব্যয় না হয় তাহার জন্য সুরেন্দ্রবাবু সর্ব্বদাই সতর্ক ছিলেন। আমার জ্যেষ্ঠ শ্যালিকা, তাঁহার কন্যাগণ, আমার মেয়েরা ও নিমন্ত্রিত ২।৪ জন মেয়ে সুরেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে খাইতে গেল। দ্বিতলের ঘরে আসন পাতিয়া জায়গা করা হইয়াছিল। ডাক্তারবাবুর স্ত্রী তাঁহার পুত্রবধূ ও মেয়েরা সকলে দাঁড়াইয়া নিমন্ত্রিত মেয়েদের যত্নপূর্ব্বক আহার করাইলেন, আঁচাইবার জল হাতে ঢালিয়া দিলেন, হাত-মুখ মুছিবার জন্য তোয়ালে দিলেন। ব্যাপারটা এমন দেখাইল যেন আমার বাড়ীর মেয়েরা তাঁহাদের বাড়ীর অতিথি, যজ্ঞ নিষ্পন্নের দায়িত্ব তাঁহাদের, আমরা নিমন্ত্রিত ব্যক্তি মাত্র। বিবাহের পরদিন আমার প্রদত্ত টাকার প্রতি পয়সার হিসাব নিজ হাতে লিখিয়া সুরেন্দ্রবাবু আমাকে হিসাব বুঝাইতে আসিয়াছিলেন। হিসাব আমাকে

অতি মনোযোগ সহকারে বুঝিয়া লইতে হইয়াছিল কিন্তু মনে মনে হাসিয়াছিলাম যে, আমার নিকট যিনি হিসাব দাখিল করিতে আসিয়াছেন তিনি সমস্ত জীবন নিজের হিসাব রাখেন নাই—গৃহিনী সমস্ত করিতেন, আজিও তিনি পেন্‌সনের ভারবাহী মাত্র, সংসারের হিসাব, অনটন-অভিযোগ হইতে সর্ব্বদাই যত্ন সহকারে আপনাকে বাঁচাইয়া চলিয়া থাকেন। সুরেন্দ্রবাবু আরামপ্রিয়, সৌখীন লোক। এই মন্বন্তরের দিনেও অপরাহ্লকালে তিনি গিলা দিয়া কোঁচান শুভ্র পাঞ্জাবী ও দামী মলমলের কাপড় পরিয়া সুনিপুণ ক্ষৌরকার্য্যের দ্বারা মুখের নষ্ট কান্তি কিয়ৎপরিমাণে পুনরুদ্ধার করিয়া বাহিরের বারান্দায় আসিয়া যখন বসেন তখন তাঁহার শুভ্র ললাটে সংসার-চিন্তার কোন গ্লানি পরিলক্ষিত হয় না। সংসার করিয়াছেন জানি কিন্তু সংসারেব ভার কখনও বহন করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। মনে মনে আরও হাসিলাম যে, ভারবহনে অনভ্যস্ত এই ভদ্রলোকের উপর আমি গুরুভার চাপাইয়া দিয়াছিলাম—এবং সেই ভারের চাপে তিনি অসংখ্যবার তাঁহার বাড়ী ও আমার বাড়ীর মধ্যে যাতায়াত করিয়াছেন। এই চৌধুরী বংশ কলিকাতার অনেক শ্রেষ্ঠ ও বনিয়াদী কায়স্থ বংশের সহিত আত্মীয়তাসূত্রে সংশ্লিষ্ট। গৃহস্বামী গভর্ণমেণ্টের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন, ছেলেমেয়েরা চিরদিন সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের ক্রোড়ে লালিত-পালিত। বংশ পরিচয়, পদগৌরব, অর্থ-সাচ্ছল্য,—কোন বিষয়েই আমি ইঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইবার অধিকারী নহি। অথচ এই দরিদ্র শিক্ষকের মেয়েগুলিকে তিনি ও তাঁহার বাটীর স্ত্রীলোকেরা ধনীর অধিক সম্মান দিয়াছিলেন,—সমস্ত বিবরণ শ্রবণ করিয়া লজ্জা ও কৃতজ্ঞতাভারে আমার মস্তক ধূলিতে অবনত করিয়া আমি তাঁহাদের উদ্দেশে বারংবার প্রণাম করিয়াছি। বিশ্বজননীর কত দয়া হইলে

তবে মানুষের নিকট হইতে এত অনুগ্রহ সম্ভবপর হইতে পারে! মহেশ্বরের এমন দয়া এমন বিস্ময়কর ভাবে আমি পাইয়াছি, আমার মনের এই আনন্দ ও অহঙ্কার আমি কি করিয়া গোপন করিব!

(৫)

২২শে জানুয়ারী, শনিবার। সন্ধ্যার পর ফুলশয্যার তত্ত্ব পাঠান হইল, তত্ত্ববাহী লোকেরা ফিরিয়া আসিয়া বলিল যে, বৈবাহিক মহাশয় ও বৈবাহিকা ঠাকুরাণী জিনিষপত্রের পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করিয়াছেন। বাংলা সমাজে কুটুম্ববাড়ী জিনিষপত্র পাঠান এক ভীষণ পরীক্ষা, প্রায়ই কুটুম্ব-স্বজনের মন পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে দয়াময়ী আমাকে সৌভাগ্য দিয়াছেন। তিনটি মেয়ের বিবাহে সকল কুটুম্বই আনন্দের সহিত আমার পাঠান তত্ত্বের জিনিষপত্র গ্রহণ করিয়াছেন। অবশ্য এবার সময় সংক্ষেপ হইলেও ফণী ও জীবন জিনিষের দুর্ম্মূল্যতার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া যথাসম্ভব ভাল ও পছন্দমত দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়াছিল। তবু মেয়ের বাপের ভয় সর্ব্বদাই থাকে, সুতরাং তত্ত্ববাহী লোকেরা ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত হইতে পারি নাই। বিবাহে মোট ৩৬৮৬৲ টাকা ব্যয় হইল। ইহার মধ্যে ১৮৫০৲ টাকা ইন্‌সিওর কোম্পানীর নিকট হইতে পাইয়াছিলাম, প্রায় ৭০০৲ টাকার সোনা আমার স্ত্রীর গহনা ইত্যাদি হইতে পাওয়া গিয়াছিল, পোস্ট অফিসের ৩৮০৲ টাকা, কলেজে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড হইতে ধার করা ৪০০৲ টাকা এবং মাসের শেষে ছেলে পড়ানর প্রায় ৩৫০৲ টাকা, এইরূপে মোট ৩৬৮৬৲ টাকা সঙ্কুলান হইয়া গেল। ফণী প্রায় হাজার টাকা আমাকে ইতিমধ্যে দিয়াছিল, তাহা ৫।৭ দিন পরেই তাহাকে পরিশোধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। এইরূপে অপ্রত্যাশিতভাবে বিশ্বজননী আমাকে

সাক্ষীগোপাল স্থাপন করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিলেন এবং নিজে যজ্ঞেশ্বর হইয়া সমস্ত কার্য্য সুসম্পন্ন করাইলেন।

(৬)

কয়েক মাস পূর্ব্বে একজন মুড়িবিক্রেতা বস্তা করিয়া মুড়ি আনিয়া বাড়ীতে বাড়ীতে মুড়ি বিক্রয় করিত, আমরাও তাহার নিকট মুড়ি লইতাম। তখন টাকার ভাঙ্গানো রেজ্‌কী সহজে পাওয়া যাইত না কিন্তু মুড়িওয়ালা মধ্যে মধ্যে আমাদিগকে রেজ্‌কী দিত। কখনও বা পূর্ব্বেই আমার নিকট টাকা লইয়া যাইত এবং কয়েক ঘণ্টা পরেই মুড়ি বিক্রয় শেষ করিয়া ফিরিবার পথে রেজ্‌কী দিয়া যাইত। তাহার গলায় কণ্ঠির মালা দেখিয়া তাহাকে সহজেই বিশ্বাস করিতাম। একদিন এইরূপে আরতির নিকট দুই টাকা লইয়া গিয়া আর রেজ্‌কী দিতে ফিরিল না। কিছুদিন পরে আমাদের প্রতিবাসী শ্রীবলাইচন্দ্র সরকার ঝামাপুকুরে তাহাকে মুড়ি বিক্রয় করিতে দেখিয়া আমাদের রেজ্‌কী আদায় করিবার জন্য তাহাকে এখানে ধরিয়া আনিল। আমি বাড়ীতে ছিলাম না। আরতি তাহাকে রেজ্‌কীর কথা বলায় সে বলিল তাহার অসুস্থতার জন্য কয়েকদিন আসিতে পারে নাই, তখন রেজ্‌কী ছিল না, পরে নিশ্চয়ই দিয়া যাইবে স্বীকার করিল। কিন্তু সে আর আসিল না। পাড়ার কাহারও কাহারও সহিত দূরের কোন রাস্তায় দেখা হইলেই সে সরিয়া পড়িত অথবা ধরা পড়িলে টাকা দিয়া যাইবে প্রতিশ্রুতি দিত। আমি লোকটির আচরণে বিস্মিত হইলাম। সামান্য দুইটি টাকা আমাকে ঠকাইল অথচ গলায় কণ্ঠির মালা দেখিয়া তাহাকে বিশ্বাস করিয়াছিলাম। ভাবিলাম, সেই বৈষ্ণব-পতাকার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতে বিবেক-বুদ্ধিতে তাহার আঘাত লাগিল না! এই ঘটনার

প্রায় তিনমাস পরে ইহার কথা ভুলিয়া গিয়াছি, হঠাৎ ২৭শে জানুয়ারী অরুণার মেয়ে সুকু বাড়ীর ভিতরে আসিয়া আমাকে বলিল, "দাদু, একজন ভিকিরি তোমাকে ডাক্‌ছে।" আমি বাহিরে যাইয়া দেখি, অস্থিচর্ম্মসার জনৈক রুগ্ন লোক লাঠির উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইবামাত্র সে বলিল, "আমাকে চিন্‌তে পার্চ্ছেন না? আমি আপনাদের মুড়ি বিক্রী কর্ত্তাম। এতদিন অসুখের জন্য আস্‌তে পারিনি।" তখন তাহাকে চিনিতে পারিলাম। রোগের তাড়নায় আজ তাহার বিবেকবুদ্ধি জাগরিত হইয়াছে, আমাকে সেই ঠকাইয়া লওয়া দুইটি টাকা ফেরৎ দিবার কথা বলিতে আসিয়াছে। তাহার হাতে তখন টাকা ছিল না, চিকিৎসার চাপে নিঃস্ব হইয়াছে, ভবিষ্যতে সুস্থ হইয়া টাকা দিবার প্রতিশ্রুতি দিল। আমি হাসিয়া বলিলাম, "ঠকাতে গিয়াও হজম করিতে পারিলে না,—তোমাকে বড়ই বিশ্বাস করিয়াছিলাম। নতুবা পথের লোককে কেহ টাকা অগ্রিম ছাড়িয়া দেয় না। তোমার গলায় যে বৈষ্ণবের মালা, তাহার তুমি অপমান করিয়াছ। টাকা দুইটি ফেরৎ দিয়া যাইও।" লোকটি চলিয়া গেল। কিন্তু টাকা ফেরৎ দিতে এখনও আসে নাই। তাহার শরীর যেরূপ দেখিয়াছিলাম, বাঁচিয়া উঠিয়াছে কি না সন্দেহ।

(৭)

পূর্ণিমার বিবাহের কয়েকদিন পর হইতেই ডানদিক্‌কার বুকে একটা বেদনা অনুভব করিতে লাগিলাম। প্রায় ১৪।১৫ বৎসর পূর্ব্বে এইরূপ বেদনার সূত্রপাত হইয়া ধীরে ধীরে বামবক্ষদেশে প্লুরিসি হইয়াছিল, এবং বহুদিন এই কঠিন রোগে ভুগিয়াছিলাম। এইবার দক্ষিণ-পার্শ্বে ঠিক সেই রকমেরই বেদনা অনুভূত হইতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে

চিড়িক্ পাড়িয়া উঠে, দিবারাত্র প্রায় সর্ব্বক্ষণই বেদনা হয়, কখনও কম কখনও বা বেশী। আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, পূর্ব্বের প্লুরিসির সূত্রপাতের বেদনার মত। সেবারে ডাক্তারদের দেখাইয়াছিলাম, কিন্তু কোন ডাক্তারই সেই অবস্থায় প্লুরিসি বলিয়া ধরিতে পারেন নাই, যখন প্রবল জ্বর হইয়া শয্যাশায়ী তখনই রোগ ধরা পড়িয়াছিল। এবারে ২।১ দিন ঐরূপ বেদনা হইবামাত্র শঙ্কিত হইয়া পড়িলাম। অনেক কাজ পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে, এসময়ে দীর্ঘকালের জন্য শয্যাশায়ী হইতে হইলে অর্থ ও শরীর উভয়েরই বিশেষ ক্ষতি হইবে। ভয় পাইয়া প্রতিবাসী ডাক্তার সুরেন্দ্রবাবু ও নরেন্দ্রবাবুকে সমস্ত ঘটনা পূর্ব্বাপর বলিলাম। তাঁহারা দুইজনেই আমার বুক ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলেন, কিন্তু প্লুরিসির কোন লক্ষণ পাইলেন না। একবার মাত্র নরেন্দ্রবাবু বলিলেন, "ঈষৎ যেন friction-এর sound পাইলাম," কিন্তু পরক্ষণেই তাহা আর পাওয়া গেল না। আমি কিন্তু দৃঢ়ভাবে তাঁহাদিগকে বলিলাম যে, এই বেদনা আমার অত্যন্ত পরিচিত, সুতরাং প্লুরিসি না হইতে পারে এরূপ ঔষধ তাঁহারা আমাকে এখনই লিখিয়া দিন। ডাক্তারবাবুরা ঔষধ লিখিয়া দিলেন, আমি সেবন করিতে আরম্ভ করিলাম। প্রায় ৭।৮ দিন এই বেদনা রহিল, কিন্তু ঔষধ সেবনের ফলে ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করিলাম। ভগবানের দয়ায় পূর্ব্ব হইতেই সতর্ক হওয়ায় কঠিন রোগের কবল হইতে রক্ষা পাইলাম।

(৮)

এই বৎসরের প্রারম্ভ হইতেই ছাত্র পড়ানর কাজ অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। কোন কোন বৎসর কাজ কম থাকে কোন বৎসর বা বেশী, কিন্তু এবৎসরের মত এত বেশী কাজ জীবনে আর কখনও

করি নাই। এখন সর্ব্বসমেত ৫টি ছেলে পড়াইতেছি, ইহাদের মধ্যে তিনটি ছেলে আমার বাড়ীতে আসিয়া পড়িয়া যায়, অপর দুইটিকে পড়াইতে যাইতে হয়। কোন ছেলেটিকে সপ্তাহে তিনদিন, কোনটিকে বা চারদিন পড়াইতে হয়, কেহ বা পাঁচদিনও পড়ে। ইহার উপর দ্বিপ্রহরে কলেজের কাজ, সন্ধ্যাবেলা কমার্স ক্লাস আছে। এত কাজ একসঙ্গে করিতেছি ইহা বন্ধুবান্ধবদের কাহাকেও বলিলে বিশ্বাস করিবে না। আমিও ভাবি এতগুলি ছেলে পড়ান প্রায় অসম্ভব, হয়ত কোনদিন কাজ আটকাইয়া যাইবে, শৃঙ্খলার সহিত সমস্ত কাজ করিয়া উঠিতে পারিব না। কিন্তু ভগবানের দয়ায় কাজ যেন বেশ নিয়মিত সহজ ভাবে হইয়া যাইতেছে ; কঠিন রোগের আশঙ্কাও তাঁহার ইঙ্গিতে অপসারিত হইয়াছে। একদিনের কথা লিখিতেছি। সেদিন ১৩ই জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার। সকালবেলা আমি ল্যান্সডাউন রোডে উমাপ্রসন্নকে পড়াইতে যাইলাম। ট্রামে বাসে আজকাল অত্যন্ত ভিড়, প্রায়ই দাঁড়াইয়া ভিড় ঠেলাঠেলি করিয়া যাইতে হয়। বেলা ১০॥০টার সময় ফিরিয়া তাড়াতাড়ি স্নান আহার সারিয়া ১১-১৫ মিনিটের সময় কলেজে উপস্থিত হইলাম। তিন Period সেখানে পড়াইতে হইল—একটি 4th year ও দুইটি 1st year Class ছিল। সেখান হইতে বাড়ী ফিরিয়া হাত মুখ ধুইয়া বেলা ২॥০টা হইতে শিবপুরের ছাত্র কুমারকে পড়াইতে আরম্ভ করিলাম। কুমার চলিয়া যাইবামাত্র বেলা ৪টার সময় ইছাপুরেব ছাত্র কমলাকান্ত পড়িতে আসিল। বেলা ৫।০টার সময় তাহাকে বিদায় দিয়া তাড়াতাড়ি ট্রামে করিয়া কলেজে যাইলাম। সেখানে ৫-৪৫ মিনিটে আরম্ভ করিয়া পর পর দুই Period Commerce Class-এ পড়াইয়া রাত্রি প্রায় ৭॥০ টার সময় সার্পেণ্টাইন লেনে তারাপদকে পড়াইতে যাইলাম। বাড়ী ফিরিলাম

রাত্রি ১০টার সময়। এইরূপ পরিশ্রম প্রায় নিত্যই হইতেছে, অথচ শরীর কর্ম্মক্ষম আছে, মনে অবসাদ নাই। বন্ধুবান্ধবদিগের ভিতর কত অধ্যাপক ছাত্র পড়ান পায় না, কত অধ্যাপক অসুস্থ হইয়া মধ্যে মধ্যে ভুগিতেছে, যে সব অধ্যাপক ছাত্র পড়ান পায় তাহাদিগকেও আমার এত পরিশ্রমের কথা বলিলে কখনই বিশ্বাস করিবে না, মিথ্যা কথা বলিতেছি মনে করিবে। অথচ বিশ্বজননী আমাকে কর্ম্মের স্রোতে ডুবাইয়া রাখিয়াছেন, কর্ম্ম করিবার উপযুক্ত শরীর ও মন তিনি দিয়াছেন, কর্ম্ম সুসম্পন্ন তিনিই করাইয়া লইতেছেন। আমি তো যন্ত্র—তাঁহার হাতে ভাঙ্গা বীণা! আমি নিজেকে দিয়া আজ বুঝিতে পারিয়াছি কর্ম্মের নিয়ন্তা তিনি, কর্ম্মের শক্তি তাঁহার, কর্ম্মের ফলাফলও জ্ঞানে অথবা অজ্ঞানে তাঁহারই শ্রীচরণে অর্পণ করিতেছি।

(৯)

৬ই ফেব্রুয়ারী, রবিবার দ্বিপ্রহরের পর বাহিরের ঘরে বসিয়া কাজ করিতেছি, আরতি আসিয়া শ্রীমান্ সুকুমারের ঠিকানা ইংরাজী অক্ষরে লিখিয়া দিতে বলিল। আমি বুঝিলাম পূর্ণিমার দূতরূপে আরতি আসিয়াছে। কি লিখিতে হইবে তাহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবার জন্য পূর্ণিমাকে ডাকিলাম, পূর্ণিমা লজ্জায় অধোমুখে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল। আমি মনে মনে হাসিয়া ঠিকানা লিখিয়া দিলাম।

মার্চ্চ মাসের প্রথমে আমার গালে দুইটি ফোড়া হইল, ক্রমশঃ বেশ বড় হইয়া ফাটিয়া গেল। সেই ফোড়ার যন্ত্রণা লইয়া কোনরূপে পুঁজস্রাবী গাল ঢাকিয়া সমস্ত দিন কলেজে, ল্যান্সডাউন রোডে ও বালীগঞ্জে কাজ করিয়া বেড়াইলাম। আমার শরীর সহজেই অপটু হয় অথচ কাজ বন্ধ হইল না, বেশ চলিয়া গেল। বিশ্বজননীর ব্যবস্থা মানুষের দুর্ব্বোধ্য।

২০শে মার্চ্চ তারিখে আরতির ডান হাতের মাঝের আঙ্গুলটিতে ফোড়া হইল, অল্পেই সারিয়া যাইবে মনে করিলাম, কিন্তু ক্রমশঃ ফোড়াটী পাকিয়া উঠিল। অশেষ ধৈর্য্য সহকারে সে ইহার মধ্যেই রান্না করিতেছিল কিন্তু একদিন ফোড়ার যন্ত্রণায় সারারাত্রি তাহার নিদ্রা হইল না, এবং তাহার কাতর শব্দে আমারও নিদ্রার ব্যাঘাত হইল। পরদিন সমস্ত ব্যাপার জানাইয়া পূর্ণিমাকে শ্বশুর বাড়ী হইতে আনিবার জন্য বৈবাহিক মহাশয়কে পত্র দিলাম। তিনি সুকুমারের সহিত সেইদিনই পূর্ণিমাকে এখানে পাঠাইয়া দিলেন। ইতিমধ্যে প্রতিবাসী ডাক্তার নরেন্দ্রবাবুকে ফোড়া দেখাইলাম, তিনি তৎক্ষণাৎ অস্ত্রদ্বারা ফোড়াটি কাটিয়া দিলেন। আরতি অস্ত্রোপচারকে বড়ই ভয় করে, তথাপি লোকের সম্মুখে খুব ধৈর্য্য সহকারে ফোড়া কাটিবার সময় বসিয়া রহিল। অনেক পুঁজ-রক্ত বাহির হইয়া ফোড়াটি ১২।১৪ দিনের মধ্যেই আরোগ্য হইয়া গেল। পূর্ণিমা প্রায় দশ দিন আমাদের এখানে থাকিয়া রান্না করিল এবং আরতির আঙ্গুলটি ভাল হইলে শ্বশুরবাড়ী চলিয়া গেল।

(১০)

১৪ই এপ্রিল, ১লা বৈশাখ, বাংলা নববর্ষ, বিকালবেলা সুরেন্দ্রবাবুর বারান্দায় বসিয়া আছি, হঠাৎ ভিতর হইতে নরেন্দ্রবাবুর পৌত্র শ্যামল এক নোটিশ লইয়া হাজির। আমরা অনেকেই তখন বসিয়া গল্প করিতেছিলাম। নরেন্দ্রবাবু নোটীশ পড়িয়া শ্যামলপ্রদত্ত একটি ভোঁতা পেন্সিলের সাহায্যে ততোধিক ভোঁতা ও অস্পষ্টভাবে নাম সহি করিয়া দিলেন। ছোট সিভিল সার্জ্জনবাবু নোটীশ না পড়িয়াই সহি করিলেন। আমি কৌতুহলপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতেছি এমন সময় বড় ডাক্তারবাবু

নোটিশটি আমার হাতে দিলেন, পড়িয়া দেখি যে, নববর্ষ উপলক্ষে ডাক্তার বাবুদের নাতি ও নাতনীরা গান, আবৃত্তি, ইত্যাদির আয়োজন করিয়াছে, নাম সহি করিয়া উপস্থিত হইবার প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে। দুই ক্যাপ্টেনের সহির নীচে আমার সহিটা কোনও রকমে জড়সড় হইয়া স্থান করিয়া লইল। সন্ধ্যা হইলে দ্বিতলের কক্ষে যাইবার জন্য পুনঃপুনঃ আহ্বান আসিতে লাগিল। সুসজ্জিত বিস্তৃত কক্ষ, মেজেতে গালিচা পাতিয়া অভিনয়ের আসর প্রস্তুত, দক্ষিণ দিকের পালঙ্কে শ্রোতৃবৃন্দের স্থান হইয়াছে। বড় ও ছোট ক্যাপ্টেন ভ্রাতৃদ্বয়, ছোট ক্যাপ্টেনের জামাই রায়সাহেব প্রফুল্লবাবু, আমি, প্রতিবাসী সুরেশবাবু, ডাক্তারবাবুদের পুত্র ও দৌহিত্রগণ কেহ বা শয্যায় উপবিষ্ট কেহ বা দণ্ডায়মান। আর্টিষ্টগণের মধ্যে বড় ডাক্তারবাবুর পৌত্রী শান্তাকেই উজ্জ্বল তারকা বলিয়া মনে হইল। তাহার বয়স অনুমান ১২।১৩ বৎসর, স্কুলে পড়ে। তাহার ছোট ভাই শ্যামলও সপ্রতিভ ও অভিনয়দক্ষ। ছোট ডাক্তারের দৌহিত্রী রেবা ও মনু, পৌত্রী রেখা, বড় ডাক্তারবাবুর দৌহিত্রী গীতা, ইহাদের সকলেরই উজ্জ্বল পোষাক, ততোধিক উজ্জ্বল ও কোমল মুখ ইলেকট্রিক আলোকে অপরূপ সুন্দর দেখাইতেছিল। রেবা ও রেখার বয়স আন্দাজ ৩।৪ বৎসর। গান হইল, নৃত্য হইল, আবৃত্তি হইল, কমিক হইল, আরও কত কি হইল। কলেজে-পড়া মেয়েকে বিবাহের জন্য দেখিতে আসিয়াছে, কলেজে-না-পড়া তাহার মা আড়াল হইতে দেখিতেছেন, মেয়ের ঢং দেখিয়া পাড়াগাঁ হইতে আগত ভদ্রলোকদের চক্ষুস্থির। মেয়ের মা অবসর পাইয়াই "ঝাঁটা মার মুখে" "ঝাঁটা মার মুখে" রব তুলিয়া অপূর্ব্ব অঙ্গভঙ্গী সহকারে মেয়েকে তাড়া করিয়া আসিলেন। শান্তা একাই মেয়ে, মা এবং পাত্রপক্ষীয় ভদ্রলোক সাজিয়া যে অভিনয় করিল, তাহাতে হাসিতে হাসিতে পেটে

ব্যথা ধরিবার উপক্রম হইল। আগাগোড়া নৃত্যগীত প্রভৃতি সমস্ত অভিনয়ই ভাল লাগিল। সপ্ততিবয়স্ক বৃদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া ৩।৪ বর্ষ বয়স্ক শিশুদের এক অপূর্ব্ব সমন্বয়, আমার প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়সের মধ্যে এমন করিয়া নববর্ষের উদ্বোধন আর কখনও হয় নাই। ডাক্তারবাবুদের চরিত্রের নবীনতাও দেখিলাম, এই বৃদ্ধেরা কেমন সহজ আনন্দে শিশু ও বালকবালিকাদিগের সহিত এক হইয়া মিশিয়া গিয়াছেন। বৃদ্ধ বয়সে শিশু হইবার শক্তি সাধারণতঃ মানুষের থাকে না, দুই একজন ভাগ্যবান ব্যক্তি বার্দ্ধক্যের জরা ও দুঃখ ভুলিয়া মুহূর্ত্তের জন্যও শিশু সাজিতে পারেন। এই শক্তি ভগবানের দান। চারিদিকে হাসি ও আনন্দ দেখিয়া আমার রবীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়িল। সেই বৃদ্ধ কবি সহজেই বালক হইয়া যাইতেন, বার্দ্ধক্যের ভার শুভ্র মস্তক হইতে পুনঃপুনঃ ছুড়িয়া ফেলিয়া তিনি শিশুর সহিত শিশু হইয়া কতবার আনন্দে নৃত্য করিয়াছেন তাহার নির্ণয় নাই। কবি তিয়াত্তর বৎসর বয়সে আপন স্বভাবের পরিচয় দিয়া লিখিয়াছেন :—

হাল্‌কা আমার স্বভাব

....

আমার মধ্যে হাসির কলরব
আজও থাম্‌ল না,

....

আমি সৃষ্টিকর্ত্তা পিতামহের
রহস্য-সখা।
তিনি অর্ব্বাচীন নবীনদের কাছে
প্রবীণ বয়সের প্রমাণ দিতে
ভুলেই গেছেন।

তরুণের উচ্ছৃঙ্খল হাসিতে
উতরোল তাঁর কৌতুক,
তাদের উদ্দাম নৃত্যে
বাজান তিনি দ্রুততালের মৃদঙ্গ।

তাঁর বজ্রমন্দ্রিত গাম্ভীর্য্য মেঘমেদুর অম্বরে,
অজস্র তাঁর পরিহাস
বিকশিত কাশবনে,
শরতের অকারণ হাস্যহিল্লোলে।

তাঁর কোন লোভ নেই
প্রধানদের কাছে মর্য্যাদা পাবার;
তাড়াতাড়ি কালো পাথর চাপা দেন না
চাপল্যের ঝরনার মুখে।

....

তাই ভেবেছি যাবার বেলায় যাব
মান খুইয়ে,
কপালের তিলক মুছে,
কৌতুকে রসোল্লাসে।

এসো আমার অমানী বন্ধুরা
মন্দিরা বাজিয়ে—
তোমাদের ধূলিমাখা পায়ে
যদি ঘুঙুর বাঁধা থাকে
লজ্জা পাব না।

প্রায় দেড় ঘণ্টা বালক-বালিকাদের নিকট নিজের বয়সের হিসাব লুকাইয়া তাহাদেরই একজন হইয়া আনন্দ দেখিয়া, আনন্দ লইয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম।

(১১)

১৭ই এপ্রিল কলেজে যাইতেছি, দেখিলাম একজন মাংস-বিক্রেতা দুইটি মেষশাবককে গলায় দড়ি দিয়া বাঁধিয়া লইয়া যাইতেছে। এরকম তো রাস্তায় কতই দেখা যায়, কিন্তু সেদিন মেষদ্বয়ের মধ্যে একটি বিশেষ করিয়া আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তাহার অঙ্গভঙ্গী, দ্রুতগতিতে হাঁটিয়া যাওয়া, সঙ্গীটির গা ঘেসিয়া চলা এবং সর্ব্বোপরি তাহার মুখখানি আমার হৃদয় স্পর্শ করিল। তাহার প্রতি সহানুভূতিতে অকারণে আমার বুকের ভিতর কি রকম করিয়া উঠিল। মনে হইল যেমন মানবশিশু বয়স্ক পরিচিত লোকের হস্ত ধরিয়া সে যেদিকে লইয়া যায় সেই দিকেই বিশ্বাস সহকারে স্বচ্ছন্দগতিতে অগ্রসর হইতে থাকে, এই মেষশিশুও যেন সেইরকম সরল বিশ্বাসে মাংস-বিক্রেতার অনুগমন করিতেছে। এখনও তাহার কোমল মুখখানি, সকরুণ দৃষ্টি, আমার মনে পড়ে, এবং বুকের ভিতর রক্ত প্রবলবেগে আন্দোলিত হইয়া উঠে। ইহার কারণ খুঁজিয়া পাই না।

১৯শে এপ্রিল, শনিবার কলেজের গ্রীষ্মাবকাশ আরম্ভ হইল, ৫ই জুলাই খুলিবার কথা আছে। ছুটির ভিতর এখন মাত্র একটি ছেলে পড়ান আছে; অন্য কোন কাজ নাই, সুতরাং কিছুদিন বিশ্রাম ভোগ করিতে পাইব।

(১২)

২রা মে সকাল বেলা পড়াইবার জন্য সার্পেণ্টাইন লেনে তারাপদ-দের বাড়ীতে প্রবেশ করিতেছি, দেখিলাম তাহাদের ঝি একটি পাত্রে,

করিয়া উনানের ছাই লইয়া ফেলিবার জন্য বাহিরের দিকে যাইতেছে। হঠাৎ সম্মুখীন হইবামাত্র ঝি সশব্যস্ত হইয়া তাহার ছাইয়ের পাত্রটি অপর হস্তে আচ্ছাদিত করিয়া আমার দিকে পিছু ফিরিয়া আড়াল করিয়া দাঁড়াইল। আমি তাহার ব্যস্ততার অর্থ বুঝিতে পারিলাম, ছাই অশুভ জিনিষ, মাষ্টার মহাশয় পড়াইতে আসিতেছেন, ছাইয়ের পাত্র তাঁহার সম্মুখে ধরা সুশোভন নহে। আমার মুখে ঈষৎ হাসির সহিত মনে অন্যরকম ভাবের উদয় হইল। ভাবিলাম, ছাই তো অশুভ নহে, মহাদেব ইহা দেহে অবলেপন করিয়া থাকেন, হীরার ঊর্দ্ধে ইহার স্থান। হীরা মণিমুক্তাদি মানুষের নশ্বর দেহ শোভিত করে আর ভস্ম মহেশ্বরের রজতগিরিনিভ দেব-অঙ্গে স্থান পাইয়া থাকে। আমার এত যত্নের দেহও তো একদিন মুষ্টিমেয় ভস্মরাশিতে পরিণত হইবে! ভস্মের অনাদর করা মানুষের শোভা পায় না।

১৫ই মে সকালে সার্পেণ্টাইন লেনে যাইবার জন্য সার্কুলার রোডে ট্রামের জন্য অপেক্ষা করিতেছি, দেখিলাম একটি বৃদ্ধা রমণী মাথায় শাকপূর্ণ এক বৃহৎ টুগ্‌রী লইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে মাণিকতলা বাজারের দিকে অগ্রসর হইতেছে। বৃদ্ধা জরাগ্রস্ত ও দুর্ব্বল, মাথার ভারে মন্থরগতি। আমার প্রায় নিকটে আসিয়া রাস্তার ধারে ট্রামের যন্ত্রপাতি রাখিবার লৌহস্তম্ভের উপর বোঝাটি অতিকষ্টে নামাইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল। এক মুষ্টি উদরান্নের জন্য এই বৃদ্ধ বয়সেও তাহার কষ্ট ও পরিশ্রম দেখিয়া আমি দুঃখিত হইলাম। ভাবিলাম ভগবানের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ না করিয়া এই বৃদ্ধা পশুর অধিক পরিশ্রম করিতেছে, আর ভগবান আমাদিগকে অঞ্জলিপূর্ণ করিয়া অন্ন ঢালিয়া দিলেও আমাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় না, বরং আরো কেন পাইলাম না ইহা মনে করিয়া ভগবানের বিরুদ্ধে কত অভিযোগ আনয়ন করি!

সমুর অসুখের সংবাদ পাইয়া ১৯শে মে দ্বিপ্রহরে বাসে করিয়া বালী যাইলাম। তাহাদের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম যে, সমুর অত্যন্ত জ্বর এবং প্রবল আমাশয়। কিছুদিন যাবৎ পুনঃপুনঃ আমাশয়ে ভুগিয়া সমু অস্থিচর্ম্মসার হইয়া গিয়াছিল। সাধারণতঃ এই বালক আনন্দপ্রিয়, আমাকে দেখিলেই খুব স্ফূর্ত্তি করিয়া থাকে। এবার ব্যাধির তাড়নায় তাহার মুখে কথা নাই। শরীরে হাড়কয়খানি আছে মাত্র, উঠিয়া বসিবার শক্তি পর্য্যন্ত লোপ পাইয়াছে। আমাকে দেখিয়া অতি মৃদুস্বরে ২।১টী কথা কহিল। আমি দুইটি টাকা তাহার হাতে দেওয়ায় সে ঈষৎ হাসিয়া টাকা দুইটি লইয়া তাহার মা'র হাতে দিল। অমু আমাকে দেখিয়া চিনিতে পারিল, এবং যতক্ষণ আমি ছিলাম সমস্ত দাঁতগুলি বাহির করিয়া পুনঃপুনঃ হাসিতেছিল এবং আমার সহিত হুড়াহুড়ি করিল। বৈবাহিক মহাশয়ের বৃদ্ধা খুড়িমা আজ কিছুদিন হইল পরলোক গমন করিয়াছেন, তাহার পর হইতেই ইঁহাদের সংসারে অসুখ-বিসুখের বিরাম নাই। জীবন, বেহাইমহাশয়, বেয়ান ঠাকুরাণী, সমু ও অমু সকলেই মধ্যে মধ্যে অসুখে পড়িতেছেন। কিন্তু সমুর অসুখ অত্যন্ত বেশী হওয়ায় তাহার জন্য সকলেই উৎকণ্ঠিত। ভগবানের দয়ায় সমু এখন অপেক্ষাকৃত ভাল, অন্ন পথ্য করিয়াছে, তবে এখনও হাঁটিয়া বেড়াইবার শক্তি হয় নাই।

(১৩)

আমার তিনটি কাচের আলমারী ছিল, তাহার ভিতর বই রাখিতাম। পূর্ণিমার শ্বশুর বাড়ীতে তাহার ঘরে কাচের আলমারী ছিল না, জিনিষপত্র রাখিবার অসুবিধা দেখিয়া আমি তাহাকে একটি কাচের আলমারী দিয়াছি। আজকাল কাচের আলমারী দুষ্প্রাপ্য,

পয়সা খরচ করিলেও পছন্দমত জিনিষ পাওয়া যায় না। আমার মেয়েদের আত্মসম্মানবোধ প্রায় আমারই মত প্রখর, কোন জিনিষ তাহারা বাবার নিকটও চাহিয়া লয় না। পূর্ণিমাও আলমারী আমার নিকট চাহে নাই, আমি নিজেই দিতে চাহিয়াছিলাম। ২০শে মে দ্বিপ্রহরে ভাত খাইবার পর বাহিরের ঘরে পাখা খুলিয়া মাদুর পাতিয়া শুইয়া আছি, আরতি বসিয়া গল্প করিতেছে। কথা প্রসঙ্গে আলমারীর কথা উঠিলে আরতি বলিল, "বাকী যে আলমারী দুটি আছে তা আমার, আর কেউ পাবে না। আর যে সব জিনিষ আছে গ্রামোফন টেবিল চেয়ার সব আমার।" আমি বলিলাম "কেন? ওদের তিন-জনের তো ভাগ আছে।" আরতি উত্তর করিল "ওরা মার কাপড় চোপড় সব পরে পরে ছিঁড়েছে, আমি কিছু পরতে পাইনি, এ সব জিনিষ যেন আপনি চার ভাগ ক'রবো বল্‌বেন না।" আমি মনে মনে খুব হাসিলাম। আরতির শৈশবে তাহার বোনেরা তাহাদের মায়ের কাপড় হয়তো পরিয়াছিল, আরতির পক্ষে তখন দশহাত কাপড় পরা অসম্ভব ছিল বলিয়া সে বঞ্চিত হইয়াছিল। আজ তাহার ক্ষতিপূরণস্বরূপ, জীর্ণ বস্ত্রের পরিবর্ত্তে টেবিল, চেয়ার, গ্রামোফন সব দাবী করিতেছে। সর্ব্বাপেক্ষা কৌতুকের ব্যাপার এই যে, এখন হইতেই বাবার বাড়ীর প্রাচীর অতিক্রম করিয়া কোন্ এক অজানা বাড়ীর প্রতি তাহার কল্পনা-দৃষ্টি চলিয়া যাইতেছে, সেখানকার ঘর বাড়ীগুলি সাজাইবার জন্য আস্‌বাবপত্রও কল্পনার বেগে উড়িয়া যাইয়া এখন হইতেই যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইতেছে।

পূর্ণিমার বিবাহের পর হইতে আজকাল আরতিকে বাড়ীতে প্রায়ই একলা থাকিতে হয়। একে দুরন্ত মেয়ে, তাহার উপর সঙ্গীহীন। সকাল-বিকালের রান্নার ভার একাই তাহার উপর। দিনের বেলা

তাহার ঘুম নাই, একবার এ বাক্স খুলিতেছে, একবার অন্যটা, পাঁচবার করিয়া সংসারের হিসাব মিলাইতেছে, টাকা পয়সা গুণিতেছে, কখনও বা বিনা প্রয়োজনে নীচে নামিতেছে, বর্ষার জন্য ঘুঁটে কিনিয়া সঞ্চয় করিতেছে, কয়লা গুছাইয়া রাখিতেছে, গুল দিতেছে। এইরূপে কাজ খুঁজিয়া খুঁজিয়া আরতিকে সময় কাটাইতে হয়। মনের স্ফূর্ত্তিও তাহার অপেক্ষাকৃত কম—ইহা একটি লক্ষণ দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। পূর্ব্বের মত ক্ষুধার তীব্রতা আজকাল তাহার নাই, বিকালে সে প্রায়ই খাবার খায় না, দিনের বেলা এবং রাত্রিতেও তাহার আহারের পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে। এই সমস্ত কারণে তাহাকে মধ্যে মধ্যে বিকাল বেলা পাশের ডাক্তারবাবুর বাড়ীতে বেড়াইতে যাইতে বলি। সেখানে ডাক্তারবাবুর নাতনীদের ২।৩ জন তাহার প্রায় সমবয়সী। বিশেষ করিয়া মনু তাহার বন্ধু, মনুও কোন কোন দিন আমাদের বাড়ীতে আরতির সহিত গল্প করিতে আসে। একদিন সন্ধ্যাবেলায় আরতি ডাক্তারবাবুর বাড়ীতে বেড়াইয়া ফিরিয়া আসিয়া আমাকে বলিল, "আজ একজন মেয়ে ডাক্তারবাবুর বাড়ীতে বেড়াতে এসেছিল, তার নাম রুক্ষিণী।" আমি তো এই অপূর্ব্ব নাম শুনিয়া হাসিয়াই অস্থির। আমি বলিলাম এসব আধুনিক নাম, মেয়েটির চুল এবং মেজাজ রুক্ষ বলিয়াই বোধ হয় তাহার এই নামকরণ হইয়াছে। আরতি বলিল, "হ্যাঁ, চুলটা রুক্ষ, রুক্ষ দেখতে, মেয়েটাও খুব গুমুরে। চেয়ারে বসে পায়ের উপর পা দিয়ে বই পড়তে লাগল। শান্তা খুব মিশুক্, কথা কইতে গেল, কিন্তু মেয়েটা কথাও কইলে না। কেবল বই পড়ছে। এক একবার আড়চোখে দেখ্ছিল কে কি কর্চ্চে।" আরতির বর্ণনা-কৌশল ও চরিত্র-বিশ্লেষণ দেখিয়া হাসিলাম, আজ আধুনিকা কিশোরীর "রুক্মিণী" নাম পুরাতনপন্থীমেয়েদের অজ্ঞতার

অস্পষ্টতায় "রুক্মিনী" নামে পরিণত হইয়াছে। একটা মনোহর নাম রাখিয়াও মানুষের স্বস্তি নাই।

৫ই জুন রাত্রিশেষে এক বিরাট ইংরাজ, ক্যানাডিয়ান ও আমেরিকান বাহিনী জাহাজ ও এরোপ্লেনযোগে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করিয়া ফ্রান্সের উপকূলে নর্ম্যাণ্ডিতে অবতরণ করিয়াছে। ইহাই বহুপ্রত্যাশিত, দ্বিতীয় রণাঙ্গন। তুমুল যুদ্ধ চলিতেছে। উভয় পক্ষই বিপুল আয়োজন করিয়াছে। ইহারই ফলাফলের উপর যুদ্ধের জয়-পরাজয় নির্ভর করিতেছে। এই বৎসরের মধ্যেই ইউরোপের যুদ্ধ শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে।

মার একখানি চিঠি পাইলাম যে ৭ই জুন, ২৪শে জ্যৈষ্ঠ রাণাঘাটের নিকট কোন এক গ্রামে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিনয়ের বিবাহ হইবে। মা আমাকে বিবাহ উপলক্ষ্যে যাইতে লিখিয়াছেন। বিনয়ের স্বাস্থ্য ও আয় বিবেচনা করিয়া তাহাকে পূর্ব্বে অনেকবার বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম। আজ ৪২।৪৩ বৎসর বয়সে ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়া, অতি সামান্ত বেতনের উপর নির্ভর করিয়া হঠাৎ সে বিবাহ করিতে মনস্থ করিয়াছে শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। সংসার কি কঠিন স্থান তাহা এতদিন তাহার বুঝিতে পারা উচিত ছিল। প্রৌঢ় বয়সে বিবাহের মোহ তাহার দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক। যাহা হউক আমাকে না জানাইয়া সে বিবাহ করিতে স্থির করিয়াছে, দায়িত্ব সে আপনার স্কন্ধে লইয়াছে, ভাল অথবা মন্দ কর্ম্মফল তাহার নিজের, অপরের নহে।

(১৪)

১২ই জুন তারিখের "যুগান্তর" ও অন্যান্য খবরের কাগজে পড়িলাম যে, ছাপ্‌রা জেলায় জনৈক দরিদ্র বিধবা উদরান্নের সংস্থান করিতে

না পারিয়া শিশুসন্তান সহ আত্মহত্যার চেষ্টা করার অপরাধে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। "যুগান্তর" ১২।৬।১৯৪৪ হইতে ঘটনাটি উদ্ধৃত করিতেছি। "ছাপরা ১১ই জুন,—৪০ বৎসর বয়স্কা একজন স্ত্রীলোক দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা অনুযায়ী সারণের দায়রা জজ কর্ত্তৃক যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।.........অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, গোরক্ষপুরের সুরজী মালাহীন তাহার স্বামীর মৃত্যুর পর কলিকাতায় ঝির কাজ করিতেছিল। কিন্তু উহা দ্বারা খরচ চালাইতে না পারায় সে কলিকাতা ছাড়িয়া বাড়ীর দিকে রওনা হয় এবং তাহার তিনটি শিশুসন্তানের জন্য খাদ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ছাপ্‌রায় গাড়ী হইতে নামিয়া পড়ে। সন্তান তিনটি পাঁচ ছয় দিন অনাহারে ছিল। খাদ্য সংগ্রহ করিতে না পারিয়া সে প্রথমে তাহার বড় দুইটি সন্তানকে নদীতে ফেলিয়া দেয় এবং পরে ছোট সন্তানটিকে কোলে করিয়া নিজে নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়ে। একটি আট বৎসরের বালক এই ঘটনা দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠে এবং বহুলোক সেখানে আসিয়া স্ত্রীলোকটি ও তাহার বড় দুইটি সন্তানকে উদ্ধার করে। পরদিন সকালে ছোট ছেলেটির মৃতদেহ নদীতে ভাসিতে দেখা যায়।"

ঘটনাটি খবরের কাগজে সহজ ভাবেই লেখা হইয়াছে, যেন ইহার মধ্যে বিশেষত্ব কিছুই নাই। কালের অন্ধকারে এই নিঃস্ব বিধবা কয়েকদিনের মধ্যেই কোথায় অন্তর্হিত হইবে তাহার স্থিরতা নাই। কিন্তু মহাশক্তিশালী ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট এই দেশের প্রভু, এই দেশে কত বড় বড় মনীষী, ধনী, দার্শনিক পণ্ডিত, কর্ম্মবীর, দেশপ্রেমিক এখনও বর্ত্তমান, এই দেশে লক্ষ লক্ষ ইংরাজ ও আমেরিকান সৈন্য ও কর্ম্মচারী এই দুর্ভিক্ষের দিনেও বিলাসিতার মধ্যে আকণ্ঠনিমগ্ন হইয়া আছে। অথচ এই দেশেরই একজন সহায়হীন বিধবা কঠোর

পরিশ্রম করিয়াও একমুষ্টি অন্ন সংগ্রহ করিতে পারিল না। চল্লিশ কোটী দেশবাসীর মধ্যে একজনও তাহার ৫।৬ দিনের অনাহারক্লিষ্ট শিশু-সন্তানগুলির মুখে একগ্রাস অন্ন তুলিয়া দিল না, অবশেষে যখন ক্ষুধা ও স্নেহের যন্ত্রণায় ক্ষিপ্ত হইয়া নদীতে ঝাঁপ দিল তখন এই দেশের শান্তিরক্ষক পুলিশ শাস্তির জন্য তাহাকে বিচারালয়ে প্রেরণ করিল এবং এই দেশেরই একজন বিচারপতি তাহার মর্ম্মস্থানের দিকে না তাকাইয়া নিষ্ঠুর আইনের পুঁথি ঘাটিয়া তাহাকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড প্রদান করিল। ছোট ছেলেটি তাহার ক্রোড়ে ছিল, শেষ মুহূর্ত্তে তাহাকে ক্রোড়ে লইয়াই অভাগিনী নদীতে ঝাঁপ দিয়াছিল। এই মর্ম্মের ক্ষত দেখিবার চক্ষু বিদেশী গভর্ণমেণ্টের নাই, দেশবাসীরও নাই কিন্তু যে গভর্ণমেণ্টের শাসনে, যে সমাজের উদাসীনতায় এইরূপ আত্মহত্যার চেষ্টা সম্ভবপর হইয়া থাকে সেই গভর্ণমেণ্ট ও সমাজ মহাকালের বিচার এড়াইতে পারিবে না। এই বুভুক্ষু বিধবা তাহার ক্ষুধার্ত্ত ছেলে-গুলির মুখের দিকে যখন ৫।৬ দিন নিরন্তর তাকাইয়া ছিল, তখনকার সেই দৃষ্টিতে সেই মাতৃপ্রাণের উষ্ণশ্বাসে যে অগ্নি প্রচ্ছন্ন ছিল তাহা নদীর জলের মধ্যেও নির্ব্বাপিত হয় নাই। কে জানে হয়ত সেই আগুণ ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের লৌহস্তম্ভের ভিত্তিকে একদিন তৃণের মত দগ্ধ করিয়া দিবে, হৃদয়হীন সমাজকে হয়ত এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে বহুবর্ষ দুঃখের তিমিরে নিমগ্ন থাকিতে হইবে। এমন অভিশপ্ত গভর্ণমেণ্ট, এমন অভিশপ্ত জাতি পৃথিবীর আর কোথাও কি আছে?

(১৫)

১৬ই জুন সন্ধ্যাবেলা প্রায় ৭॥০টার সময় বারান্দায় বসিয়া আছি পাড়ার একটি ছেলে আসিয়া সংবাদ দিল যে, বিখ্যাত

বৈজ্ঞানিক Sir P. C. Roy সন্ধ্যা প্রায় ৬৷৹ টার সময় Circular রোডস্থ Science College-এর একটি প্রকোষ্ঠে দেহত্যাগ করিয়াছেন। কিছুদিন যাবৎ প্রফুল্লচন্দ্র নিউমোনিয়া রোগে ভুগিতেছিলেন। তিনি রসায়ণ শাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। চিরকুমার থাকিয়া তিনি দেশের নানাবিধ হিতকর কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালী যুবকদিগকে ব্যবসার দিকে দৃষ্টি দিতে তিনি সর্ব্বদাই উপদেশ দিতেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় ৮৩ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুতে বাংলা দেশ একজন পণ্ডিত ও কর্ম্মবীর হারাইল।

(১৬)

প্রায়ই দেখিতে পাই একজন মধ্যবয়স্কা বিধবা ঝি এই পাড়ার কোন কোন বাড়ীতে কাজ করিতে আসে। তাহার ২।৩টি ছেলেমেয়ে। ইহাদের মধ্যে একটি প্রায় ১৷৷৹/২ বৎসরের মেয়েকে সকাল এবং বিকাল সব সময়ই তাহার ক্রোড়ে দেখিতে পাই। মেয়েটির সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে ঝিটি তাহার কর্ম্মস্থানে যায়—আমি অনেক দিন লক্ষ্য করিয়াছি। এই বিধবা দীর্ঘাকার এবং সবলদেহ, কিন্তু কিছুদিন হইতে তাহার মুখটি শুষ্ক এবং দেহ ক্ষীণ বলিয়া মনে হইতেছে। বোধহয় পরিশ্রমের তাড়নায় এবং যথেষ্ট অন্নের অভাবে বিধবা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে। অথচ ইহার বিরক্তি দেখি না, মেয়েগুলির উপর অত্যন্ত স্নেহশীল ও ধৈর্য্যশীল বলিয়া ইহাকে মনে হয়। একটি বিড়ালীও কিছুদিন হইতে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। ইহার বাচ্চা হইয়াছে—আমাদের পাশের গলিতে এক অন্ধকারপূর্ণ নির্জ্জন স্থানে শুইয়া বিড়ালী ইহার বাচ্চাগুলিকে স্তন দেয়। মধ্যে মধ্যে আমার বাহিরের ঘরের বারান্দায় আসিয়া কাতর শব্দ করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া আহার প্রার্থনা

করে। আরতি মাছের কাঁটা অথবা ভাঁড়ে করিয়া একটু দুগ্ধ দিলে ব্যগ্র হইয়া তাহা আহার করে। এই বিড়ালীর স্তনগুলির চারিপার্শ্বের লোম বাচ্ছারা চাটিয়া চাটিয়া প্লেন করিয়া দিয়াছে, মধ্যস্থানে ঈষৎ রক্তবর্ণ স্তনের বোঁটাটি বড়ই সুন্দর দেখায়। আমি বিধবা ঝি ও এই বিড়ালীকে দেখিয়া মনে মনে ভাবি যে, ইহারা উভয়েই মহামায়ার উদ্দেশ্য নিজ নিজ জীবনে অজ্ঞাতসারে পালন করিয়া চলিয়াছে। মহামায়া সৃষ্টি ও পালন করেন, এই ঝি ও বিড়ালী নিজ নিজ শক্তি অনুসারে সেই উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করিতেছে। একই উদ্দেশ্য সাধনের ফলে মহামায়া, বিধবা ঝি ও বিড়ালী যেন একই ক্ষেত্রে একযোগে পাশা-পাশি দাঁড়াইয়া আছে।

(১৭)

গ্রীষ্মের অবকাশ প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছে; সমস্ত ছুটিটাই বিশ্রামের মধ্য দিয়া কাটিয়াছে। প্রায় প্রত্যহ বিকালবেলা ছোট ডাক্তারবাবুর বাড়ীর ধারে বারান্দায় বসিয়া নানাবিধ গল্পগুজবের মধ্যে অতিবাহিত করিয়াছি। এই বারান্দাটি প্রতি অপরাহ্নকালে একটি ক্ষুদ্র সভায় পরিণত হইয়া থাকে। সভ্যসংখ্যা অধিক নহে কিন্তু বাংলা সমাজের প্রায় সমস্ত সম্প্রদায়েরই প্রতিনিধি সেখানে বিরাজমান। কলেজের অধ্যাপক, পাশকরা এ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার, না-পাশ-করা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক, অভিজাতবংশসম্ভূত জমিদার, কর্ম্মপাশ-মুক্ত সহরবাসী ধনী, ব্যবসাক্ষেত্রে অবসরপ্রাপ্ত ভদ্রলোক,—সকলেই এই সান্ধ্যসমিতির প্রায় নিত্য-উপস্থিত সভ্য। ইঁহাদের মধ্যে অধ্যাপক ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ব্যতীত অপর কেহ সময়ের দাসত্ব করেন না। তাঁহাদের অখণ্ড অবসর। সভাস্থানের মর্য্যাদাও বড় কম

ছিল না। অপরাহ্ণ হইবার বহু পূর্ব্ব হইতে ডাক্তারবাবুর ঝি-চাকরেরা বারান্দাটিকে ধোয়ামোছা করিত, এমন কি কোন কোন দিন স্বয়ং ছোট ডাক্তারবাবু তাঁহার জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট-করমর্দ্দিত হস্তে সম্মার্জ্জনী ধারণ করিয়া অপর হস্তে জলের পাত্র লইয়া বারান্দা ধুইতে আরম্ভ করিতেন। আমি সম্মার্জ্জনীর শব্দ শুনিতে পাইলেই ধীরে ধীরে বসিবার ঘর হইতে বাহিরে যাইয়া সেই অপূর্ব্ব দৃশ্য উপভোগ করিতাম। শুভ্র পাঞ্জাবী অথবা মূল্যবান গেঞ্জি-পরিহিত ডাক্তারবাবু সুদীর্ঘ কোঁচাকে কটী-দেশে সযত্নে রক্ষা করিয়া, বুরুশ-করা কালো মসৃণ চটি জুতা পরিয়া, ক্ষয়িষ্ণু এক সম্মার্জ্জনী হস্তে অতি ধৈর্য্যের সহিত নিবিষ্ট মনে বারান্দা ধুইতেছেন। তিনি চলিয়া যাইবার খানিকক্ষণ পরে হয়ত পাড়ার কোন বালক অথবা ফেরীওয়ালা সেখানে পা দিয়া কর্দ্দমাক্ত করিল, কখনও বা আমি কোন প্রয়োজনে জুতা পরিয়া তাহার উপর দিয়া হাঁটিয়া যাইলাম, জুতার দাগ পড়িল—ডাক্তারবাবু কিয়ৎক্ষণ পরে বাহিরে আসিয়া কাদা দেখিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া মৃদু অস্পষ্টশ্রুত কথায় বিরক্তি প্রকাশ করিতেন, সে দৃশ্যও আমি উপভোগ করিতাম, তবে আমার অপরাধ আমি ভয়ে ভয়ে গোপন করিতাম, আমার জুতার কালো ছাপও বালক অথবা ফেরীওয়ালার বেনামীতেই চলিয়া যাইত। সভ্যদিগের মধ্যে অতিনিয়মিত ভাবে বেলা প্রায় ৫টার সময় আসিতেন শ্রীযুক্ত অপূর্ব্ব কুমার মিত্র। কোন দিন ইনি আসিয়া বাহিরে মাদুর পাতিতেন এবং এক সুবৃহৎ পেয়ালায় ঠাণ্ডা চা ভর্ত্তি করিয়া আনিয়া পান করিতেন। অপূর্ব্ববাবু ডাক্তারবাবুর পিস্তুতো ভাই, উভয়ে প্রায় সমবয়সী। দুই জনের মধ্যে বন্ধুত্বের নিবিড় বন্ধন লক্ষ্য করিতাম এবং অপর কেহ উপস্থিত না থাকিলে উভয়ে অতীত যৌবনের পুরাতন রসাল স্মৃতি লইয়া নাড়াচাড়া করিতেন বলিয়া মনে হইত। অপূর্ব্ববাবু যৌবনে ব্যবসা

করিয়া প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাঁহার অতীত জীবন নিতান্ত উপভোগ-বঞ্চিত বলিয়াও মনে হইত না। অনেকগুলি দন্তবিহীন তোবড়ান গালটি প্রায়ই অযত্নবৰ্দ্ধিত দাড়ির চুলে কণ্টকিত হইয়া থাকে, হাত ও পায়ের নখ দাড়ির চুলকে বৰ্দ্ধনশীলতায় হারাইয়া দেয়, কাপড় ও জামার প্রতি অপূৰ্ব্ববাবুর কোন দৃষ্টি না থাকায় তাহারাও প্রায় মলিন। এই অপরিচ্ছন্নতার জন্য ডাক্তারবাবুর কাছে অপূৰ্ব্ববাবুকে প্রায়ই লাঞ্ছিত হইতে হয়। ধীরে ধীরে স্নেহ ও শ্লেষপূর্ণ তিরস্কার যখন অপূৰ্ব্ববাবুকে লক্ষ্য করিয়া বাহির হইতে থাকে তখন আমি বক্রদৃষ্টিতে এক একবার আমার কাপড়জামাগুলি দেখিয়া লই, দাড়িটিতে হাত বুলাই, কারণ বাহিরে কোথাও কৰ্ম্মস্থলে না যাইতে হইলে ময়লা কাপড়-জামা পরা ও দাড়ি গজাইয়া বসিয়া থাকা আমার স্বভাবসিদ্ধ। এই সান্ধ্যসমিতির অধিকাংশ সভ্যগুলি কলিকাতার অভিজাতবংশসম্ভূত, ময়লা-কাপড়-পরা ছোটলোক বলিতে মাত্র দুইজন লক্ষ্মীছাড়া বিপত্নীক, আমি ও অপূৰ্ব্ববাবু। মাষ্টারী পেশার জোরে আমি রক্ষা পাইতাম, প্রায় অৰ্দ্ধশতাব্দীব্যাপী বন্ধুত্বের খাতিরে অপূৰ্ব্ববাবুর নাম কাটা যাইত না। ডাক্তারবাবুর মুখে শুনিয়াছি অপূৰ্ব্ববাবু অতিশয় সদাশয় নিৰ্ম্মলচরিত্র পরোপকারী ভদ্রলোক, আমি নিজেও তাহার কিছু কিছু পরিচয় পাইতাম। অপূৰ্ব্ববাবুর হাস্যকৌতুকপূর্ণ গল্প বলার অপূৰ্ব্ব ক্ষমতা আছে। দন্ত গলিত হইয়াছে, যৌবন কবে অতীত হইয়াছে তাহার হিসাব নাই, সুখ-দুঃখের সঙ্গিনী বহুদিন হারাইয়া গিয়াছেন, লক্ষ্মী আর ভাণ্ডারের চাবি অপূৰ্ব্ববাবুর হাতে দেন না, অথচ সমস্ত আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক অসুবিধারাশিকে তুচ্ছ করিয়া অপূৰ্ব্ববাবু নিজে হাসেন এবং অপরকেও হাসাইয়া থাকেন। ছোট ডাক্তারবাবু যখন সুরেশবাবু, কালোবাবু, সদানন্দবাবু প্রভৃতি

যৌবনের বন্ধুগণের পুরাতন স্মৃতি-বিজড়িত আদিরসবহুল ঘটনাগুলির পুনরুল্লেখ করেন তখন আমার উপস্থিতিতে সঙ্কুচিত হইয়া অপূর্ব্ববাবু প্রতিবাদ করিয়া ডাক্তারবাবুকে বলেন, "তোমার কেবল পচাল" কিন্তু অপূর্ব্ববাবুর মুখ চোখের অবস্থা দেখিয়া তিনি যে আদিরসের গল্পগুলি কোন অংশে কম উপভোগ করিতেছেন বলিয়া মনে হয় না। একমাত্র অপূর্ব্ববাবুই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ডাক্তারবাবুর ঠাট্টা-বিদ্রূপের চাঁদমারী,—পার্থসারথির মত বক্ষ পাতিয়া অতি প্রসন্নমুখে তিনি ডাক্তারবাবুর নারায়ণী-অস্ত্র গ্রহণ করিয়া থাকেন। ডাক্তারবাবু কৌতুক করিয়া বলেন যে, অপূর্ব্ববাবুর অসুখ হইলেই ডাক্তারবাবুর ভয় হয়, কারণ উভয়েই সমবয়সী সুতরাং চিত্রগুপ্তের নাম রেজেষ্টারী-করা খাতায় তুইটি নাম পরপর লাইনে লেখা থাকাই সম্ভবপর। অতএব অপূর্ব্ববাবুর যদি মৃত্যু হয় তাহা হইলে ডাক্তারবাবুর ডাক পড়িবার সম্ভাবনা থাকায় তিনি অপূর্ব্ববাবুর অসুস্থতার সংবাদমাত্রেই চঞ্চল হইয়া উঠেন। আমি তুই বন্ধুর তর্ক ও রসালাপ খুব উপভোগ করি।

অপূর্ব্ববাবুর পরে ধীর মৃদুগতিতে আসিয়া উপস্থিত হন শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। অতি-শুভ্র বস্ত্র, সযত্ন-কুঞ্চিত পাঞ্জাবী, নিত্য-বুরুশ-করা উজ্জ্বল চটি জুতা, ক্ষৌরকর্ম্ম-শুভ্র বদন, পকেটে তামাকের পাইপ, পাউচ ও দেশলাই,—তাঁহার আভিজাত্যের নিদর্শন। ধনী পিতার প্রচুর অর্থ পাইয়া কোন দিন তাঁহাকে অন্নচিন্তা করিতে হয় নাই, পরের দাসত্বও কখন করেন নাই; স্বচ্ছন্দে সঞ্চিত অর্থে সংসার প্রতিপালন করিয়া বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছেন। তিনি আসিয়াই পাউচ বাহির করিয়া পাইপ খাইতে আরম্ভ করেন, অথবা তামাক দিয়া অতি যত্নসহকারে কাগজে একটি সিগারেট পাকাইয়া ধূমপান করিতে থাকেন। এই সময় মনে হয় তাঁহার মন যেন তূরীয় অবস্থা

প্রাপ্ত হইয়াছে, তিনি আমাদের উপস্থিতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। সুরেশবাবুর বাড়ীতে রেডিও আছে। তিনি আসিবামাত্র কোন কোন দিন বড় ডাক্তারবাবু তাঁহাকে রেডিও-প্রচারিত জাপানী-জার্ম্মানদের সংবাদের কথা জিজ্ঞাসা করেন। হঠাৎ সংবাদের কথা জিজ্ঞাসা করিলেই সুরেশবাবুর প্রসন্নমুখ বিরক্তিতে কুঞ্চিত হইয়া উঠে এবং তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন যে, তিনি বিদেশী সংবাদ কিছুই শুনেন নাই, অথবা শুনিলেও তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু বলিবার নাই। কিন্তু তাঁহার কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম ও ধূমপান করার পর যুদ্ধসংবাদের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি ধীরে ধীরে অনেক নূতন সংবাদ আমাদিগকে দিয়া থাকেন। সুতরাং তিনি আসিবামাত্রই যুদ্ধের খবর কেহ জিজ্ঞাসা করিলে আমি তখনই বুঝি যে, আজ আর সুরেশবাবুর নিকট হইতে বিদেশী রেডিওর কোন সংবাদই বাহির করা যাইবে না। সুরেশবাবু ও ছোট ডাক্তারবাবু উভয়েই সর্ব্বদা বেশভূষার প্রতি মনোযোগী,—মলিন বস্ত্র অথবা শ্মশ্রুকণ্টকিত মুখ আমি একদিনও তাঁহাদের দেখি নাই। যৌবনে উভয়েই যে বেশ উচ্চদরের "Dandy" (বেশভূষা-বিলাসী) ছিলেন তাহার চিহ্ন এখনও লক্ষ্য করিলে ধরা পড়ে। আমি এক এক সময় মনে মনে উভয়ের বেশভূষার পরিপাট্যের তুলনা করি, দেখি যে, বরং কখনও কখনও আমার ও অপূর্ব্ববাবুর কলুষ সংস্পর্শে ডাক্তারবাবুর চটিজুতা অথবা জামা হয়ত ঈষৎ মলিন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সুরেশবাবুর জুতা, কাপড় অথবা জামা একদিনের জন্যও নিষ্প্রভ লক্ষ্য করিলাম না। এই স্বল্পভাষী ও মিষ্টভাষী ভদ্রলোক অর্থ ও যৌবনের মাদকতার ঘূর্ণিপাকে পড়িয়াও জীবনতরীর দিগ্‌দর্শণ-যন্ত্র হারাইয়া ফেলেন নাই, চিত্তের অসীম দৃঢ়তার পরিচয় দিয়া সবলহস্তে ঢেউ কাটাইয়া তিনি অক্ষত দেহে তীরে উঠিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে

দেখি আর ভাবি যে, আমার মত দুর্ব্বলচিত্ত লোক অত অর্থ ও নিরঙ্কুশ জীবনের অধিকারী হইয়া জন্মগ্রহণ করিলে যৌবনের স্রোতে কোথায় ভাসিয়া যাইত তাহার হিসাব মিলিত না।

আমাদের সান্ধ্যসভায় আমরা এই কয়েকজন নানা কলরবে কিছুক্ষণ গল্প করিবার পর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সান্ন্যাল আসিয়া উপস্থিত হন। গলির মোড়ে তাঁহাকে দেখা যাইবামাত্র অপূর্ব্ববাবু পূর্ব্ব হইতেই মাদুরের যথেষ্ট স্থান ছাড়িয়া দিয়া এক পার্শ্বে সঙ্কুচিত হইয়া বসেন এবং নরেন্দ্রবাবু আসন গ্রহণ করিবামাত্র আমাদের কলরব স্থির হইয়া যায়। নরেন্দ্রবাবু জমিদার মানুষ, সন্ধ্যাবেলা জমিদারী কাগজপত্রের বিক্ষুব্ধ আবর্ত্ত হইতে তীরে উঠিয়া আমাদের সভায় হাসিয়া ও গল্প করিয়া জমিদারী-জঞ্জাল-ভারাক্রান্ত মনকে একটু হাল্‌কা করিয়া লইবার জন্য অপেক্ষাকৃত দ্রুতগতিতে আসিয়া উপস্থিত হন। এই কর্ম্মকুশল ভদ্রলোককে দেখিলে আমার Abraham Lincoln-এর কথাগুলি মনে পড়ে—"With the fearful strain that is on me day and night, if I did not laugh, I should die!" নরেন্দ্রবাবু আমাদের নিকট "সান্ন্যাল মহাশয়" নামে পরিচিত এবং সান্ধ্যসভার তিনিই সর্ব্ববাদিসম্মত সভাপতি। ইঁহার পিতা একজন বিখ্যাত জমিদার ছিলেন, এবং সেই জমিদার পিতার তত্ত্বাবধানে নরেন্দ্রবাবু সাহিত্য, আইন, বিজ্ঞান, ডাক্তারী, প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ে জ্ঞান অর্জ্জন করিবার সুযোগ লাভ করেন। কিন্তু আমি অনেক সময় ভাবিয়াছি যে, এই অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি যে কোন একটি বিষয় অবলম্বন করিয়া তাহার চর্চ্চায় লিপ্ত থাকিলে সহজেই বাংলাদেশে বিখ্যাত হইতে পারিতেন, কিন্তু ধনী পিতার একমাত্র পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করায় এই শক্তির সম্যক্ স্ফুরণ হইবার অনেক অন্তরায়

উপস্থিত হইয়াছিল। সান্যাল মহাশয় বন্ধুবৎসল, গুণগ্রাহী, উদারহৃদয় ও পরোপকারী। ছোট ডাক্তারবাবু বলেন যে, নরেন্দ্রবাবুর সহিত অকপট ব্যবহার করিলে তিনি প্রাণপণ শক্তিতে উপকার করিয়া থাকেন, কিন্তু শত্রুতা করিলে, জলে, স্থলে অথবা অন্তরীক্ষে কোথাও তাহার নিষ্কৃতি নাই। যাঁহার বন্ধুত্বের মূল্য আছে তাঁহার শত্রুতাও সাধারণতঃ ভীষণ হইয়া থাকে। পূর্ব্বযুগে বনিয়াদী জমিদার বংশে যেমন দুই একজন কুলতিলক জন্মগ্রহণ করিতেন, সেইরূপ নরেন্দ্রবাবুর মধ্যে জমিদার শ্রেণীর অনেক শ্রেষ্ঠ গুণ দেখিতে পাওয়া যায়। আভিজাত্যাভিমান পুরাতন জমিদার বংশের একটি বিশিষ্টতা। এই বিশিষ্টতা মহাকবি রবীন্দ্রনাথের চরিত্র ও চিন্তাধারাকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। সান্যাল মহাশয়ের পিতামহ ও প্রপিতামহ ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, এবং যথেষ্ট জমিদারীও অর্জ্জন করিয়াছিলেন। যাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য ও সমালোচনা পড়িয়াছেন তাঁহারা জানেন যে, তখন সাহিত্য, সমাজ ও শাসন-ক্ষেত্রে ডেপুটী যুগ চলিতেছিল। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও জমিদার এই অপূর্ব্ব মণিকাঞ্চনযোগের সঙ্গম-ধারায় নরেন্দ্রবাবুর জন্ম হইয়াছিল। সান্যাল মহাশয় তাঁহার পিতামহ শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ সান্যাল সম্বন্ধে একটি কৌতুককর গল্প করিয়াছিলেন, তাহা উল্লেখ করিতেছি। একদিন গৌরবাবু গ্রামের বাটীতে বসিয়া আছেন, সম্মুখস্থ রাস্তা দিয়া একজন কৃষিজীবী লোক যাইতেছিল। গৌরবাবু প্রশ্ন করিলেন, "কে যায়"? —"আজ্ঞে আমি কেষ্টচন্দ্র"। গৌরবাবু হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন, "ধ'রে নিয়ে আয় ব্যাটাকে,—ব্যাটা কেষ্টচন্দ্র!" পথচারী নিজ অপরাধ কিছু বুঝিতে না পারিয়া অজগর-দৃষ্টি-বিমোহিত ক্ষুদ্র পক্ষীর ন্যায় ধীরে ধীরে গৌরগোবিন্দবাবুর দিকে অগ্রসর হইল। গৌরবাবু গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "তোরা কবে থেকে কেষ্টচন্দ্র হ'লি? তোরা যদি কেষ্টচন্দ্র

নাম রাখিস্ তাহ'লে আমরা ছেলেপিলেদের কি নাম রাখ্‌বো! বল্ তোর নাম কেষ্টা!" "আজ্ঞে আমার নাম কেষ্টা,"—ইহা বলিয়া কৃষিজীবী অব্যাহতি পাইল। অথচ গৌরবাবুর দয়াদাক্ষিণ্যেরও সীমা ছিল না। এইরূপ অভিজাত বংশে নরেন্দ্রবাবুর জন্ম হয়, সুতরাং তাঁহার ভিতর এখনও সেইরূপ বুদ্ধির উৎকর্ষ, কৃষ্টি ও বংশ-গৌরব যথেষ্ট পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই ভদ্রলোকের স্মরণশক্তি দেখিয়া আমি বিস্মিত হই। ইংরাজী সাহিত্যের নানাস্থান হইতে লাইনের পর লাইন যখন বলিয়া যাইতে থাকেন তখন বিশেষ কিছু মনে না পড়িলেও অধ্যাপকের মান বাঁচাইবার জন্য মাথা নাড়িয়া সায় দিতে হয়, ডাক্তারী কোন বিষয় লইয়া আমার দুর্ব্বোধ্য ভাষায় অনেক সময় তাঁহাকে ছোট ও বড় ডাক্তারবাবুদের সহিত সমানভাবে আলোচনা করিতে দেখিয়াছি। ছোট ডাক্তারবাবু কর্ম্মোপলক্ষ্যে ভারতবর্ষের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছেন, সান্ন্যাল মহাশয় কৌতুক করিয়া বলেন যে, মেয়ের পাত্র খুঁজিবার জন্য ও ব্যবসা উপলক্ষ্যে তাঁহাকেও দূর-দূরান্তর ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। ইঁহারা দুইজনে যখন নানাদেশের আচার-ব্যবহার রীতিনীতি লইয়া আলোচনা করেন তখন আমি কল্পনানেত্রে কিছু কিছু দেখিতে আরম্ভ করি, কিন্তু কল্পনাও কতকটা বাস্তবতার উপর নির্ভরশীল, আর বাস্তবতাক্ষেত্রে আমার দৌড় কাঁচড়াপাড়া অথবা সাঁইথিয়ার অধিক নহে। কথাবার্ত্তা কহিয়া মানুষকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভুলাইয়া রাখিবার ক্ষমতা সান্ন্যাল মহাশয়ের অদ্ভুত। রাজনীতি, যুদ্ধনীতি, ধর্ম্ম ও সমাজ সব বিষয়েই বলিবার শক্তি তাঁহার আছে। কৌতুকপ্রদ ঘটনার বর্ণনা শুনিতে শুনিতে কতদিন যে হাসিয়াছি তাহার নির্ণয় নাই। অপেক্ষাকৃত স্থূলকায়, শ্যামবর্ণ, ইংরাজ মনীষী বার্কের ন্যায় সুবৃহৎ ও সুগঠিত মস্তক-

বিশিষ্ট সান্ন্যাল মহাশয়ের জলদমন্দ্রস্বর আমি আমার বাহিরের ঘরে বসিয়াও স্পষ্ট শুনিতে পাই। কত সময় ঘটনা-প্রসঙ্গে তাঁহার মদ্যপায়ী ধনী বন্ধুদের সম্বন্ধে গল্প করিয়াছেন, কিন্তু তিনি নিজে কখনও মদ্য স্পর্শ করেন নাই। বিশ্বলক্ষ্মী তাঁহাকে অঞ্জলি ভরিয়া অর্থ দিয়াছেন, সময় সময় কনকে-রতনে হাত ছাপাইয়া উঠিয়াছে। তথাপি জীবনের সরল পথ পরিত্যাগ করিয়া বক্র অথবা নিন্দনীয় পথ অবলম্বন করেন নাই। অর্থ আছে, কিন্তু অর্থের মাদকতা নাই। সান্ন্যাল মহাশয় অনেক সাধুসঙ্গ করিয়াছেন—ইহাও তাঁহার সৌভাগ্যের পরিচায়ক। মানুষের ক্ষণভঙ্গুর মন ও চরিত্র কত দেখিয়াছি, আবার ইস্পাতের মত দৃঢ় চরিত্রও দেখিলাম। একদিন কথা-প্রসঙ্গে সান্ন্যাল মহাশয় বলিলেন, তাঁহার বাড়ীতে দশজন দাসদাসী। আমি বাড়ীতে আসিয়া আরতির কাছে সেই কথা বলায় ক্ষুদ্র একটি সংসারে দশজন ভৃত্যের কথা শুনিয়া সে বিস্ময়-বিস্ফারিত চক্ষে আমার দিকে চাহিয়া রহিল, আমি ভাবিলাম আরতির বৃদ্ধ পিতাই ইহা শুনিয়া নির্ব্বাক বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিল, আরতির বিস্মিত হওয়া আর বিচিত্র কি!

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দে ও শ্রীযুক্ত সদানন্দ পালিত সময় সময় আসিয়া আমাদের সান্ধ্যসভায় যোগদান করেন। চারুবাবু হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার। তিনি কয়েক দিন হয়ত উপর্য্যুপরি আসিয়া কয়েকদিন একেবারেই দেখা দেন না। চারুবাবুও হাস্যকৌতুকপূর্ণ লোক। প্রায়ই শুনি, তাঁহার মক্কেলের বাড়ী নিমন্ত্রণ আছে। আমি ভাবি এমন ডাক্তারী করায় যথেষ্ট সুখ আছে, ভিজিট্‌তো আসিলই উপরন্তু পরের বাড়ীতে মধ্যে মধ্যে মুখ বদ্‌লাইয়া রসনার অসীম তৃপ্তিও হইয়া গেল। সদানন্দবাবু প্রতিদিন উপস্থিত হন না, তবে যেদিন আসেন সেদিন তাঁহার বাল্যবন্ধু ছোট ডাক্তারবাবু ও সুরেশবাবুর সহিত মধ্যে মধ্যে যৌবনের যে সমস্ত

স্মৃতি লইয়া নাড়াচাড়া করেন তাহাতে আমিও যথেষ্ট আনন্দ পাইয়া থাকি। কিছুদিন যাবৎ সদানন্দবাবু অসুস্থ বলিয়া আমাদের এখানে উপস্থিত হইতে পারেন না। ইঁহারা সকলেই আমার অপেক্ষা বয়সে বড় তথাপি আমি যেন ইঁহাদেরই একজন হইয়া নানাবিধ হাস্যকর আলোচনায় প্রায় ২৷৩ ঘণ্টা অতিবাহিত করি। এবার গ্রীষ্মের ছুটী বেশ আনন্দের মধ্যেই কাটাইয়াছি।

(১৮)

গ্রীষ্মাবকাশের পর ৫ই জুলাই কলেজ খুলিয়াছে। আমার পাশের বাড়ীতে শ্রীযুক্ত পঙ্কজ কুমার দাস বাস করেন। পঙ্কজবাবুদের বৃহৎ সংসার, বৃদ্ধ পিতামাতাও বর্ত্তমান। পঙ্কজবাবুর বৃদ্ধা মাতা যে ঘরটিতে বাস করেন তাহার ঠিক সম্মুখের ঘরেই আরতি রাত্রিতে নিদ্রা যায়। দুইটি ঘরের সাম্‌না-সাম্‌নি জানালার মধ্যে মাত্র একটি সরুগলির ব্যবধান। এই বৃদ্ধা মহিলা আমার মেয়েদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল, এবং প্রায়ই জানালায় দাঁড়াইয়া "ভাই, ভাই" বলিয়া আরতির সহিত গল্প করেন। হঠাৎ একদিন সন্ন্যাস রোগে বৃদ্ধা শয্যাশায়ী হইয়া পড়েন এবং ১১ই জুলাই সমস্ত রাত্রি শ্বাসকষ্ট হওয়ায় বৃদ্ধার জীবন সম্বন্ধে সকলেই আশা পরিত্যাগ করেন। পরদিন সকালে আরতির শুষ্ক মুখ দেখিয়া আমি কারণ জিজ্ঞাসা করিলে আরতি বলিল যে, সমস্তরাত্রি তাহার নিদ্রাকর্ষণ হয় নাই। সে বলিল যে, পঙ্কজবাবুর মা সমস্তরাত্রি মৃতপ্রায় অবস্থায় ছিলেন সুতরাং তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য তখন হইতেই যমদূতগণের যাতায়াত নিশ্চয়ই আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু আরতি ও বৃদ্ধার জানালা দুইটি অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী, সুতরাং যদি যমদূতগণ বাড়ীর নম্বর ভুল করিয়া আরতির ঘরেই ঢুকিয়া পড়ে এই আশঙ্কায়

আরতি সমস্ত রাত্রি নিদ্রা যাইতে পারে নাই। আমি তাহাকে সাহস দিব কি যমদূতগুলির নম্বর ভুলের সম্ভাবনার কথা শুনিয়া উচ্চকণ্ঠে হাসিতে আরম্ভ করিলাম। যমদূতেরা ইংরাজি জানেনা, সুতরাং বাড়ীর নম্বর ভুল হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। আমাদের বাড়ীতে ৺চণ্ডীর পুঁথী আছে বলিয়া আশ্বাস দিলেও আরতির ভয় সম্পূর্ণ দূর হইল না। বৃদ্ধা মহিলা ১২ই জুলাই বেলা ১০টার সময় দেহত্যাগ করেন।

(১৯)

৭ই আগষ্ট সোমবার রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুদিন বলিয়া কলেজের ছুটী ছিল। আমি বিকালে অরুণাদেব সহিত দেখা করিবার জন্য কালীঘাট গিয়াছিলাম, ফিরিবার সময় বাস হইতে কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে নামিতে যাইতেছি এমন সময় বাসটি ছাড়িয়া দিল। আমি বাসের গতিবেগ সামলাইতে না পারিয়া সামনের দিকে ছিট্‌কাইয়া পড়িলাম, রাস্তার উপর হাতঠেলা গাড়ী দাঁড়াইয়া ছিল, আমি তাহারই উপর নিক্ষিপ্ত হইলাম। চোখে চশমা, হাতে ছাতা। চশমা চূর্ণবিচূর্ণ হইবার কথা, মস্তকে গুরুতর আঘাত পাইবার সম্ভাবনা অথচ জানিনা কিরূপে মুখে ও আঙ্গুলে সামান্য আঘাত পাইয়াই রক্ষা পাইলাম। আজকাল কলিকাতার রাজপথে মোটরবাস, মিলিটারী লরী, ট্রাম, প্রভৃতি হইতে অনবরতই দুর্ঘটনা হইতেছে, কত লোক মারা যাইতেছে। আমি ধীরে ধীরে বাড়ীতে আসিয়া ভাবিতে লাগিলাম যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিচার করিলে রক্ষা পাইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না, অথচ কি এক অজ্ঞাত শক্তি আমাকে যেন দুইবাহু প্রসারিত করিয়া বিপদ হইতে রক্ষা করিল। বাড়ীতে বসিয়া ভিতরটা থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল, রাত্রিতে সামান্য জ্বর হইল, পরদিন স্নান ও আহার বন্ধ রাখিয়া সুস্থ হইলাম।

(২০)

এইবার বর্ষায় কলিকাতার লোক ইলিশ মাছ খাইতে পায় নাই। ইলিশমাছ ২৷৷০/৩৲ টাকা সের বিক্রয় হইতেছে; রুইমাছও একই দর, কুচা চিংড়ী ১৷৷০ টাকা সের, হাঁসের ডিম ।১০/।/০ জোড়া, আলু ১৷৷০ টাকায় /২৷৷০ সের, পেঁয়াজ ।৵০ আনা সের, ঘৃত ৫৲ টাকা সের, দুধ টাকায় দুই সের। খাঁটী বা ভাল জিনিষ বলিয়া কিছু আজকাল নাই। বর্ষায় ইলিশমাছ কলিকাতাবাসীর একটা প্রধান খাদ্য, কিন্তু এবার আমদানী কম হওয়ায়, অগ্নিমূল্য—সাধারণ লোকের ক্ষমতার বহির্ভূত। মফঃস্বলেও শুনিতেছি, মাছ এবার অত্যন্ত মহার্ঘ্য।

(২১)

১১ই আগষ্ট শুক্রবার, বেলা ৩টা। বাহিরের ঘরে বসিয়া আছি এক এক করিয়া চিনু, অরুণ ও বাচ্চু আসিয়া প্রবেশ করিল। সকলেই প্রতিবাসী বালক, কাহারও বয়স ৬।৭ বৎসরের বেশী নহে। আমার কোন কাজ ছিল না, ইহাদের সহিত গল্প করিতে আরম্ভ করিলাম। সময় সময় এই সমস্ত বালকদের সহিত বালক সাজিয়া কথাবার্ত্তায় যোগ দিয়া মনের ভার লাঘব করি। চিনু বলিল, তাহাদের দেশে দলে দলে হাতী আসিয়া উপদ্রব করে, এইবার দেশে যাইয়া একটা হাতীর বাচ্চা আমার জন্য লইয়া আসিবে। বাচ্চু বলিল, তাহাদের মামার বাড়ীতে অসংখ্য বাঘ আছে, একদিন বাচ্চু একটা বড় বাঘ বন্দুক দিয়া মারিয়া ফেলিয়াছিল। আমি বিস্ময় প্রকাশ করিয়া এই সমস্ত গল্প শুনিতেছিলাম এবং মধ্যে মধ্যে তাহাদিগকে গল্পের উৎসাহ দিতেছিলাম। কথা প্রসঙ্গে এখানকার স্কুলের কথা উঠিল। সব বালকগুলিই স্কুলের মাষ্টারদের সম্বন্ধে অদ্ভুত ও অশ্রুতপূর্ব্ব মন্তব্য

প্রকাশ করিতেছিল। কোনও মাষ্টার ক্লাসে প্রবেশ করিয়াই ঘুমাইতে আরম্ভ করে, কেহ বা বেতে নারিকেল তৈল মাখাইয়া আনে, পেছুকার বেঞ্চিতে বসিলে কিরূপে পড়াবলার বিপদ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়, অরুণের বাবা বড় মাষ্টার, কোনও মাষ্টারই চাকৃরী যাইবার ভয়ে তাহাকে বেত্রাঘাত করে না, ইত্যাদি শিক্ষাবিভাগের গভীর রহস্যগুলি তিনজনে উচ্চকণ্ঠে আমাকে শুনাইতে লাগিল। সময় পাইলে এইরূপ বালকবন্ধু জুটাইয়া আমি গল্প করি, নতুবা আমার অভাব-অভিযোগের সংসারে ভারাক্রান্ত হৃদয় লইয়া দিন যাপন করা আমার পক্ষে কঠিন হইত।

(২২)

১৩ই আগষ্ট বিকালবেলার ট্রেণে করুণা তাহার দুইটি ছেলেকে লইয়া বালী হইতে এখানে আসিল—জীবন সকলকে সঙ্গে করিয়া আনিল। ট্রেণ দেরী হওয়ায় প্রায় দুই ঘণ্টা বালী ষ্টেশনে সকলকে অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল, সুতরাং অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া সকলে আমাদের বাড়ীতে পৌঁছিল। এবার দেখিতেছি করুণার শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল, অস্থিচর্ম্মসার হইয়াছে; সমুর শরীর অত্যন্ত শীর্ণ, ছোট খোকাও রুগ্ন। ইহাদের সকলেরই এরূপ রুগ্ন ও দুর্ব্বল অবস্থা দেখিয়া ভীত হইলাম। করুণার অনুরোধে পূর্ণিমার শাশুড়ি পূর্ণিমাকে কিছু দিনের জন্য এখানে পাঠাইতে সম্মত হওয়ায় ২০শে আগষ্ট আমি যাইয়া তাহাকে এখানে লইয়া আসিলাম। চারিজন মেয়েই একত্র হইবার সুযোগ আজকাল প্রায়ই হয় না, সুতরাং অরুণাকেও এখানে আসিবার জন্য বলা হইয়াছিল। অরুণা ২৫শে আগষ্ট এখানে আসিবে স্থির করিয়া আমাদিগকে পত্র দিয়াছিল। কিন্তু ২৪শে আগষ্ট হঠাৎ সে অসুস্থ হইয়া পড়ে এবং তাহার গর্ভস্থ শিশুটি বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা উপস্থিত হওয়ায় এখানে আসা বন্ধ করিতে বাধ্য হয়। এদিকে

২৬শে আগষ্ট শনিবার বেলা ১২টার সময় করুণার গর্ভস্থ একটি ৩।৪ মাসের শিশু হঠাৎ বিনষ্ট হইয়া করুণা অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়ে। আমি তখন কলেজে। পূর্ণিমা ও আরতি প্রতিবাসিনীদের সাহায্যে করুণাকে যথাসম্ভব সেবা ও শুশ্রূষা করিতে থাকে। আমি কলেজ হইতে প্রায় ১৷৷০ সময় ফিরিয়া সমস্ত শুনিয়া ভীত হইলাম। প্রতিবাসী ডাক্তার শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চৌধুরীকে সমস্ত বলিলাম, সুরেন্দ্রবাবুর স্ত্রী ও জ্যেষ্ঠা কন্যা তৎক্ষণাৎ আসিয়া যথাসম্ভব ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। এক সময়ে মনে হইল যে, করুণাকে হাসপাতালে পাঠান প্রয়োজন, কিন্তু ধীরে ধীরে অবস্থার উন্নতি হওয়ায় হাসপাতালে যাইবার প্রয়োজন হইল না। আমার নিজের অনেকগুলি সন্তানাদি হইয়াছে, মেয়েদেরও ছেলেপিলে হইয়াছে, কিন্তু এরূপ বিপদে আমি পূর্ব্বে আর কখনও পড়ি নাই। বেলা ৩টার সময় জীবন আফিস হইতে আসিয়া এই বিপদেব সংবাদ শুনিল। বেলা প্রায় ৫টার সময় জীবন বালী ফিরিয়া যাইবার সময় বলিল, "আপনি একলা, এই বিপদের সময় আমি থাক্‌লে ভাল হ'ত, কিন্তু বিশেষ কাজের জন্য আজ আমাকে বালী ফিরে যেতেই হবে।" আমি সত্যসত্যই এতক্ষণ নিজেকে অসহায় মনে করিতেছিলাম। কিন্তু জীবন আমাকে "একলা" বলিবামাত্র তড়িৎ বেগে আমার ভিতর হইতে একটা প্রতিবাদ উত্থিত হইল এবং আমি বিশ্বজননীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। বারংবার ভিতর হইতে ধ্বনি উঠিতে লাগিল—'আমি একলা নহি, বিশ্ব-সম্রাজ্ঞীর সমস্ত শক্তি এই দাসকে সাহায্য ও রক্ষা করিবার জন্য নিয়োজিত হইয়াছে।' আমি জীবনকে দৃঢ়কণ্ঠে বলিলাম, "তুমি স্বচ্ছন্দে বালী ফিরিয়া যাও, আমার জন্য ভাবিতে হইবে না, আমি একলা নহি।" জীবন আমার কথার অর্থ নিশ্চয়ই গ্রহণ করিতে পারে নাই। সে বেলা ৫টার সময় বালী ফিরিয়া যাইল। আর কোন উপসর্গ না হইয়া করুণা ক্রমশঃ সুস্থ হইয়া উঠিল।

এই বিপদের সময় সংসারে স্বভাবতঃই বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। করুণা শয্যাশায়ী, সময়মত তাহার সেবা ও পথ্যের দায়িত্ব, তাহার দুইটি শিশুছেলের সমস্ত ভার পূর্ণিমা ও আরতি প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করিল। ইহার উপর ২৮শে আগষ্ট বংশী তাহার স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য বোলপুর হইতে আমাদের বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল। বংশী, তাহার স্ত্রী, তিনটি ছেলেমেয়ে এবং বংশীর শ্বশুর এই ছয়টি লোক হঠাৎ আমাদের সংসারে যোগদান করায় পূর্ণিমা ও আরতির অত্যন্ত পরিশ্রম হইতে লাগিল। অতিথিদের জন্য সকালে ও বিকালে লুচি প্রভৃতির ব্যবস্থা, দুইবেলা অন্নব্যঞ্জন রন্ধন প্রভৃতি সমস্ত কাজই তাহারা হৃষ্টচিত্তে যথাসম্ভব শৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন করিতে লাগিল। বংশীর স্ত্রী অত্যন্ত শান্ত-স্বভাবা এবং বুদ্ধিমতী, বংশী নিজে ধৈর্য্যশালী এবং আমার দরিদ্র অবস্থার দিকে সর্ব্বদাই সচেতন, সুতরাং অতিথিগুলির সেবা ও আহারাদির ব্যবস্থা সম্বন্ধে যদি কোন ত্রুটী হইয়া থাকে তাহা বংশী অথবা তাহার স্ত্রী ভাষা অথবা ভাবের দ্বারা কখনও ব্যক্ত করে নাই; সর্ব্বদাই প্রসন্ন হৃদয়ে আমাদের সংসারেরই লোক হইয়া অন্নব্যঞ্জন গ্রহণ করিয়াছিল। বংশী ধনী লোক, তাহার স্ত্রী সর্ব্ববিধ সুখ ও স্বচ্ছন্দতায় অভ্যস্ত, আমি দরিদ্র শিক্ষক, আমার পক্ষে ইচ্ছা সত্ত্বেও তাহাদের অভ্যাসমত সমস্ত বন্দোবস্ত করা প্রায় অসম্ভব। তথাপি তাহারা হৃষ্টচিত্তে এখানে এক সপ্তাহ বাস করিয়া, ডাক্তার দেখান প্রভৃতি কার্য্য শেষ করিয়া, ৩রা সেপ্টেম্বর বোলপুর ফিরিয়া যাইল। আমি পূর্ণিমা ও আরতির সেবা করিবার শক্তি, কর্ম্মকুশলতা ও প্রসন্ন মনে পরিশ্রম করিবার প্রবৃত্তি দেখিয়া বিস্মিত হইলাম, মনে মনে ভাবিলাম বাংলাদেশে কতগুলি সংসারে এমন সর্ব্ববিষয়ে আদর্শ-স্বভাব মেয়ে দেখা যাইয়া থাকে?

অরুণা ধীরে ধীরে সুস্থ হইয়া উঠিতেছে। ৩১শে আগষ্টের পত্রে অরুণা করুণাকে লিখিয়াছে, "আমি কাল থেকে একটু চলাফেরা করছি। নীচেয় একদম্ নামতে দেয় না এরা, কদিন একেবারে বিছানায় শুয়ে ছিলাম..............বাড়ীতে ডাক্তার ব'লে এবং সঙ্গে সঙ্গে ঔষধ ও ইন্‌জেকশান পড়াতে এযাত্রা বেঁচে গেলাম। যেদিন আমার অসুখ করলো ঠিক তার আগের দিন রাত্রে তন্দ্রাঘোরে স্বপ্নে দেখছি, যেন আমি মরছি বাবার ওখানে গিয়ে। মরবার সময় আমার জিভ এড়িয়ে যাচ্ছে আর দক্ষিণেশ্বরের ৺মাকালী আমায় কালীর প্রণাম মন্ত্র বলাচ্ছেন। তখুনি তন্দ্রা ভেঙ্গে গেল। আশ্চর্য্য স্বপ্ন নয়? আমি তোমাদের সকলের সঙ্গে দিন কতক থাকবো বলে ভয়ানক ব্যস্ত হয়েছিলাম কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা অন্যরূপ। বাক্স এখনও গোছান রয়েছে...............।" অরুণার সুন্দর স্বপ্নটির জন্য চিঠিটির কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

১০ই সেপ্টেম্বর সকাল ৯টার সময় পূর্ণিমার শ্বশুর বাড়ীতে শারদীয়া পূজার তত্ত্ব পাঠাইলাম। সাধ্যমত জিনিষপত্র দিয়াছি, পূর্ণিমার শ্বশুর এবং শাশুড়ী আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

১৬ই সেপ্টেম্বর শনিবার কলেজ হইয়া ৺শারদীয়া পূজার ছুটী আরম্ভ হইল। ৩১শে অক্টোবর কলেজ খুলিবার কথা আছে।

(২৩)

এবার আমাদের বাড়ীতে চারিটি মেয়েই একত্র হইয়াছিল। আজকাল তিনটি মেয়ের নিজের নিজের সংসার হইয়াছে, প্রায়ই চারি-জনের সম্মেলন ঘটিয়া উঠে না। অরুণা ২৯শে অক্টোবর তারিখে ফণীর সঙ্গে তাহার মেয়েদের লইয়া এখানে আসিল; আমি ৪ঠা নভেম্বর পূর্ণিমাকে এখানে লইয়া আসিলাম। বাড়ীতে সর্ব্বদাই কলরব—মানা,

সুকু, নমু, সমু ও কচি সকলের খেলা ও আনন্দধ্বনিতে বাড়ী মুখরিত। মানা, সুকু ও নমু বিকাল হইলেই পাশে ডাক্তারবাবুদের বাড়ীতে বেড়াইতে যাইত। ইহারা তিনটিই বড় শান্ত, অরুণার কঠোর শাসনে সর্ব্বদাই শঙ্কিত, মানা ও সুকু সকাল বেলায় পড়িতে বসিত, কিন্তু মানা আমাকে দেখিলেই এমন কাতর দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিত যে, সে দৃষ্টির অর্থ গ্রহণ করিতে আমার বিলম্ব হইত না। আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে পড়া বন্ধ করিতে বলিতাম। একবার বিজয়দৃপ্ত কটাক্ষ তাহার মার প্রতি নিক্ষেপ করিয়া মানা তৎক্ষণাৎ বই বন্ধ করিয়া পাঠ-কলুষিত স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিত। বিকালবেলা চীনাবাদামের উপর মানা ও সুকুর বড়ই লোভ ছিল। অরুণা সাধারণতঃ মেয়েদিগকে চীনাবাদাম খাইতে দিত না, কিন্তু আমার কাছে চুপি চুপি পয়সা লইয়া বারান্দায় যাইয়া চীনাবাদাম বিক্রেতাকে ডাকিয়া ইহারা বাদাম কিনিত এবং অরুণার অজ্ঞাতে দ্রুতগতিতে তাহা ভক্ষণ করিত। অরুণা জানিতে পারিলে সমস্ত বাদামগুলি বাজেয়াপ্ত হইত এবং ২।১টি ক্ষুদ্র দানা পাইয়াই মানা ও সুকুকে সেদিনের মত নিবৃত্ত হইতে হইত। নমিতা দিদিদের সঙ্গে পড়া ব্যতীত অন্য সমস্ত ব্যাপারেই যোগ দিত। নমুর কথাগুলি এখনও খুব মৃদু ও মধুর, বিশেষতঃ আধ আধ বলিয়া সকলেই শুনিতে ভালবাসে। অরুণা দুর্ব্বল শরীর লইয়া এখানে আসিয়াছিল, পনের দিন মাত্র এখানে ছিল, কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই তাহার শারীরিক উন্নতি হইয়াছিল। পূর্ণিমাকে এবার অত্যন্ত দুর্ব্বল দেখিলাম, বিশেষতঃ সে আসিবার দিন রক্তামাশয় লইয়া আসিয়াছিল। অরুণা ও পূর্ণিমা ১২ই নভেম্বর নিজ নিজ শ্বশুর বাড়ীতে ফিরিয়া যাইল।

২৮শে অক্টোবর, ১১ই কার্ত্তিক, শনিবার বেলা ৩॥০ টার সময় পূর্ণিমার শ্বশুর বাড়ীতে শীতের তত্ত্ব পাঠান হইল। আজকাল জিনিষ-

পত্র সমস্তই দুর্ম্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য তথাপি যথাসম্ভব যোগাড় করিয়া তত্ত্ব পাঠাইলাম। গরমের কোটের জন্য সার্জ্জ অনেক দোকান খুঁজিয়া পাইলাম না, সুতরাং জামার জন্য নগদ পঞ্চাশ টাকা সুকুমারকে দেওয়া হইল। জিনিষপত্র পাইয়া বৈবাহিক মহাশয় ও বৈবাহিকা ঠাকুরাণী প্রীত হইয়াছিলেন। আমি দরিদ্র, ইচ্ছানুযায়ী ব্যয় করিবার শক্তি আমার নাই। বিশেষতঃ এই যুদ্ধের বাজারে সাধারণ পনের টাকা দামের র্যাপার আশী টাকায় বিক্রয় হইতেছে। সমস্ত জিনিষপত্রেরই দাম ৪।৫ গুণ বাড়িয়া গিয়াছে। তথাপি আমার পরম সৌভাগ্য যে, তিনটি মেয়ের শ্বশুর বাড়ীতে যে সমস্ত তত্ত্ব করিয়াছি তাঁহারা আমার সামান্য জিনিষই পরম সমাদরে গ্রহণ করিয়াছেন ও আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। পূর্ণিমার শ্বশুর তত্ত্ব গ্রহণ করিয়া আমাকে লিখিয়াছিলেন, "............এই বাজারে আপনি ক্ষিপ্রতার সহিত জিনিষগুলি সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছেন এবং জিনিষগুলি সমস্তই পছন্দমত হইয়াছে। আমাদের ধন্যবাদ গ্রহণ করিবেন।............।" পূর্ণিমা ২৯শে অক্টোবরের পত্রে লিখিয়াছিল, "কাল তত্ত্ব দেখে সবাই খুব আনন্দ করছিলেন। শ্বশুর শাশুড়িকে বলছিলেন—"তোমরা মনে কর যে, তোমরা ভিন্ন কোন কাজ হয় না, আর এই দেখ কত তাড়াতাড়ি বেয়াই একলা সব যোগাড় করেছেন, কোন জিনিষ বাদ যায় নি।" শ্বশুর বলেছেন 'এত জিনিষ দেখে আবার আমার বিয়ে কর্ত্তে ইচ্ছা কর্চ্ছে।' শালটা দেখে শাশুড়ি বলেছেন, 'যেমন পাড়, সরুও নয় আবার চওড়াও নয়, আর তেমনি রং,—বেহায়ের পছন্দ আছে। এই বাজারে কোট, শাল কিছু বাদ যায় নি। বেয়াই সাধু মানুষ ব'লে টাকার উপর মায়া নেই।' শ্বশুর বাবার চিঠিখানা পড়ে সবাইকে শুনাইলেন। শ্বশুর বলেছেন, 'আবার আলাদা করে মাছ তরীতরকারীর জন্যে ২০৲ টাকা

দিয়েছেন।' কাল তত্ত্ব আসার পর জ্যাঠামহাশয়, গুহ সাহেব এসেছিলেন। সন্দেশ ও রাব্‌ড়ি তাঁদের খেতে দেওয়া হয়েছিল।............" আমি পূর্ণিমার চিঠি পড়িয়া ভাবিলাম যে, মেয়েরা শ্বশুর বাড়ীতে আমার পাঠান জিনিষপত্র দেখিয়া আনন্দিত হইলে আমার পরিশ্রম ও অর্থোপার্জ্জন সার্থক।

(২৪)

২৬শে নভেম্বর তারিখে জীবন আসিয়া করুণা ও তাহার দুইটি খোকাকে লইয়া বেলা ২৷৷৹টার ট্রেণে শিয়ালদহ হইয়া বালী ফিরিয়া গেল। এবার করুণা প্রায় ৩৷৷৹ মাস আমাদের এখানে ছিল। করুণা ও তাহার ছেলে দুইটি যখন এখানে আসিয়াছিল, তখন তাহারা সকলেই অস্থি-চর্ম্ম-সার কিন্তু এই ৩৷৷৹ মাসের মধ্যে সকলেই বেশ সুস্থ ও হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছিল। করুণার খোকা দুইটি আমার বড়ই প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল, বাড়ীতে সর্ব্বদাই কাছে কাছে থাকিত, তাহাদের মার বিরুদ্ধে অভিযোগ অথবা খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে আবদার আমাব নিকটই করিত। করুণার বড় খোকাটি বয়সের তুলনায় নানাবিধ বিষয়ে অধিক বুদ্ধির পরিচয় দিত। অরুণা সমুকে দেখিয়া বলিত, "এত বুদ্ধি, যেন ক্ষণজন্মা ছেলে"। সকালে আমি রাস্তায় তরকারী কিনিলে সমু চুপড়ি মাথায় করিয়া ধীরে ধীরে তাহা বাড়ীর ভিতরে লইয়া আসিত, সমস্ত রকম কাজ করিতে তাহার অত্যন্ত উৎসাহ। অরুণা যে দিন প্রথম আসিল তাহার পরদিন সকালে সমু বাহিরের বারান্দায় আমার সহিত বেড়াইতে বেড়াইতে হঠাৎ বলিল, "আমাদের মা কাজ কর্চ্ছে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "মান্‌সিং-এর মা কি কর্চ্ছে?", উত্তর দিল, "জানিনা"। অর্থাৎ 'আমাদের' মা কর্ম্মিষ্ঠা, বসিয়া ভাত খায় না, অপরের মা কাজ করিলে নিশ্চয়ই

সমুর দৃষ্টিগোচর হইত, কোথাও নিদ্রায় অথবা আলস্যে কাল যাপন করিতেছে। সমু ও অমু দুই ভাই অনেক সময় আনন্দে নৃত্য করে, দেখিতে বড়ই মনোহর। বিশেষতঃ অমু একটি হাত তুলিয়া একটি পা তুলিতে তুলিতে দ্রুত গতিতে চক্রাকারে এমন সহজ ও হাল্‌কাভাবে নৃত্য করিয়া থাকে যে, আমরা সকলেই মুগ্ধ হইয়া দেখি। অরুণা এইরূপ নৃত্যকে "গৌরনিতাই" নাচ বলিয়া অভিহিত করিয়াছে, আমি এই নৃত্য দেখিয়া অমুকে "শিশু ভোলানাথ" বলিয়া ডাকি। আমি যখন ৺চণ্ডীপাঠ করি, সমু তখন আমার নিকটে বসিয়া তাহা শ্রবণ করে। পূজা শেষ হইলে "মা" "মা" বলিয়া ভূমিতে মাথা স্পর্শ করিয়া প্রণাম করে। আমি কলেজ হইতে ফিরিয়া আসিলে অমু বাহিরের ঘরের ভিতর হইতে আমাকে দেখিয়া হাত বাড়াইয়া "আয়" "আয়" বলিয়া ডাকিতে থাকে, এবং আমি বাড়ীতে ঢুকিবার পূর্ব্বে সে আনন্দের আতিশয্যে একবার চক্রাকারে নাচিয়া লয় এবং আমি বাড়ীতে ঢুকিবা-মাত্র আমার হাত ধরিয়া ৺কালী ঠাকুরের চিত্রের নিকট লইয়া যায় এবং সেখানে দাঁড়াইয়া নিজে হাত জোড় করিয়া "মা" "মা" বলে এবং আমাকেও ঠাকুর প্রণাম করিতে ইঙ্গিত করে। ইহারা দুইজনে প্রত্যহ বিকালে গাবুর সঙ্গে বেড়াইতে যায়, একদিনও নিয়মের ব্যতিক্রম হইবার উপায় নাই। সর্ব্বদা বাহিরে বাহিরে ঘুরিতে পাইলেই উভয় ভ্রাতা খুসী, তখন আহার-নিদ্রার কথা মনে থাকে না। সমু তাহার বড় মেসো-মহাশয়কে বড়ই ভয় করে, দেখিলেই ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করে, অথচ রাস্তার লোক ডাকিয়া তাহাদের সহিত আলাপ করা সমুর অভ্যাস। ফণী বিস্কুট, লেবেঞ্চুস, সন্দেশ, প্রভৃতি উৎকোচ প্রদান করিয়াও সমুর মন তাহার প্রতি আকর্ষণ করিতে পারে নাই। বড় ও ছোট ডাক্তারবাবু, সুরেশবাবু, সান্ন্যাল মহাশয়, সদানন্দবাবু, প্রভৃতি

বৃদ্ধের সহিত সমুর বড়ই বন্ধুত্ব। ইঁহারা সকলেই সমুর অনর্গলনিঃসৃত সুস্পষ্ট কথাগুলি শুনিতে ভালবাসেন। সমুর মা আমার অনুপস্থিতিতে সমুকে বকিলে সে তাহার মাকে ভয় দেখাইয়া বলে, "দাদু আসুক্, তোমার কথা বলে দোব। তখন মজা দেখ্‌বে।" সমু অমুকে বড়ই ভালবাসে, 'ভাইটি' 'ভাইটি' বলিয়া আদর করে, কচিও সমুর প্রতি বড়ই আকৃষ্ট, অতি মধুরস্বরে 'দাদা' বলিয়া তাহাকে সম্বোধন করে। কিন্তু সময় সময় অসন্তুষ্ট হইলে ঘুঁসি পাকাইয়া দাদার মাথায় সজোরে বসাইয়া দেয়, সে ঘুসি বড় সহজ নয়। কিন্তু সমু তাহাকে কখনই মারে না। সমুর 'ভাইটির' প্রতি এই স্নেহ দেখিয়া আমরা সকলেই বিস্মিত হই। সমুর প্রত্যেক কাজে বয়সের অনুপাতে একটা অদ্ভুত প্রকারের শৃঙ্খলা দেখিতে পাওয়া যায়। হাত না ধুইয়া কখনও ভাত খাইতে বসে না, তাহার নির্দ্দিষ্ট আসনটি নির্দ্দিষ্টরূপে পাতিয়া তবে খাইতে বসে, যে আঙ্গুলটি ধরিয়া আমার সহিত কোন কোন দিন বেড়াইতে যায় সেই আঙ্গুলটি ধরা চাই, অন্য আঙ্গুল দিলে বদ্‌লাইয়া নির্দ্দিষ্ট আঙ্গুলটিই ধরিয়া থাকে, বেড়াইয়া ফিরিবার পর জুতাগুলি গুছাইয়া রাখে, ঘরের মধ্যে কোন কাগজের টুক্‌রা অথবা ইষ্টকখণ্ড পড়িয়া থাকিলে তাহা তৎক্ষণাৎ উঠাইয়া বাহিরে ফেলিয়া দেয়। এরূপ শৃঙ্খলাযুক্ত কার্য্যপ্রণালী অত অল্প বয়স্ক শিশুর আর কখনও আমি দেখি নাই। আমার সহিত দই অথবা হাঁসের ডিম খাইতে সমুর বিশেষ উৎসাহ। নিজে পূর্ব্বেই বেলা প্রায় দশ ঘটিকার সময় ভাত খাইয়া থাকে, পুনরায় বেলা ১১টা আন্দাজ আমার ভাতের থালার নিকট আসিয়া বসে। কিছু তাহাকে সেই সময় খাইতে দিতেই হইবে, নতুবা ঘোরতর অসন্তুষ্ট হয়। একদিন মাছের ঝোলের ভিতর হইতে একটুক্‌রা কপি সমুকে খাইতে দিলাম, সেই টুক্‌রাটি খাইয়া পুনরায় চাহিল। এইরূপে দুই

তিন টুক্‌রা খাইবার পর আমি যে একখানি পুনরায় দিলাম, আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই টুক্‌রাখানির একদিকে ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ পোড়া দাগ ছিল। সমু সেই কৃষ্ণবর্ণ দাগটি কিয়ৎক্ষণ লক্ষ্য করিল এবং সেইখানি আমার থালার দিকে তীব্রবেগে ছুড়িয়া ফেলিয়া পরুষকণ্ঠে বলিল, "পোড়া দিয়েছ কেন? তুমি পোড়া খাও!" আমিতো এই আড়াই বর্ষ-বয়স্ক বালক দুর্ব্বাসার ক্রোধ দেখিয়া যুগপৎ বিস্মিত ও ভীত হইলাম, এবং অনেক বাছিয়া একখানি নিষ্কলঙ্ক কপিখণ্ড পুনরায় সমুকে দিয়া তাহার ক্রোধবহ্নি হইতে রক্ষা পাইলাম। এইভাবে এই দুইটি বালককে লইয়া বেশ আনন্দে ৩॥০ মাস কাটাইবার পর ২৬শে তারিখে ইহারা বালী যাত্রা করিল। ঘোড়ার গাড়ীতে উঠিবার সময় সমুর মহা আনন্দ, আমাকে হাসিতে হাসিতে আশ্বাস দিল পুনরায় এখানে আসিবে, কিন্তু কচি ঘোড়ার গাড়ীতে উঠিয়াই মুহ্যমান হইয়া পড়িল, এবং ট্রেনে উঠিয়া খুঁৎ খুঁৎ করিতে করিতে "দাদুকে" সন্ধান করিতে লাগিল। স্নেহের একটা জ্বালা আছে। খোকারা চলিয়া যাইবার পর কিছুদিন আমি মনে অশান্তি ভোগ করিয়াছিলাম।

(২৫)

এই বৎসর তিনটি ছাত্র পড়াইতেছি, গত বৎসরের তুলনায় আয় কম। চারিটি ছাত্র প্রথমদিকে হইয়াছিল, কিন্তু একটি পরিত্যাগ করিয়াছি। এই ছেলেটি খুব ভদ্র ও বিনয়ী ছিল কিন্তু ইহার পিতা ধনী হইয়াও অত্যন্ত কৃপণ স্বভাব। মাস শেষ হইলে বারংবার অনুরোধ করিয়াও তাঁহার নিকট টাকা সময়মত পাইতাম না। টাকা চাহিতে লজ্জা বোধ করিত, কিন্তু এই ভদ্রলোকের সাধারণ কর্ত্তব্যজ্ঞান অথবা ভদ্রতা-বোধ ছিল না, সুতরাং বিরক্ত হইয়া এই ছাত্র পড়ানটি পরিত্যাগ

করিলাম। ইহার পর তিনি আমাকে পুনরায় অনুরোধ করিয়াছিলেন কিন্তু আমার মন একবার তিক্ত হইলে সহজে স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয় না, সুতরাং অর্থক্ষতি হইলেও পুনরায় এই ছেলেটিকে পড়াইতে রুচি হইল না। ছাত্রপড়ান পেশা গ্রহণ করিয়া কত বিচিত্র চরিত্রের মানুষ দেখিলাম তাহার নির্ণয় নাই। কেহ বা মাসের প্রথম তারিখে ঠিক নিয়মিত ভাবে টাকা দিয়াছেন, কোন কারণে প্রথম তারিখে দিতে না পারিলে দ্বিতীয় তারিখে দেরীর জন্য কত কুণ্ঠিত হইয়া আমার প্রাপ্য টাকা দিতে আসিয়াছেন, আবাব কেহ বা ধনী হইয়াও শিক্ষকের প্রাপ্য টাকা সময় উত্তীর্ণ হইলেও পুনঃ পুনঃ তাগাদা সত্ত্বেও দিতে ক্লেশ বোধ করিয়াছেন। সময়মত অপরেব প্রাপ্য টাকা না দেওয়া মানুষের অনেক কুৎসিৎ অভ্যাসের মধ্যে অন্যতম।

৪ঠা ডিসেম্বর সকালবেলা ঘুম ভাঙ্গিতেই নিকটস্থ এক প্রতিবাসীর বাড়ী হইতে করুণ ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, সেই পরিবারে কাহারও মৃত্যু হইয়াছে। প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া আরতিকে জিজ্ঞাসা করিলাম কাহার মৃত্যু হইয়াছে, কারণ পাড়ার সংবাদ আমা-অপেক্ষা আরতিই বেশী রাখে। আরতি বলিল, "আমিও ঘুম ভেঙ্গে শুনেছি, ও কান্না নয়, উলু দিচ্ছিল। বোধ হয় ওদের বাড়ীতে বিয়ে।" আমি আরতির কথাগুলি শুনিয়া হাসিতে লাগিলাম। কোথায় মৃত্যুর মর্ম্মভেদী ক্রন্দন আর কোথায় আনন্দের উলুধ্বনি! পাড়ায় সন্ধান লইয়া জানিলাম যে, এক নবাগত বৃদ্ধ ঐ বাড়ীতে মফঃস্বল হইতে চিকিৎসার জন্য আসিয়াছিলেন, তাঁহারই মৃত্যু হইয়াছে। আরতির নিদ্রাজড়িত মন ক্রন্দনধ্বনিকে উলুধ্বনি বলিয়া শুনিয়াছিল, কিন্তু এরূপ অদ্ভুত কৌতুক-প্রদ ভুল আমি আর কাহাকেও করিতে দেখি নাই।

৫ই ডিসেম্বর সন্ধ্যাবেলা ১৫০ নম্বর চিত্তরঞ্জন এভিনিউ রোডস্থ মাড়োয়ারী ছাত্রাবাসে সুন্দরমল পাতেসারিয়া নামক বিদ্যাসাগর কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর জনৈক ছাত্রকে পড়াইতে গিয়াছিলাম। এই ছাত্রটি কিছুদিন যাবৎ আমার নিকট পড়িতেছে, সুতরাং সন্ধ্যাবেলা প্রায়ই আরতিকে একলা থাকিতে হয়। ইতিমধ্যে রাত্রি প্রায় ৮ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সান্ন্যাল মহাশয়ের স্ত্রী, তাঁহার কন্যা, পুত্রবধূ প্রভৃতি মহিলাগণ সান্ন্যাল মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্রের বিবাহ উপলক্ষ্যে আরতিকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছিলেন। সান্ন্যাল মহাশয়ের কথা পূর্ব্বেই লিপিবদ্ধ করিয়াছি। ইনি ধনী লোক, ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ মৈমনসিংহের মহারাজার কন্যা। এই ধনী পরিবারের মহিলাগণ বাড়ীতে প্রবেশ করিলে আরতি বিব্রত ও শঙ্কিত হইয়া পড়ে। আরতি ছেলে-মানুষ, সুতরাং এতগুলি অপরিচিত স্বর্ণহীরকমণ্ডিতা মহিলার আকস্মিক আবির্ভাবে আরতির ভীত হওয়াও স্বাভাবিক, তাহার বাবা উপস্থিত ছিল না, ভালই, নতুবা তাহার বাবারও হৃৎকম্প বড় কম হইত না। এই বিবাহ উপলক্ষ্যে ১৫ই ডিসেম্বর বৌভাতের দিন সন্ধ্যাবেলা আমি ও আরতি সান্ন্যাল মহাশয়ের বাড়ী নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিলাম। এই অগ্রহায়ণ মাসে আরও অনেকগুলি বিবাহের নিমন্ত্রণ আমরা খাইয়াছি। ছোট সিভিল সার্জ্জনবাবুর জ্যেষ্ঠ জামাতা রায় সাহেব শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল কুমার মিত্রের দ্বিতীয়া কন্যা গৌরীরাণীর বিবাহ ডাক্তার বাবুর বাড়ীতে ৬ই ডিসেম্বর হয়, ১০ই ডিসেম্বর ডাক্তারবাবুর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীহিতেন্দ্র নাথ চৌধুরীর বিবাহ শিবপুরে হয়, ১৩ই ডিসেম্বর বড় ডাক্তার বাবুর দ্বিতীয় পুত্র গিরিবাবুর বিবাহ গোয়াবাগান লেনে হয়। এই সমস্ত বিবাহ ও তাহার পর বৌভাত উপলক্ষ্যে অনেকগুলি নিমন্ত্রণ এই মাসে হইয়াছিল। আমি গৌরীকে একখানি কাপড় ও নব বধূদুইটিকে একখানি করিয়া "মহাভারত" দিয়াছিলাম।

১২ই ডিসেম্বর বেলা ৩টার সময় আমাদের বাড়ীর পশ্চাৎভাগের প্রতিবাসী শ্রীযুক্ত সুধীর কুমার সরকার মহাশয়ের মাতা দীর্ঘকাল রোগ ভোগ করিয়া দেহত্যাগ করেন। এই বৃদ্ধা মহিলা অতি শান্তস্বভাবা ও ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন, অনুক্ষণ কর্ম্মের মধ্যেই তিনি লিপ্ত থাকিতেন। আমার মেয়েগুলিকে তিনি বড়ই স্নেহ করিতেন। মেয়েরা তাঁহাকে "দিদা" বলিয়া ডাকিত। মৃত্যুকালে সজ্ঞানে হরিনাম করিতে করিতে ইনি দেহত্যাগ করেন। ধীরে ধীরে মৃত্যু আসিতেছিল, চক্ষু ক্রমশঃ ঘোলাটে হইয়া গেল, তথাপি পূর্ণজ্ঞান বিদ্যমান ছিল, মৃদুকণ্ঠে হরিনাম জপ করিতেছিলেন। সংসারে নিজের সুখ-স্বচ্ছন্দতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া তিনি আত্মীয়-স্বজনের জন্য পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া আমার মনে হইত ইহাই কর্ম্মযোগ, এইরূপে কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মক্ষয় করিয়া মুক্তির সন্ধান করিতে হয়। "দিদা" মারা যাইবার পর রাত্রিতে আরতিব একলা শুইতে ভয় করিতে লাগিল, সুতরাং ২।৩ দিন গাবু আসিয়া তাহার ঘরে শুইত। ২।৩ দিন পর হইতেই আরতির সাহস ফিরিয়া আসিল এবং অভ্যাসমত আজকাল একাই রাত্রিতে শয়ন করিতেছে।

(২৬)

১৬ই ডিসেম্বর বেলা ১॥০ টার সময় এক কৌতুকের দৃশ্য দেখিয়া মনে মনে বড়ই আনন্দিত হইয়াছিলাম। কলেজের কাজ শেষ করিয়া সেইদিন শ্যামবাজারের নিকট গ্যালিফ ষ্ট্রীটে ২৬নং বাড়ির চতুর্থ বার্ষিক ছাত্র শ্রীমান সুবল চন্দ্র বল্লভকে পড়াইতে যাইতেছিলাম। শ্যামবাজারের মোড়ে ট্রাম হইতে নামিয়া বেলগাছিয়া মেডিক্যাল কলেজের পথ ধরিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছি, এমন সময় দেখিলাম, একটি

সুন্দর কালী প্রতিমা রাস্তার ধারে ফুটপাথের একপ্রান্তে নামাইয়া ২।৩ জন বাহক বিশ্রাম করিতেছে। এখন কালীপূজার সময় নয়, প্রতিমাখানি কোথায় যাইতেছিল বুঝিতে পারিলাম না। প্রতিমাখানি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র কিন্তু চক্ষু দিয়া যেন স্নেহ ঝরিয়া পড়িতেছে। মুখখানি তপ্ত রৌদ্রকিরণে ঈষৎ ম্লান, যেন ঘর্ম্মাক্ত, সমস্ত শরীর পথশ্রমে অবসন্ন, কোমলাঙ্গী বালিকার মত যেন পথের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ক্ষণকাল বিশ্রাম করিতেছেন। আমি মুগ্ধ হইয়া দেখিলাম, দেখিতে দেখিতে চক্ষে জল আসিল। মনে মনে ভাবিলাম যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্ত্রী মহারাজরাজেশ্বরী, তিনিও এই মলিন জগতের উত্তপ্ত বায়ুর সংস্পর্শে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন! যাঁহার কটাক্ষে গ্রহনক্ষত্র, চন্দ্রসূর্য্য, অনন্ত বিশ্বচক্র প্রবর্ত্তিত হইতেছে, সেই মহিমময়ী অনন্তশক্তিশালিনী জননী আজ পরিশ্রান্তা! এই কর্ম্মবিক্ষুব্ধ সংসারের এমনই প্রভাব! কিন্তু এই বিশ্বজননীই যদি ক্লান্ত হইয়া পথপ্রান্তে বসিয়া পড়েন তাহা হইলে আমার মত সংসারকীট পৃথিবীর এই মহামোহময় কটাহে অনুক্ষণ দগ্ধ হইয়া কি অবস্থায় উপনীত হইতেছে তাহা তিনি একবার ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? দুঃখ ও আনন্দের যুগপৎ সংমিশ্রণে উদ্গত চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে গ্যালিফ ষ্ট্রীটের দিকে অগ্রসর হইলাম।

(২৭)

১৭ই ডিসেম্বর সমু ও কচিকে দেখিবার জন্য বালী গিয়াছিলাম, খোকারা দুইজনে আমাকে ও গাবুকে দেখিয়া খুব খুসী। সকালবেলা ৮টার ট্রেণে বালী যাইয়া সেখানে ভাত খাইয়া বেলা প্রায় ৫টার সময় বাড়ী ফিরিলাম। বড় হরলিকের শিশির একশিশি চাণাচুর করুণা আরতির জন্য দিয়াছিল, পরদিন সকালে দেখি শিশির তিন

ভাগ খালি হইয়া গিয়াছে। সমু আমার নিকট রাবড়ী খাইতে চাহিয়াছিল। আমি জীবনকে ২৩শে ডিসেম্বর আপিস ফেরৎ এখানে আসিতে বলিয়াছিলাম। ঐদিন জীবন প্রায় ৫॥টার সময় এখানে আসিলে আমি তাহার হাতে খোকাদের জন্য কিছু রাবড়ী ও একটি ব্যাট ও বল দিয়াছিলাম। খোকারা রাবড়ী খাইয়া খুব খুসী হইয়াছিল এবং রাত্রেই ব্যাটবল লইয়া খেলা আরম্ভ করিয়াছিল। পরদিন পত্রে করুণা আরতিকে লিখিল, "কাল রাত ৭॥০টার সময় তোমার ছোট জামাইবাবু বাড়ী এসেছিল। রাবড়ী ও চিঠি ও ব্যাটবল সব পেয়েছি। সমু অমু রাবড়ী আসবে বলে ওপরের ঘরে বসেছিল; তোমার ছোট জামাইবাবু ওপরে আসতেই সমু তার হাত থেকে রাবড়ীটা নিয়ে বল্লে—কোলকাতার দাদু আমার জন্যে রাবড়ী দিয়েছে। ব্যাটবল পেয়ে সমু খুব খুসী, তক্ষুণি দুইভায়ে খেলা করতে লেগে গেল। তারপর রাবড়ীর কাছে এসে দুজনে বসল। কচি রাবড়ী দেখে 'দই' 'দই' বলতে লাগল আর কৌটার মধ্যে হাত ডুবিয়ে রাবড়ী তুলে খাবার চেষ্টা করতে লাগল। সমু নাচতে লাগল, তক্ষুণি খাবার জন্যে। দুটো ডিসে করে দুজনকে রাবড়ী তুলে দিলাম, খুব তারিফ করে সমু খেতে লাগল। আঙ্গুলের ডগায় ক'রে একটুখানি সর নিয়ে চেটে চেটে খেতে লাগল, শেষে ডিসটাকে চেটে পরিষ্কার করে বল্লে, 'আরও চাই'। কচিকে আমি খাইয়ে দিলাম। কালকে শুধু রাবড়ী খেয়েই ছিল, আর কিছু খেতে দিইনি। কিছুতে দুটোকে তুলতে পারিনা, আরও খাবে। তোমার ছোট জামাইবাবু ও শাশুড়ি বসে ওদের খাওয়া দেখছিলেন। সমু অমু খেয়ে উঠে আবার ব্যাটবল খেলা করতে লেগে গেল। আমরা সকলেই রাবড়ী কাল রাত্তিরে খেয়েছিলাম। রাবড়ী খুব ভাল ছিল এবং টাট্‌কা ছিল।........." করুণার সুদীর্ঘ বর্ণনা পড়িয়া

আমরা প্রীত হইলাম। পুনরায় বড়দিনের ছুটির মধ্যে ২৮শে ডিসেম্বর খোকাদের দেখিবার জন্য আমি ও গাবু বালী গিয়াছিলাম। বেলা ১১৷৷০টার সময় বালী পৌছিলাম, সেইমাত্র খোকারা ভাত খাইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আমার পুঁটুলী খুলিয়া উভয়ে কিস্‌মিস্ সন্দেশ ও গজা খাইতে আরম্ভ করিল। দুইটি ভাই ভোজনপ্রিয়, দাদামহাশয় একবার বাড়ীতে ঢুকিলেই সন্দেশের সন্ধান লইয়া এবং তাহা উদরস্থ করিয়া তবে অন্য কথা বা কাজ।

২৩শে ডিসেম্বর সকালবেলা কালীঘাটে অরুণার বাড়ী গিয়াছিলাম। কিছু মিষ্টি, ব্যাটবল ও লেবেঞ্চুস সঙ্গে লইয়াছিলাম। নমু অরুণার ছোটমেয়ে, সে তাহার বাপ-মায়ের বড় প্রিয়। অরুণা বলে, অপরিচিত লোকেরা নমুকে দেখিয়া খোকা বলিয়া ভুল করে। অরুণার খোকা নাই সুতরাং খোকার ছদ্মবেশী নমিতাই তাহার বাপ-মায়ের কাছে খোকার সমাদর পাইয়া থাকে। তাই অরুণাকে সন্তুষ্ট করিতে নমুর জন্য ব্যাটবল লইয়াছিলাম, কারণ নমু প্রীত হইলেই অরুণা খুসী। ব্যাটবল পাইয়া নমু তৎক্ষণাৎ খেলিতে আরম্ভ করিল। ফণীর তিনটি ভাইঝি ও অরুণার মেয়ে তিনটি আমাকে ঘিরিয়া বসিল। অনেকক্ষণ তাহাদের সহিত গল্পগুজব করিয়া বেলা প্রায় ১১টার সময় বাড়ী ফিরিলাম।

(২৮)

আজকাল কথা-প্রসঙ্গে মধ্যে মধ্যে আরতি আমাকে বলে যে, বাপ-মা বড় মেয়ের ও ছোট মেয়ের বিবাহে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক খরচ করে, বিশেষতঃ ছোট মেয়ের জন্যই অধিক খরচ হয় কারণ তাহার পর আর খরচ করিবার পাত্রী কেহই অবশিষ্ট থাকে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ সে

বড় ডাক্তারবাবুর ছোট মেয়ে অমলা ও ছোট ডাক্তারবাবুর ছোটমেয়ে রমার কথা উল্লেখ করিয়া থাকে। এই কথাই মধ্যে মধ্যে প্রায় তিনদিন আরতি আমার নিকট বলিয়াছে। অতি সহজ ও সরলভাবে সে কথাগুলি বলে কিন্তু আমি তাহার গল্পের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতের কথা ভাবিয়া মনে মনে হাসিয়া থাকি। আমি ভাবি, আরতির গল্পের মর্ম্মার্থ টুকু তাহার বাবা গ্রহণ করিতে পারিতেছে কি না তাহা হয়ত আরতি নিশ্চিতরূপে স্থির করিতে পারে না। যাহা হউক আমি যদি ভগবানের দয়ায় আমার ছোট মেয়েটির গল্পের মর্য্যাদা রক্ষা কবিতে পারি তাহা হইলেই ইহ-জীবনেব কর্ম্ম সুচারুরূপে পরিসমাপ্ত হয়। সংসারের এই শেষ একটিমাত্র বড় দায়িত্ব সম্পন্ন হইতে এখনও বাকী রহিয়াছে।

(২৯)

৩১শে ডিসেম্বর, রবিবাব। এখন সকাল ৯॥০টা, আমি বাহিরের ঘরে বসিয়া ডাইরী লিখিতেছি, গাবু বাজারে আলু কিনিতে গিয়াছে, আরতি রান্না করিতেছে। আজ রবিবার, আমরা মাছ খাই না। মুগের ডাল, আলুপোস্ত, ফুলকপির দম, নূতন গুড়ের পায়েস রান্না হইতেছে। আজ আমার অখণ্ড বিশ্রাম, বাহিরে যাইবার কোন কাজ নাই। এইমাত্র শ্রীমান্ সুকুমার আসিয়া শ্রীপরমহংসদেবের জীবনী-সংক্রান্ত দুইখানি বই ফেরৎ দিল, এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পড়িবার জন্য লইয়া গেল। আরতি সুকুমারকে একটি হাঁসের ডিম সিদ্ধ ও একখানি কেক্ খাইতে দিয়াছিল। কেক্গুলি ফণীর ছোট বোন মায়ার তৈরী, গতকাল কতকগুলি কেক্ ফণী আমাদের খাওয়ার জন্য দিয়া গিয়াছিল। পাশের বাড়িতে একটি ভিখারী কাতর কণ্ঠে ভিক্ষা চাহিতেছে। এইমাত্র লেখা বন্ধ করিতে হইয়াছিল, একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক দেখা করিতে আসিয়া-

ছিলেন। প্রথমতঃ তাঁহাকে চিনিতে পারি নাই, পরিচয়ের পর তাঁহাকে চিনিতে পারিলাম। ইঁহার নাম শ্রীযুক্ত হরিমোহন দত্ত, প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে আমাদের গ্রামে জরিপ উপলক্ষ্যে ইঁহার সহিত আলাপ হইয়াছিল। অনেকদিন কানুন্‌গোব কাজ করিয়া এখন পেন্‌সান ভোগ করিতেছেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত আলিপুরে কানুন্‌গোর কাজ করিতেছেন। হরিমোহনবাবুর সহিত সাংসারিক সুখ-দুঃখের অনেক কথাবার্ত্তা হইল। ঢাকা জেলায় মুন্সিগঞ্জের নিকটস্থ একগ্রামে তাঁহার স্ত্রী মেয়েগুলিকে লইয়া বাস করিতেছেন, হরিমোহনবাবু ছেলেব কাছে আছেন, দশটি মেয়ের মধ্যে দুইটির বিবাহ হইয়াছে এখনও ৮টির বিবাহ দিতে বাকী। সংসারে সকলেরই নিজ নিজ অভাব-অভিযোগ আছে, দেখিতেছি। আজ ইংরাজী বর্ষ শেষ হইতেছে মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী যুদ্ধের চাপে পড়িয়া অন্নবস্ত্রের অভাবে বৎসরের পর বৎসর দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১৯৪৫

(১)

১৯৪৫ সাল। গত বৎসরের মধ্যে যুদ্ধের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, রুষ, আমেরিকা ও ইংলণ্ড জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া ক্রমশঃ জয়যুক্ত হইতেছে। অনেকে বলিতেছেন যে, এই বৎসরের মধ্যভাগেই জার্ম্মানী সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইবে এবং ইউরোপের যুদ্ধ শেষ হইবে। কিন্তু জাপানের যুদ্ধ কবে শেষ হইবে কিছুই বুঝা যাইতেছে না। দ্রব্যাদি পূর্ব্ববৎ মহার্ঘ্য, বরং কোন কোন জিনিষ প্রায় দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। বাজারে ভাল সরিষার তৈল পাওয়া যায় না, গভর্ণমেণ্ট ১।/০ সের বাঁধিয়া দিয়াছে, কিন্তু যে তৈল আমরা ২৲ টাকা করিয়া ক্রয় করিতেছি তাহাও খাঁটি নয়। চাউল ১৬৲ টাকা মণ। ভেজিটেবল ঘি পাওয়া যাইতেছে না। কাটা রুই মাছ ৩৲ টাকা সের, ছোট টাট্‌কা চিংড়ী ১॥০ সের, হাঁসের ডিম পাঁচ আনা জোড়া, মাংস ২॥০ টাকা সের। কয়লা এখনও পাওয়া যাইতেছে, ১॥৵০ মণ। এবৎসরে কাপড় কলিকাতার কোন দোকানে নাই, লংক্লথ পাওয়া যাইতেছে না। কখনও কখনও গভর্ণমেণ্টের কোন দোকানে **Standard Cloth** কিছু কিছু বিক্রয় হইতেছে, কিন্তু সেখানে অত্যন্ত ভিড়, ২।৩ ঘণ্টা ভিড় ঠেলিয়া রৌদ্রে দাঁড়াইয়া থাকিলে তবে মোটা

৯ হাত ৪৪ ইঞ্চি Standard Cloth পাঁচ টাকায় একজোড়া পাওয়া যায়। পল্লী অঞ্চলে কাপড়ের অভাবে স্ত্রীলোকেরা আত্মহত্যা করিয়াছে, এ সংবাদ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। গিনি সোণা ৭০৲ টাকা ভরি। চতুর্গুণ দাম দিয়াও জিনিষ পাওয়া যায় না, অথচ মধ্যবিত্ত চাকুরীজীবী লোকের আয় কিছুই বাড়ে নাই। নিজের দেশে এত কষ্ট এবং অসহায় অবস্থা কেবলমাত্র পরাধীনতার জন্যই হইয়াছে। দেশের যাঁহারা নেতৃস্থানীয় তাঁহারা লম্বা লম্বা বক্তৃতা দিতেছেন, নিজেদের আর্থিক অবস্থা ন্যায় এবং অন্যায়রূপে উন্নত করিতেছেন, বিদেশীর অঙ্গুলী-পরিচালিত দেশী লোকের গভর্ণমেণ্টের কাঠামো ঠিক আছে, উৎকোচপ্রদান ব্যতীত কোন কার্য্য উদ্ধার করিবার উপায় নাই। বাঙ্গালী অন্নাভাবে নির্জ্জীব, ধীরে ধীরে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে অথচ এই অবস্থার প্রতিকার নাই, কেহ যেন ইহার জন্য দায়ীও নহে। ইহাই বাঙ্গালা দেশের বর্ত্তমান চিত্র।

(২)

এই বৎসর আমার পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইল। বাঙ্গালী নানাবিধ কারণে পঞ্চাশের পর বৃদ্ধ হইয়া পড়ে সুতরাং আমি এখন বৃদ্ধশ্রেণীভুক্ত হইলাম। শরীরেও পরিবর্ত্তন হইয়াছে বুঝিতে পারি। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, বিশেষ করিয়া পদদ্বয় শীর্ণ হইয়া গিয়াছে, পূর্ব্বের মত দৃঢ় ও মাংসল নহে। তিনটি দাঁত পড়িয়া গিয়াছে, সেগুলি বাঁধাইয়া লইয়াছি, অন্য দাঁতগুলিও সুস্থ ও সবল নহে। আমার মুখের কথা সাধারণতঃ সুস্পষ্ট কিন্তু দাঁতগুলি বাঁধানর পর হইতে এই সুস্পষ্টতা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বুঝিতে পারি। মাথার চুল বয়সের অপেক্ষাও বেশী পাকিয়া গিয়াছে। যাহারা বহুদিনের পর আমাকে দেখে তাহারা আমার শারীরিক

পরিবর্ত্তনের কথা প্রায়ই উল্লেখ করে। সংসারে এখন আমরা দুইটি মানুষ—আমি ও আরতি। খরচ কম হইবারই কথা কিন্তু আমি ব্যয়-সংক্ষেপ করিতে পারি না, আয়ের অপেক্ষা বেশী খরচ করাই আমার চিরকালের কু-অভ্যাস। কলেজের আয় সামান্য, তাহাতে সংসার চলে না, মধ্যে মধ্যে প্রাইভেট টিউসান থাকে বলিয়াই কোন রূপে ব্যয় সঙ্কুলান হইয়া যায়। প্রায় ৩।৪ মাস হইতে অনেকগুলি ছাত্র পড়ান চলিতেছে এবং I. A. ও B. A. পরীক্ষার শেষ পর্য্যন্ত চলিবে বলিয়া এখন আমার অর্থকষ্ট নাই। তবে এই বৎসর সমস্ত ছাত্রগুলিকেই তাহাদের বাড়ীতে যাইয়া পড়াইতে হয়, কেহ আমার বাড়ীতে আসিয়া পড়ে না, ট্রাম এবং বাসে সর্ব্বদাই ভিড় সুতরাং বিভিন্ন স্থানে ছেলে পড়াইতে হওয়ায় অন্যান্য বৎসরের তুলনায় এবার কিছু বেশী পরিশ্রম হইতেছে। ৫২নং সার্পেণ্টাইন লেনে শ্রীমান তারাপদ ও বিশ্বনাথকে I. A. পড়াইতে যাই, সপ্তাহে পাঁচদিন, মাসিক বেতন ১১০৲ টাকা, শ্রীমান সুন্দরমল পাটেসারিয়া নামে জনৈক মাড়োয়ারী ছাত্রকে ১৫০নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউয়ে সপ্তাহে তিন দিন I. A. পড়াইতে যাই, মাসিক বেতন ৭৫৲ টাকা, শ্রীমান সুবলচন্দ্র বল্লভ নামে B. A. পরীক্ষার্থী ছাত্রকে ২৬নং গালিফ ষ্ট্রীটে সপ্তাহে তিন দিন পড়াই, মাসিক ১০০৲ টাকা। শ্রীমান অসীম কুমার সিংহ দুই বৎসর পূর্ব্বে I. A. পরীক্ষার সময় আমার কাছে পড়িয়াছিল, এবার সে B. A. পরীক্ষার্থী। তাহাকে পড়াইবার জন্য ২৮এ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটে সপ্তাহে তিন দিন যাইতে হয়, মাসিক বেতন ১০০৲ টাকা। শ্রীমান বিনয় কুমার সেন, B. A. পরীক্ষার্থী, তাহাকে পড়াইবার জন্য সপ্তাহে তিন দিন বালীগঞ্জে ১নং ফার্ণ রোডে যাইতে হয়, মাসিক বেতন ১২৫৲ টাকা। এই কয়েকটি ছেলেকে প্রায় ৩।৪ মাস পড়াইতে হইবে। আজকাল ট্রাম-

বাসে সহজে উঠিতে পারা যায় না, কলিকাতার লোক-সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হওয়ায় ট্রামে বাসে সর্ব্বদাই ভীড়—লোক ঝুলিতে ঝুলিতে চলিয়াছে, বিপদাপদ প্রত্যহই লাগিয়া আছে। তথাপি ভগবানের দয়ায় চতুর্দ্দিকে পড়াইতে যাইতে কোন ক্লান্তি অনুভব করি না, তাঁহার দয়ায় যে টাকা পাইতেছি, তাহাতে খরচ সঙ্কুলান হইতেছে। সমস্ত বৎসর এরূপ আয় থাকে না, সুতরাং সময় সময় অর্থাভাবে কষ্ট পাইলেও মধ্যে মধ্যে যে আয় হয় তাহাতে সমগ্র বৎসরের ব্যয় সঙ্কুলান হইয়া যায়। তাঁহার অহেতুকী দয়া ব্যতীত এই মন্বন্তরের সময় সংসার চালানো আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইত।

(৩)

আরতি আজকাল অনেক রকম রান্না করিতে শিখিয়াছে। আমি সারাদিন ছেলে পড়াইয়া যখন বিকালে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া বাড়ীতে ফিরি, তখন দেখি যে আমার জন্য আরতি মুখরোচক খাবার তৈয়ারী করিয়া রাখিয়াছে। কোনদিন মাছের চপ, কোনদিন সিঙ্গাড়া, কোনদিন বা মটরসুঁটির চপ তৈয়ার করিয়া রাখে। আমি একা খাইতে ভাল-বাসি না, সাধারণতঃ কোন কোন প্রতিবেশীদের কিছু খাবার পাঠাইয়া দিই। আরতি একাই সমস্ত জোগাড় ও তৈয়ার করে, তাহাতে তাহাকে প্রায় সমস্ত দ্বিপ্রহরই এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হয়। ইহাতে আরতির বিরক্তি নাই। ৮ই ফেব্রুয়ারী বিকাল ৫টার সময় বাড়ী ফিরিয়া দেখি যে, আরতি একচল্লিশখানি বড় বড় মটরসুঁটির চপ করিয়া রাখিয়াছে। আমার মুখহাত ধোয়া হইলে গরম ভাজিয়া ছিল। ছোট ডাক্তারবাবুকে ১০ খানা, পূর্ণিমার শ্বশুরবাড়ীতে ১২ খানি, গাবুকে ৪ খানি, সুধীরবাবুকে ৪ খানি, অপূর্ব্ববাবুকে ২ খানি দেওয়া

হইল। আমি ৫ খানি খাইলাম; আরতি ৪ খানা খাইল। মটর-সুঁটির চপ আরতি চমৎকার করে; সকলেই উহার রান্নার সুখ্যাতি করেন। এই চপ তৈয়ারী অত্যন্ত পরিশ্রমসাধ্য ব্যাপার, তথাপি প্রসন্নমনে সে একাই এই সমস্ত প্রস্তুত করিয়া থাকে। বিকালে আমার ক্ষুধা পায়; আরতির এইরূপ বিভিন্ন প্রকারের খাবার প্রায় প্রত্যহই হইতেছে।

(৪)

১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১লা ফাল্গুন, মঙ্গলবার বেলা ২—৫৫ মিনিটের সময় অরুণার একটি খোকা হইয়াছে,—এই সংবাদ ফণীর ছোটবোন মায়া আমাদের জানাইল। তিনটি মেয়ের পর একটি খোকা,—অরুণা এবং তাহাদের বাড়ীর সকলেই আনন্দিত। আরতি সংবাদ পাইয়া খুব খুসী হইয়াছে।

২৫শে ফেব্রুয়ারী বিকালবেলা কালীঘাট গিয়া অরুণার খোকাকে দেখিলাম। অরুণা আনন্দিত মুখে খোকাকে কোলে করিয়া আমাকে দেখাইল। মায়ের কোলে শিশুর শোভা অপূর্ব্ব। শিশু তখন নিদ্রিত, দাদা-মহাশয়ের উপস্থিতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। তাহার দুর্ব্বল শুষ্ক ও আতপদগ্ধ শরীর দেখিয়া আমার মনে হইল, তাহার রং কালো হইবে। পাঁচটি টাকা দিয়া সদ্যজাত শিশুকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিলাম। আমি সমস্ত নাতিনাতিনীদিগকে প্রথম দেখিবার সময় পাঁচটি করিয়া টাকা দিয়া থাকি। ৪ঠা মার্চ্চ, রবিবার কালীঘাট হইতে একজন চাকর আসিয়া আরতিকে একখানি পত্র দিয়া গেল। এই পত্র হইতে অরুণার আনন্দের কিছু অনুমান করা যাইবে বলিয়া চিঠিখানি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

কালীঘাট
রবিবার
সকাল ৯৷৷০ টা
(৪।৩।৪৫)

কল্যাণীয়া,

টুটাই, তোমার চিঠি আমি গতকাল পেয়েছি। এখনও খোকার ষষ্ঠীপূজা হয়নি বোলে আমি তোমাদের চিঠি লিখতে পারিনি। ২১ দিনে ষষ্ঠীপূজা হবে। খোকার নাম হয়েছে শঙ্কর। কারণ তিন মেয়ের পর ছেলে হলে তার 'শ' দিয়ে নাম রাখতে হয়। তোমার জামাইবাবু বলেন, খোকার নাম থাকবে শিবনাথ। আমি শঙ্কর নামেই ডাকি। তিন মেয়ের পর ছেলে হলে অনেক তুক্‌তাক্ কর্ত্তে হয়—একটা কাঁসার বাটী ভাঙতে হয়, বামুনকে পাঁচপো তেল আর মাষ কলাই দান কর্ত্তে হয়। খোকা দেখতে নমির মতই হবে বোধ হয়। রংটাও ঐ রকম হবে হয়ত। লম্বা হবে খুব তবে এখন বড় রোগা হয়েছে। খোকা ৬ দিন বয়স থেকে গ্লুকোস্, গ্লাক্সো, আর কমলালেবুর রস খায়। খোকা যখন জন্মেছিল তখন বেশ ফর্সা হয়েছিল এখন কাল হয়ে গেছে একটু। খোকার পিসিরা খোকার জন্যে সিল্কের পাঞ্জাবী আর জামা সেলাই করেছে অনেকগুলি। খোকার জ্যাঠাইমা সার্টের জন্য কাপড় দিয়েছেন। আমার বড় ভাসুর এসেছিলেন, খোকা জন্মাবার পরদিন। খোকা জ্যাঠাবাবুদের ও জ্যাঠাইমার কাছ থেকে ৮৲ পেয়েছে এবং পাশের বাড়ীর একজন মেয়ে খোকাকে দেখে ৫৲ দিয়েছে। মেয়েরা সবাই কোলে করেছে খোকাকে। মানা বল্লে, "মা, আমাদের মেয়ের অভাব তো নেই, ছেলেরই অভাব"। খোকা জন্মেই ওর জ্যাঠাইমার কোলে উঠেছিল। মুকু বলে, "মা, তুমি খোকাকে আদরের

কথা বোল্‌ছ, আমি জন্মাতে আমাকে কি আদর কর্ত্তে”? । আমি মুখে বল্‌লাম ‘হুঁ’। কিন্তু মনে ভাবলাম, ‘তোমার বেলায় আমি দুদিন পিছন ফিরে তাকাইনি, তোমার দিকে।’ আর একদিন মুকু নাই দেখে বোলছে, “এর নাইটা কি রকম, এ ছেলে তোমার বাঁচবে না”। আমি যখন খুব বকাবকি কর্ত্তে লাগলাম, তখন পালিয়ে গেল ঘর থেকে। সেটেরা পূজো হয় ৬ দিনে। ঐ দিন তোমার জামাইবাবু ছানা কিনেছিলেন বৌবাজার থেকে। শান্তি ঠাকুরঝি সন্দেশ তৈরী করেছিল, ৭৫টা সন্দেশ হয়েছিল। আটকৌড়েতে অমৃত জিলিপি, আর মোয়া হয়েছিল। ৫৷৷০ টাকার দুয়ানি প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে দেওয়া হয়েছিল আটকৌড়েতে। তুমি একদিন এসো বাবার সঙ্গে খোকাকে দেখতে। তোমাদের সকলকে সন্দেশ খাওয়াব সুবিধেমত। বাবাকে আমার প্রণাম জানিও। বৌদির হাত কেমন আছে। শিব-রাত্রির দিন থেকে আমার শরীর খারাপ হয়েছিল, মঙ্গলবার দিন খোকা জন্মাল। খোকা জন্মাবার পর রাত্রে বৃষ্টি হয়েছিল, বৃষ্টি হওয়া নাকি খুব ভাল। একটা ঝি রাখা হয়েছে ১০ করে রোজ দিয়ে খোকার জন্য ২১ দিন অবধি। সেই ঝিটা বলে, “এই ছেলে তোমার মহাপুরুষ।” তোমার জামাইবাবুর খোকা যেদিন জন্মেছে সেদিন ৩২০৲ আয় হয়েছে। তার আগের দিন ৬৫৲ আয় হয়েছে। খোকা জন্মাবার দু’একদিন আগে থেকে এই পর্য্যন্ত ১২০০৲ টাকা এসেছে তোমার জামাইবাবুর। আমার শ্বশুর খুব খুসী হয়েছেন খোকা হওয়াতে। উনি খুব আশীর্ব্বাদ ক’রে চিঠি লিখেছেন ভাগলপুর থেকে। আমি ভাল আছি একরকম। তবে একটু দুর্ব্বলতা আছে। নান্তু ও বুজিদের খবর দিও। ওদের তুমি জানিয়ে দিও, পরে সন্দেশ খাওয়াব সকলকে। বুজি ও সুকুমার এবং নান্তু আমায় চিঠি দিয়েছে। মুকু

খোকার টাকা দেখে বলে—"ঐ টাকা আমাদের চারজনের তো মা ?" তুমি আমাব আশীর্ব্বাদ নিও। ইতি—

বড়দি

অরুণার এই সুদীর্ঘ আনন্দব্যঞ্জক চিঠি পড়িয়া আমিও আনন্দিত হইলাম। একটি খোকা হইয়াছে, কত আশা, কত আনন্দ! যদি ছেলে বিদ্বান, ধীর ও পিতামাতার অনুগত হয়, তাহা হইলে মানুষের আশা পূর্ণ হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় পিতামাতার সমস্ত আশায় ছাই দিয়া ছেলে মূর্খ দুর্ব্বিনীত হইয়া উঠিল, কুলাঙ্গার হইয়া নিজের জীবন ব্যর্থ করিয়া ফেলিল। বিচিত্র সংসারে সব রকম দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ আজকাল সমাজে এমনই বায়ু প্রবাহিত হইতেছে যাহার ফলে সুপুত্র অপেক্ষা কুপুত্রের সংখ্যাই অধিক। আজ তাই ভয় হয় বাংলার হিন্দুসমাজে যে ভাঙ্গন দৃষ্টিগোচব হইতেছে তাহার পরিণাম কোথায় কে বলিতে পারে? আমি অরুণার নবজাত পুত্রের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলাম, সে যেন তাহার পিতামাতার আশা পূর্ণ করিয়া, সুস্থ, সবল, ধীব ও বিদ্বান হইয়া বিশ্বপিতাকে জানিয়া তাহার মনুষ্যজন্ম সার্থক করিতে পারে।

(৫)

১৭ই মার্চ্চ, শনিবার, অপরাহ্ন প্রায় ৬টার সময় আমার সিটী কলেজের ভূতপূর্ব্ব সহযোগী শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ মুখোপাধ্যায় কালীঘাট হরিশ মুখার্জ্জি রোডস্থ ভবনে দেহত্যাগ করেন। ফণীবাবু অঙ্কের

অধ্যাপক, বর্ত্তমানে কয়েকবর্ষ যাবৎ তিনি বঙ্গবাসী কলেজে কার্য্য করিতেছিলেন। আমরা উভয়েই সমবয়সী এবং একই বৎসরে এম. এ. (M. A.) পাশ করিয়াছিলাম এবং প্রায় একই সময়ে সিটী কলেজে অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত হই। সিটী কলেজের ছাত্রাবাসেও আমরা দুই জনে প্রায় দশবৎসর এ্যাসিষ্টেণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কার্য্য করিয়াছিলাম। একত্র কাজ করা এবং বাস করার জন্য উভয়ের মধ্যে প্রীতির বন্ধন স্থাপিত হয়। ফণীবাবু প্রায় দুইমাস যাবৎ Jaundice (ন্যাবা) রোগে ভুগিতেছিলেন। মৃত্যুর প্রায় পনর দিন পূর্ব্বে তিনি একখানি চিঠি দিয়া আমাকে তাঁহার সহিত দেখা করিতে বিশেষ অনুরোধ করেন। আমি কালীঘাট যাইয়া অরুণাদের বাড়ী দেখা করিয়া মানাকে সঙ্গে লইয়া ফণীবাবুর বাড়ী যাই। ফণীবাবুকে দেখিয়া চমকিয়া যাইলাম। মানুষের শরীর রোগে এত হরিদ্রাবর্ণ হইয়া যায়, তাহা জীবনে এই প্রথম দেখিলাম। নানাবিধ কথাবার্ত্তার পর বিদায় লইলাম। ক্রমশঃ ফণীবাবু দুর্ব্বল হইয়া ১৭ই মার্চ্চ দেহত্যাগ করেন। তাঁহার প্রথমা স্ত্রীর দুইটি ছেলে আছে এবং দ্বিতীয়া স্ত্রীর একটি ছেলে ও সাতটি মেয়ে। বে-সরকারী কলেজে মাহিনা অত্যন্ত কম, তাহা ছাড়া বৃহৎ সংসার, সুতরাং ফণীবাবু বিশেষ কিছুই সংস্থান করিয়া যাইতে পারেন নাই। শ্রাদ্ধাদি নিষ্পন্ন হইলে ফণীবাবুর ছেলেটি আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিল। তাহার মুখে শুনিলাম সামান্য কিছু টাকা কলেজের প্রভিডেণ্ট ফণ্ডে আছে এবং কিছু টাকা জীবনবীমা হইতে পাওয়া যাইবে। প্রথম পক্ষের ছেলে দুইটি উপার্জ্জন করে কিন্তু তাহারা পৃথক, দ্বিতীয় পক্ষের ছেলেটি সামান্য মাহিনা পায়। সুতরাং ৮।৯ টা মুখের অন্ন-সংস্থান করা দুরূহ ব্যাপার। দ্বিতীয়বার বিবাহ করা বোধ হয় ফণীবাবুর পক্ষে ভুল হইয়াছিল।

তিনি বৈষ্ণব ছিলেন, নিরামিষ ভোজন করিতেন, ভগবানে তাঁহার আস্থা ছিল। তথাপি জীবনে সুখ পান নাই, মৃত্যুর পূর্ব্বে সংসারের দুশ্চিন্তাও তাঁহাকে শান্তি দেয় নাই। ফণীবাবুর মৃত্যু-সংবাদে মর্ম্মাহত হইলাম, মনে নানাবিধ চিন্তার উদয় হইতে লাগিল।

(৬)

১লা বৈশাখ, ১৪ই এপ্রিল, বাংলা নববর্ষ ১৩৫২ সাল আরম্ভ। আজ সমস্তদিন বাড়িতেই বসিয়া আছি। সকালবেলা ছোট ডাক্তারবাবু তাঁহার পৌত্র শম্ভুকে লইয়া আসিয়া বলিলেন, "শম্ভু আপনাকে নববর্ষের প্রণাম জানাতে এসেছে।" আমি হাসিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলাম। এই শম্ভুটির বয়স প্রায় ১০ মাস, বৈশাখমাস সে এই প্রথম দেখিল। শম্ভু ডাক্তারবাবুর মধ্যম পুত্র তপেন্দ্রবাবুর ছেলে। এই মানবক উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, স্বাস্থ্যবান এবং প্রিয়দর্শন, চোখের তারা দুইটি সাহেবদের মত ধূসরবর্ণ। ডাক্তারবাবুর বৃহৎ সংসারে এই শিশু সহজেই নিজের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। তাহাকে কেন্দ্র করিয়া কত চিন্তা, কত স্নেহ, ও কৌতুক অবিরত প্রবাহিত হইতেছে তাহার নির্ণয় নাই। ঈষৎ ক্রন্দন করিলেই অসংখ্য বাহু তাহাকে বেষ্টন করিবার জন্য প্রসারিত হইতেছে, কত বর্ণের কত বিচিত্র জামা ও জুতা তাহার জন্য আসিতেছে, যাহাতে হামাদিয়া বারান্দার ধারে যাইয়া পড়িয়া না যায়, সেইজন্য ঢাকা দিয়া রাখিবার কাষ্ঠ-নির্ম্মিত সুবৃহৎ এক অপূর্ব্ব বেষ্টনী। এই একটি শিশুর আগমনে ডাক্তারবাবুর বৃহৎ সংসারে নূতন চাঞ্চল্য, নূতন উৎসাহ। শিশুদিগের মনস্তত্ত্ব বিচিত্র, অনেক সময় তাহাদের মনের ভিতর আমরা প্রবেশ করিতে পারি না। বাহিরে বেড়াইতে যাইবার জন্য শম্ভুর সর্ব্বদাই উৎসাহ। সে জানে কে তাহাকে

বাহিরে লইয়া যায়, কে সর্ব্বদাই অন্তঃপুরে আবদ্ধ রাখে তাহাও শম্ভুর অবিদিত নহে। সুতরাং ঠাকুমার কোলে যাইতে শম্ভুর ঘোরতর আপত্তি, অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়াও বৃদ্ধা পিতামহী শম্ভুব মন অধিকার করিতে পারেন নাই। অথচ তাহার পিতামহের কোলে যাইতে শম্ভু সর্ব্বদাই উৎসুক,—পিতামহ পাশ কাটাইয়া পলাইবার উপক্রম করিলে, শিশুর কোমলমুষ্টি হঠাৎ তাঁহার পাঞ্জাবীর একপ্রান্ত ধরিয়া ফেলে, তখন সবল, দীর্ঘ দেহ, গত মহাযুদ্ধ-বিজয়ী ক্যাপ্টেন এই পিতামহের গতি রুদ্ধ হইয়া যায়, শিশুর আকর্ষণ হইতে মুক্ত হইবার শক্তি তাঁহাব থাকে না। শম্ভু কোলে চড়িয়া বাহিরে যাইবার জন্য কত রকম ছলনা অবলম্বন করে তাহার সীমা নাই। মুখে অস্ফুট শব্দ করিয়া, কোমল হস্ত ঊর্দ্ধদিকে নিক্ষেপ করিয়া নাচিয়া প্রিয়জনেব দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তাহাতেও বিফল মনোরথ হইলে রোদন করিবার ভয় দেখায়। সকল রকম ছলনা হয়ত ব্যর্থ হইতে পারে কিন্তু তাহার দীর্ঘ বিস্ফারিত কোমল চক্ষুদ্বয়ের কোলে জল থাকুক বা নাই থাকুক শুধু একবার রোদন শব্দের অনুকরণ করিলেই তাহার কোলে চড়িয়া বাহিরে যাওয়ার অভিষ্টসিদ্ধি হয়। ডাক্তারবাবুর চরিত্রের একটা বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়াছি যে, তাঁহার স্নেহধারা অন্তঃসলিলা, সাধাবণতঃ বাহিরে তাহার প্রকাশ নাই। একটি পৌত্রী ও দৌহিত্রী সর্ব্বদাই তাঁহাব নিকটে রহিয়াছে, বয়সও তাহাদের ৪।৫ বৎসরের অধিক নয় কিন্তু তাঁহার কোলে চড়িয়া রাস্তায় বেড়াইবার সৌভাগ্য তাহাদের কোন দিন হয় নাই। কিন্তু এই ক্ষুদ্র শিশুটি বৃদ্ধ পিতামহের চরিত্রেও পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছে,—শীতকালে তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া রাস্তায় রৌদ্রে দাঁড়াইয়া থাকিতে অথবা মুখের অভিব্যক্তি ও বাক্যের দ্বারা তাগর প্রতি প্রীতি ও স্নেহ প্রকাশ করিতে ডাক্তারবাবুকে অনেকদিন লক্ষ্য করিয়াছি। হয়ত

শিশুর পেটের পীড়ায় উৎকণ্ঠিত পিতামহ বিনিদ্র যামিনী যাপন করিয়াছেন। শিশুর প্রভাব সংসারে এতই অধিক। আমি ভাবি এই শিশু একদিন বড় হইবে, পিতামহ, পিতামহী হয়ত তখন অন্য জগতে—যাঁহাদের নিকট সে এত স্নেহ আজ পাইতেছে, তাঁহাদের স্মৃতিও তাহার নিকট তখন অবলুপ্ত। এই শিশু আবার পিতা হইবে, নিজের শিশুকে এইরূপেই স্নেহের বন্ধনে আকর্ষণ করিবে। এই ৯নং বৃন্দাবন মল্লিক লেনস্থ বাটীতে কালস্রোতে অতীতে আরও কত শিশু আসিয়াছে, শিশুর জন্মগত স্নেহের অধিকার দাবী করিয়াছে, এই বাড়ীর প্রতি ধূলিকণা তাহাদের বিস্মৃত আনন্দের নীরব সাক্ষী। বিস্মৃতিই সংসারের ধর্ম্ম, সংসারের কাছে অতীত নাই, ভবিষ্যৎ নাই, শুধু বর্ত্তমানই সত্য, কিন্তু নিরন্তর কালস্রোতে বর্ত্তমানও কত তুচ্ছ, কত ক্ষণস্থায়ী, জীববর্ম্মী মানুষ তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না।

(৭)

১৬ই এপ্রিল, সোমবার নৈহাটী রেজেষ্টারী আপিসে যাইয়া আমাদের সমস্ত পৈত্রিক বিষয়-সম্পত্তি ও বসতবাটীর আমার অর্দ্ধেক অংশ আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীবিনয় ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে একশত টাকা মূল্যে বিক্রয় করিয়া রেজেষ্টারী করিয়া দিয়া আসিলাম। দেশে যে সমস্ত জমিজমা আছে তাহার আয়ের অংশ প্রায় ১৫।২০ বৎসর অথবা তদূর্দ্ধকাল বিনয়ই ভোগ করিতেছিল, আমি কিছুই লই নাই। নানাবিধ কারণে দেশে আমার যাতায়াত নাই এবং কখনও ভবিষ্যতে দেশে যাইয়া বাস করিব, ইহাও আর সম্ভবপর নহে। আমার মৃত্যুর পর আমার জামাতাগণের মধ্যে কেহ জাগুলি যাইয়া ক্ষুদ্র বিষয়ের অতিক্ষুদ্র আয় সংগ্রহ করিবে, ইহাও সম্ভবপর নহে। অথচ আমার বিষয়-সম্পত্তি আছে, এইচিন্তা যেন

আমার মনের উপর কিছুদিন যাবৎ ভাবী হইয়া বসিয়া আছে। সুতরাং এই সমস্ত নানাবিধ ব্যাপার বিবেচনা করিয়া আমি আমার পৈত্রিক সম্পত্তি বিক্রয় করিব এবং বিষয়-বন্ধন হইতে মুক্ত হইব, স্থির করিয়াছিলাম। বিষয়ের মধ্যে আমার অংশে প্রায় আশি বিঘা ব্রহ্মোত্তর জমি ও বসত বাটীর অর্দ্ধেক অংশ। গ্রামে খোঁজ করিয়া দেখিলাম, ক্রেতা যাঁহারা আছেন, তাঁহারা প্রকৃত দামের সিকি মূল্যে আমার বিষয় ক্রয় করিতে চান। নিকটস্থ গ্রাম-নিবাসী জনৈক মুসলমান ভদ্রলোক প্রকৃত মূল্যে আমার জমিজমা ক্রয় করিতে রাজী হইলেন, পৈত্রিক ভিটার সংলগ্ন বাটীর অংশ বিক্রয় করিব না স্থির হইল। কিন্তু আমার বড় জামাতা ফণীর লিখিত এক পত্রের উত্তরে মা ইহাতে আপত্তি জ্ঞাপন করিলেন। ইতিমধ্যে বিনয়ের এক পত্র পাইলাম—সে জানিতে চাহিয়াছিল কত মূল্যে আমি সমস্ত বিষয় সম্পত্তি ও বসতবাড়ীর অংশ বিক্রয় করিতে প্রস্তুত আছি। আমি চিন্তা করিয়া ফণী ও আরতির সহিত পরামর্শ করিয়া একশত টাকা মূল্য নির্দ্দেশ করিয়া বিনয়কে পত্র দিলাম। বিনয় খুব খুসী হইয়া আমার "মহানুভবতা"র উল্লেখ করিয়া আমার প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিল। আমি বিনয়ের পত্র পাইয়া মনে মনে হাসিলাম। রেজেষ্ট্রীর জন্য বিনয়কে প্রস্তুত হইতে বলিলাম। ইতিমধ্যে বিনয় লিখিল যে, একশত টাকা বিক্রয় মূল্য দলিলে লিখিলে প্রকৃত মূল্য অপেক্ষা অনেক কম হইতেছে এবং গভর্ণমেণ্টের রেজেষ্ট্রী করার ফি ঠকান হইতেছে, এই অজুহাতে সাবরেজিষ্ট্রার আপত্তি করিতে পারেন। আমি বিনয়কে লিখিলাম যে, যাহা ইচ্ছা সে তাহাই দলিলে লিখিয়া লইতে পারে। পরে বিনয় স্থির করিল যে, দলিলে এক হাজার টাকা লেখা হইবে। আমি সম্মত হইলাম। বিনয় আমাকে পূর্ব্বেই একশত টাকা দিয়াছিল, দলিলে অবশ্য হাজার টাকাই লেখা হইল। আমি ১৬ই এপ্রিল, সোমবার,

বেলা ১০টার গাড়ীতে নৈহাটী যাইলাম, বিনয় পূর্ব্ব হইতেই উপস্থিত ছিল। বন্ধুবর শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আলীপুরের ডেপুটি পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট। তিনি নৈহাটী থানার সহকারী দারোগা শ্রীযুক্ত বারিদবরণ সেন মহাশয়কে বলিয়া রেজেষ্ট্রারী আফিসে সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন যাহাতে দলিল রেজিষ্ট্রী করিতে কোন দেরী বা অসুবিধা আমার না হয়। আমি থানায় যাইলাম এবং তথা হইতে বারিদবাবুর সঙ্গে রেজিষ্ট্রী আফিসে উপস্থিত হইলাম। সাবরেজিষ্টার শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় আমার সহিত অতি সদয় ও ভদ্রব্যবহার করিলেন। কথাবার্ত্তায় তাঁহার সহিত পরিচয় হইল—তিনি আমার বৈবাহিক মহাশয় শ্রীযুক্ত পঙ্কজ বিহারী চট্টোপাধ্যাযের আত্মীয়, পিতার নাম শ্রীযুক্ত তারকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নিবাস গোবরডাঙার নিকট ঘোষপুর গ্রাম। তিনি বলিলেন, "তাহলে আপনি তো আমার আত্মীয়, আমি আপনাকে personally known বলিয়া identify করিয়া document-এ লিখিয়া দিব, দারোগাবাবুকে অপেক্ষা করিতে হইবে না"। যথাসম্ভব শীঘ্র দলিল রেজেষ্ট্রী হইয়া গেল, আমি সময়মত কলিকাতায় ফিরিয়া কলেজের ক্লাশ করিতে পারিলাম,—ছুটি লইতে হইল না।

এই বিষয় পৈত্রিক। ইহার এক অংশও আমার স্বোপার্জ্জিত নহে। বসতবাটীর কিয়দংশ আমি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলাম কিন্তু তাহাও বাবার 'প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের' টাকায়। এই বিষয়ের সহিত সমস্ত সংস্রব ছিন্ন করিবার পূর্ব্বে আমি অনেক চিন্তা করিয়াছিলাম। কেহ কেহ বলিয়াছিলেন যে বিষয় পড়িয়া থাকুক, ভবিষ্যতে যাহা হয় হইবে, নামমাত্র মূল্যে বিক্রয় করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু এই বিষয় এক দুর্ব্বহ ভারের মত আমার মনের উপর চাপ দিতেছিল, বিষয় এখনও রহিয়াছে,—এই চিন্তাই আমার পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠিতেছিল। আমার

জীবন বীমার সমস্ত টাকা চারিটি মেয়ের নামে পূর্ব্বেই assign করিয়া দিয়াছি। বিষয় ভোগ করিতে তাহারা কেহই জাগুলি যাইবে না ইহাও নিশ্চিত। সুতরাং ভবিষ্যতে যখন জীবিতাবস্থায় বা মৃত্যুর পর সংসার পরিত্যাগ করিব সে সময়ে যেন সর্ব্বগরা সর্ব্বরিক্ত হইয়া বিশ্বপতির চরণে লুটাইয়া পড়িতে পারি এই ইচ্ছাই আমার মনে বলবতী হইয়াছিল। "বিষম বিষয়তৃষ্ণা শান্তির কারণে" এই একমাত্র পথই আমার নিকট উন্মুক্ত। নৈহাটী যাইবার পূর্ব্বদিন রাত্রে বাবার ছবির নিকট বসিয়া তাঁহাকে আমার মনের সমস্ত কথা জানাইলাম, বলিলাম, "বাবা, তুমি বিষয় দিয়া গিয়াছিলে, তোমার অর্থ ও পরিশ্রমলব্ধ জিনিষ আমি ভোগ করিয়াছি, এখন জীবনের অপরাহ্ণকালে বুঝিয়াছি ভোগে সুখ নাই, বিষয়-ভোগ তুচ্ছ ও ক্ষণস্থায়ী, আধ্যাত্মিক জীবনের পক্ষে বাধা-স্বরূপ। তুমি অনুমতি দাও, আমি এই বিষয় পরিত্যাগ করিব, তোমার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি যেন এই পার্থিব ক্ষুদ্র বিষয়ের পরিবর্ত্তে অপার্থিব চিরন্তন বস্তু লাভ করিতে পারি।" গভীর রাত্রে চোখের জলে বহুক্ষণ প্রার্থনা করার পর মন প্রফুল্ল হইল, সব গ্লানি কাটিয়া গেল, মনে হইল বাবা, এই বিষয় পরিত্যাগ করিবার জন্য প্রসন্নমনে আমাকে অনুমতি প্রদান করিলেন। আমি শয্যাগ্রহণ করিয়া গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইলাম। ১৬ই এপ্রিল, সোমবার, নির্ব্বিঘ্নে, অতি সহজে সমস্ত কার্য্য নৈহাটীতে সম্পন্ন হইল, আমার মন হইতে যেন একটা ভার নামিয়া গেল। আজ আমি গৃহহারা, বিষয়-বৈভব-বিহীন, বিশ্বপালকের নিত্যপ্রদত্ত অন্নই এখন আমার ভরণপোষণের একমাত্র উপায়।

(৮)

২৩শে এপ্রিল গাবুর উপনয়ন হইল, প্রায় ১২০৲ টাকা আমার ব্যয় হইল। মুণ্ডিত-মস্তক নবীন ব্রহ্মচারীকে বেশ দেখাইতেছে।

৩০শে এপ্রিল, ১৭ই বৈশাখ, বেলা ১২-১৩ মিনিটের সময় পূর্ণিমার একটি খুকী হইয়াছে। ঐদিন আমার গ্রীষ্মাবকাশ আরম্ভ হইল, আমি কলেজ হইতে ফিরিয়া বাহিরের ঘরে বিশ্রাম করিতেছি এমন সময় পূর্ণিমার শ্বশুর বাড়ীর কৃষ্ণবাবু আসিয়া আমাকে খুকীর জন্ম সংবাদ দিয়া যাইলেন। কিছুদিন যাবৎ পূর্ণিমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন ছিলাম, নির্ব্বিঘ্নে সন্তান হইয়াছে জানিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম।

আজকাল আরতি সময় পাইলে মধ্যে মধ্যে বাহিরের ঘরে বসিয়া আমার সঙ্গে গল্প করে। একদিন কথা-প্রসঙ্গে সে বলিল যে, অরুণার তৃতীয় কন্যার নাম "নমিতা" ও তাহার মেজ'জার চতুর্থ কন্যার নাম "মিনতি", নিতান্ত অর্থবিহীন নহে, অনেক বিবেচনা করিয়া নামগুলি রাখা হইয়াছে। আমি আরতির দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে সে বলিল "বড়দি ও তার মেজ'জার অতো মেয়ে হওয়ায় ওরা ভয় পেয়ে শেষের মেয়ের নাম অনেক বুঝেসুঝে রেখেছে। 'নমিতা' নামের মানে যে, মেয়েদের সবাইকে বড়দি নমস্কার জানাচ্ছে যেন আর মেয়ে না হয়। 'মিনতি' মানে, মেয়ের হাত ধরে তার মা মিনতি কচ্ছে যেন ওদের বাড়ীতে মেয়ের দল আর না আসে। দেখুন বড়দির এবার আর মেয়ে হয়নি, খোকা হয়েছে"। আমি নামতত্ত্বের এই বিচিত্র অনুশীলনী শুনিয়া অনেক চেষ্টায় হাসি রোধ করিলাম এবং বলিলাম যে, অরুণার মেজ-জার যদি এবার খোকা হয় তবে আরতির ব্যাখ্যার সত্যতা নিঃসন্দেহে প্রতিষ্ঠিত হইবে। আরও বলিলাম "তোমার মা বড় বোকা ছিল, এই সমস্ত শাস্ত্র ও তুক্‌তাক্ জানত না, নয়ত আমার ৪।৫টি মেয়ে হোতনা, অরুণা হবার পরই একটা "নমিতা" বা "মিনতি" গোছের কিছু ঠিক কর্ত্তে পারলে ছেলেই হ'ত, মেয়েদের বিয়ের জন্য এত খোঁজাখুঁজি কর্ত্তে হতনা।" আরতি একবার বক্রদৃষ্টি করিয়া আমার মনের ভাবটা বুঝিবার চেষ্টা করিল কিন্তু আমার নির্ব্বিকার চক্ষু দেওয়ালের

দিকে তাকাইয়া আছে দেখিয়া আমার মনের ভাব কতটা বুঝিতে পারিল জানিনা।

১লা মে, মঙ্গলবার সকাল বেলায় কোন কাজ না থাকায় অরুণাদের বাড়ী যাইলাম। মানা, স্বকু ও নমিতা আমাকে দেখিয়া খুব খুসি, অরুণা আমার কাছে বসিয়া পা টিপিয়া দিল এবং পাকা চুল তুলিয়া দিতে দিতে খোকার সম্বন্ধে অনেক গল্প করিল। খোকা শঙ্করকে দেখিলাম, বেশ ফর্সা, সুগঠিত দেহ, চোখ দুইটি বড় বড়, মুখখানির গড়ন সুন্দর। তাহার মুখখানি দেখিয়া বহুবর্ষ পূর্ব্বের কথা মনে পড়িল—শিশু অরুণার আকৃতি, রং ও মুখ ঠিক এইরূপই ছিল। খোকা হাত পা ছুড়িয়া খেলা করিতেছিল এবং মধ্যে মধ্যে ঈষৎ হাসিতেছিল। সাতটি বোনের আদরের উপদ্রবে শঙ্করের মা সর্ব্বদাই সন্ত্রস্ত ও সতর্ক। কেহ আসিয়া চুমু খাইতেছে, কেহ বা গাল টিপিয়া দিতেছে, নমিতা খোকার মুখের সম্মুখে বসিয়া প্রবল ভাবে মাথা নাড়িয়া অস্ফুট ভাষায় অনর্গল কি বকিয়া যাইতেছিল। টেবিলের উপর দেখিলাম, বিচিত্র বর্ণের বিলাতী দুগ্ধের টীন, গ্লুকোসের শিশি ও কমলালেবু। সমস্তই শঙ্করের জন্য। একটী ক্ষুদ্র শিশুর আগমনে সংসারে কত উৎসাহ, কত আনন্দ, কত কাজ! আমি দ্বিপ্রহরে অরুণাদের বাড়িতে স্নান ও আহার সমাপন করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

(৯)

২রা মে সংবাদপত্র সমূহে প্রকাশিত হইল যে, হিট্‌লার ১লা মে তারিখে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি বার্লিনে থাকিয়া যুদ্ধ পরিচালনা করিতেছিলেন। যুদ্ধের গতি কিছুদিন যাবৎ জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যাইতেছিল, রুষ, ইংরাজ ও আমেরিকান সৈন্যগণ চতুর্দ্দিক হইতে বার্লিন নগরীকে পরিবেষ্টিত করিয়াছিল। ভূগর্ভস্থ একটি কক্ষে যুদ্ধ

পরিচালনা-কালে হিট্‌লার বোমার আঘাতে প্রাণত্যাগ করেন। এই মৃত্যুসংবাদে দুঃখিত হইলাম। এই মহামানব জার্ম্মান জাতিকে অতি দ্রুতগতিতে উন্নতির পথে লইয়া গিয়াছিলেন, আবার ২।১টি ভুলের জন্য তাঁহাকে নিতান্ত দুঃখীর ন্যায় মৃত্যুবরণ করিতে হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে জার্ম্মান জাতি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া বহুবর্ষের দুঃখের তিমিরে নিমগ্ন হইল। এই জার্ম্মান-নেতা নিরামিষাশী ছিলেন, বিবাহ করেন নাই, অকলঙ্ক চরিত্র লইয়া, ভগবানের শ্রীচরণে দৃষ্টি রাখিয়া জার্ম্মান জাতির উন্নতির জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। কিন্তু ভগবানের বিধান বিচিত্র। হঠাৎ বিশ্বপতি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন, হিট্‌লারের মৃত্যুর সহিত জার্ম্মান জাতির সমস্ত আশাভরসা অস্তমিত হইল।

(১০)

৪ঠা মে তারিখে বেলা ৬টার সময় মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটস্থ 'পূরবী' সিনেমায় "প্রিয় বান্ধবী" নামক একটি চিত্র দেখিতে গিয়াছিলাম। সাধারণতঃ আমি বায়স্কোপ দেখিনা কিন্তু সেদিন সকালে ছোট ডাক্তারবাবু একটি "পাস" জোগাড় করিয়া আনিলেন এবং বিকালে কোন কাজকর্ম্ম না থাকায় আমি তাঁহার সহিত বায়স্কোপ দেখিতে যাইতে সম্মত হইলাম। Captain S. N. Chaudhuri, Captain N. N. Chaudhuri, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ সান্ন্যাল, শ্রীযুক্ত সদানন্দ পালিত ও আমি—এই পাঁচজন একত্র হইয়া বায়স্কোপ দেখিলাম। "প্রিয়বান্ধবী"তে যে সমস্ত দৃশ্য চিত্রিত হইয়াছিল, তাহাদের অধিকাংশ বৃদ্ধ দর্শকদের বয়সের উপযোগী ছিলনা; তথাপি সকলে আনন্দ করিয়া বায়স্কোপ দেখিয়া নানাবিধ আলোচনা করিতে করিতে রাত্রি প্রায় ৯টার সময় বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম।

(১১)

৮ই মে তারিখে ইংরাজ, আমেরিকান ও রুষ মিলিত শক্তির নিকট জার্ম্মানী বিনাসর্ত্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, এই সংবাদ প্রকাশিত হইল। সুদীর্ঘ প্রায় ছয় বৎসর পরে ইউরোপীয় যুদ্ধের যবনিকা-পতন হইল। কিন্তু এই যবনিকার অন্তরালে যুদ্ধ, বিজ্ঞান, কলা, সাহিত্য, প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ে অগ্রণী একটি মহাজাতির কি শোচনীয় পরিণাম হইল এবং শত্রুর পদানত হইয়া এই দেশে যে জ্বলৎধারা মর্ম্মনিস্রাব কত কাল ধরিয়া নিরন্তর প্রবাহিত হইবে তাহা এখনও অজ্ঞাত ও অপরিকল্পনীয়। একদিন ইতিহাসে হয়ত এই দুঃখের চিত্র অঙ্কিত হইবে কিন্তু তখন বিজয়ী ও পরাজিত বর্ত্তমান নেতৃগণ সকলেই মানুষের হিসাব-নিকাশের বাহিরে চলিয়া যাইবেন। একটা বীরজাতির ইতিহাসে এমন শোচনীয় পরিণাম জগতে বোধ হয় বেশীবার দেখা যায় নাই। আজ আমার রাজপুতানা ও কার্থেজের কথাই বারংবার মনে পড়িতেছে।

(১২)

১২ই মে তারিখে, রাজপথে একটি বিস্ময়কর দৃশ্য আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। সেদিন সকালে প্রায় ৮ ঘটিকার সময় I. A. পরীক্ষা সংক্রান্ত কার্য্যের জন্য বালীগঞ্জে Head Examiner শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ৭২ নং বালীগঞ্জ প্লেস বাড়ীতে যাইতেছিলাম। তাঁহার বাড়ীর প্রায় কাছাকাছি হইয়াছি এমন সময় দেখিলাম যে, অপর দিক হইতে কয়েকটি বাছুর একত্র হইয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। তাহাদের সঙ্গে বড় গরু নাই, কোন রাখালও তাহাদের পরিচালনা করিতেছে না। ছয়টি বাছুরের মধ্যে পাঁচটি সমবয়স্ক, একটি একটু বড়। বড় বাছুরটি অগ্রণী, অপর পাঁচটি তাহার

পিছু পিছু চলিয়াছে। দেখিয়া মনে হইল বড় বাছুরটি নিজেই তাহার গন্তব্য পথ ভাল করিয়া জানে না, এক একবার এদিক ওদিক বিহ্বল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে ধীর গতিতে অগ্রসর হইতেছে। বাকী পাঁচটি বাছুরের চক্ষে কোন উদ্বিগ্নতা নাই, বড়টির নেতৃত্ব যেন মানিয়া লইয়া সহজেই তাহার পশ্চাৎগামী হইয়াছে। আমি রাস্তার একপাশে দাঁড়াইয়া তাহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। বড় বাছুরটি কিয়ৎদূর অগ্রসর হইয়া একবার করিয়া দাঁড়াইতেছে, যেন কি ভাবিতেছে, যেন কি খুঁজিতেছে, যেন পথটা ঠিক করিয়া লইতেছে! ছোট বাছুরগুলির মুখে কিন্তু কোন চিন্তা নাই, তাহারা বড় বাছুরের সঙ্গে দাঁড়াইতেছে এবং প্রয়োজনমত চলিতেছে। আমার অবস্থাও তো এইরূপ! আমার সঙ্গে কয়েকটি জীব ভগবান দিয়াছেন, তাহারা আমার সংসারে আমার পিছু পিছু চলিয়াছে, আমার নেতৃত্বে তাহাদের বিশ্বাস। কিন্তু বড় হইলেও আমি তাহাদের মতই অন্ধ, দূরদৃষ্টিবিহীন, পথভ্রান্ত, পথপ্রদর্শকের জন্য ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছি, পথ স্থির করিবার জন্য মাঝে মাঝে দাঁড়াইতেছি। তথাপি "বড়" সাজিয়া সংসারে চলিতে হইতেছে, পিছনে যাহারা চলিতেছে তাহারা জানেনা যে, তাহাদের অগ্রগামী পথপ্রদর্শক কত অন্ধ, কত অসহায়, ইহজীবনে কতবার ভুল পথে চলিয়াছে ও নিজের অদৃষ্টের বন্ধনে চলিতে চলিতে অপরকেও ভুলপথে পরিচালিত করিয়াছে।

I. A. পরীক্ষা উপলক্ষে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও আমাকে অনেকবার বালীগঞ্জে যাতায়াত করিতে হইয়াছে। কোন কোন দিন অতিপ্রত্যূষে যাইয়া বেলা প্রায় ১॥০টার সময় বাড়ীতে ফিরিয়া স্নানাহার সম্পন্ন করিয়াছি, কোন দিন বা দ্বিপ্রহরে ১টার সময় বাড়ী হইতে বাহির হইয়া কয়েকঘণ্টা কার্য্য করিয়া রাত্রি প্রায় ১০ঘটিকার সময়

বাড়ি ফিরিয়াছি। Scrutiny, Re-Examination-এর কাজ করিবার সময় প্রায়ই এইরূপ একাদিক্রমে কয়েকঘণ্টা Head Examiner-এর বাড়ীতে বসিয়া কার্য্য করিতে হয়। অতি প্রত্যূষে অথবা জ্যোৎস্না-প্লাবিত রাত্রিতে যখনই বালীগঞ্জে যাতায়াত করিয়াছি তখনই প্রকৃতির অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য আমার মনের সমস্ত কর্ম্মভার ও গ্লানি অপনোদন করিয়াছে। বালীগঞ্জ ধনী গৃহস্থের বাসভূমি। রেখাবদ্ধ বৃহৎ বাড়ীগুলি নানা বর্ণে রঞ্জিত—পত্রপুষ্পে পরিশোভিত তোরণদ্বার যেমন মনোরম তেমনই গৃহস্বামীর সুরুচিব্যঞ্জক। হয়ত দেখিলাম তরুণীগণ বিচিত্রবর্ণের বসন পরিধান করিয়া বিচিত্র ভঙ্গিতে কবরী বাঁধিয়া হাসির আলো ছড়াইয়া গজরাজবিনিন্দিত গতিতে রাজপথে বায়ু সেবন করিয়া বেড়াইতেছে। ইহাদের রূপই বা কত! কত দেশের কত রকমের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, বেশভূষা এই বালীগঞ্জের শ্রীবৃদ্ধি করিতেছে। দেখিতে দেখিতে ভাবিতাম, যেন এই সকল বাড়ীর নরনারীর মনে কোন চিন্তা নাই, সরল, সহজভাবে ইহাদের সংসার চলিয়া যাইতেছে, ইহাদের ভিতর ও বাহিরের পৃথিবীতে সবই সুন্দর, সবই সহজলভ্য, সবই ছন্দময়, সবই প্রেম ও ভালবাসায় উদ্ভাসিত। পরাধীন জাতির কোন কলঙ্ক যেন ইহাদিগকে স্পর্শ করে নাই, বিশ্বলক্ষ্মী যেন দুইহাতে ইহাদিগকে তাঁহার ভাণ্ডারের শ্রী, সুখ ও ঐশ্বর্য্য ছড়াইয়া দিয়াছেন। আবার প্রকৃতিও যেন ভগবানের এই লীলার উৎসাহী সহায়। দূরে দূরে বনস্পতি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে, সবুজ পাতা নাই, বায়ুহিল্লোলে সমস্ত অঙ্গ শিহরিয়া একটা অতিতীব্র লাল রংএর বিদ্যুৎ খেলিয়া যাইতেছে। এইগুলি কৃষ্ণচূড়া ফুলের গাছ। কোথাও বা সালের মত একটা ঋজুগাছ দাঁড়াইয়া আছে, সবুজ বড় বড় পাতার প্রাচুর্য্যে গাছের কি শোভা! এই সবুজ রং যে ঠিক কি প্রকার তাহা কোন ভাষাই ব্যক্ত করিতে পারেনা। রং-এ গাঢ়তা

নাই, আছে যৌবনের তরল স্বচ্ছতা,—একবার তাকাইলে চোখ যেন আর ফিরাইয়া লওয়া যায় না। কত ছোট ছোট গাছ পাশাপাশি দাঁড়াইয়া আছে, তাহাদের মসৃণ দেহ ও উজ্জ্বল বর্ণ দেখিলেই বুঝা যায় ইহারা যুবক, মহাকাল ইহাদের এখনও স্পর্শ করে নাই। মানুষের চেষ্টায় সাজান এই অঞ্চলের স্থানে স্থানে হয়ত মাঠ পড়িয়া আছে, কোথাও বা একটি ছোট ডোবা পানাতে আচ্ছাদিত,—অসতর্ক মনে হঠাৎ পল্লীগ্রামের মায়া সৃষ্টি করে। আবার দিনের এই বালীগঞ্জ রাত্রির জ্যোৎস্নায় বেশপরিবর্ত্তন করিয়া শ্বেতচন্দনলিপ্তা অভিসারিণীর পুষ্পিত কুঞ্জের মত অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে। একদিন রাত্রিতে কাজ সারিয়া বাড়ী ফিরিতেছি, মেঘে মেঘে আকাশের পথ ছাইয়া ফেলিয়াছে, বাতাসে যেন প্রলয়শঙ্খ বাজিতেছে, বৃষ্টি আসিতে আর দেরী নাই, চতুর্দ্দিক কাঁপাইয়া কাছেই কোথায় বাজ পড়িল। তখন অনেক বাড়ীর খোলা জানালার ভিতর দিয়া তীব্র আলো দেখা যাইতেছে, মৃদুগুঞ্জন শ্রুতি-গোচর হইতেছে, গেটের মাথায় লালফুলের লতাগুলি ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিতেছে,—কোথাও ভয় নাই, ঐশ্বর্য্য-সাধনার বেদীতে সমাসীন বালীগঞ্জ যেন যোগীর মত স্থির ও নির্ভয়। প্রবাসী পথিকের মন পথ চলিতে চলিতে মেঘ ও বৃষ্টির ভয়ে দুরু দুরু কাঁপিতেছে। মানুষের রূপ, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের মহিমারঞ্জিত বালীগঞ্জ বাংলাদেশের এক অপূর্ব্ব স্থান।

(১৩)

গ্রীষ্মাবকাশ আরম্ভ হইয়াছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা সংক্রান্ত কার্য্যও শেষ হইল। আজকাল বাড়ীতে বসিয়া কিছু কিছু পড়াশুনা করিতেছি—সন্ধ্যার সময় ছোট ডাক্তারবাবুর বাড়ীর বারান্দায় বসিয়া গল্পগুজব

করি। আমাদের এই পুরাতন সভায় পূর্ব্ব বৎসরের প্রায় সব সভ্যবৃন্দই আছেন, কেবল হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার চারুবাবুর বহুদিন হইতে অদর্শন। একজন নূতন সভ্য কিছুদিন হইতে আসিতেছেন, তাঁহার আগমনে সান্ধ্যসভা বেশ সরগরম হইয়া উঠিয়াছে। ইঁহার নাম শ্রীযুক্ত মুণীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, বয়ঃক্রম প্রায় ৭২।৭৩ বৎসর, এতদঞ্চলে বালক-যুবা-নির্ব্বিশেষে সকলেরই তিনি 'দাদু'। বাংলাদেশের বিখ্যাত সর্ব্বাধিকারী বংশে ইঁহার জন্ম; পিতা ৺সূর্য্য কুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় সে সময়ে কলিকাতার একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক ছিলেন। এই বংশে অনেক কুলতিলক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—এ্যাটর্নি স্যার দেবপ্রসাদ, চিকিৎসক Lt. Col. সুরেশ প্রসাদ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। মুণীন্দ্রবাবুর বয়স হইয়াছে কিন্তু শরীর অথবা মন, কোন কিছুরই উপর কালের শীতল স্পর্শ এখনও পড়ে নাই। একমাত্র গলিতদন্ত মুখখানি বার্দ্ধক্যের পরিচয় দেয়, নতুবা বিশালবক্ষ এবং দৃঢ় ও পেশল অঙ্গপ্রত্যঙ্গে একটা যৌবনোচিত শক্তি এখনও বিদ্যমান। তিনি স্নেহ ও কৌতুক করিয়া অনেককেই—বিশেষতঃ আমাকে—"অনড্বান্" বলিয়া সম্বোধন করেন কিন্তু তাঁহার মেঘমন্দ্র স্বর শুনিলে কালিদাস বর্ণিত ত্রয়োদশসর্গ রঘুবংশে "দৃপ্তঃ ককুদ্মান্ ইব চিত্রকূটঃ"—আমার বারংবার মনে পড়ে। এই কণ্ঠ-স্বরের ত্রিসীমানায় বার্দ্ধক্য এখনও পৌঁছিতে পারে নাই। বাড়ীতে নাতিনাতিনীদিগকে ডাকিবার সময় অথবা ডাক্তারবাবুর বারান্দায় বসিয়া মধুর কণ্ঠে গান গাহিবার সময় গলার এই স্বাভাবিক শক্তি অনুভব করা যায়। কখনও কখনও আমাকে বারান্দায় না দেখিতে পাইয়া বাহিরের ঘরের সম্মুখস্থ রাজপথে দাঁড়াইয়া "প্রফেসর" বলিয়া যখন হাঁক দেন তখন হয়ত কোন পুস্তকে মনোনিবিষ্ট প্রফেসারের আকস্মিক হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। ইঁহার দুইটি পুত্রই কৃতী—জ্যেষ্ঠ শ্রীযুক্ত মৃণাল-

চন্দ্র সর্ব্বাধিকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, অপরটি শ্রীযুক্ত মৃগেন্দ্র চন্দ্র আইনব্যবসায়ী, সম্প্রতি চুঁচুড়ায় ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিতেছেন। বৃদ্ধ সর্ব্বাধিকারী শিশুর মত কৌতুকপ্রিয়, মন শিশুর মত সহজেই আনন্দ গ্রহণ করিতে পারে। হাস্যকর ঘটনা অথবা কৌতুককর গল্পের অবতারণায় মুণীন্দ্রবাবুর অসাধারণ নৈপুণ্য—যেন অভিনয় হইতেছে, প্রত্যেকটি চিত্র মনে গাঁথিয়া যাইতেছে। গভীর রাত্রিতে টর্চ্চের আলো লইয়া নীচের বারান্দায় বসিয়া আছেন—আমরা বর্ণনার প্রারম্ভেই মনে করিলাম হয়ত বাড়ীতে চোর ঢুকিয়াছে, তাহারই গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছেন কিন্তু পরক্ষণেই বুঝা গেল ব্যাপারটি তত সহজ নয়, হতভাগ্য পাচকের কোন কার্য্য-বিশেষের অনুসন্ধানে "প্রসাদ কবি" গোয়েন্দা সাজিয়াছেন, পরক্ষণেই হয়ত যৌবনের ব্যায়ামপুষ্ট তাঁহার পেশল হস্তমুষ্টি পাচকের গ্রীবাদেশ টিপিয়া ধরিল। দীর্ঘায়ু কয়েকটি লোক দেখিয়া আমার ধারণা হইয়াছে যে, মন শিশুর মত হাল্কা ও আনন্দপ্রিয় না হইলে ইহজগতে দীর্ঘজীবন লাভ করা যায় না। অসীম কর্ম্মদক্ষতা ইঁহার জীবনে একটি পরিলক্ষণীয় বস্তু। সূর্য্যোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি পর্য্যন্ত ইঁহাকে কাজ করিতে দেখিয়াছি। কত রকমের মানুষ, কত বিচিত্র উদ্দেশ্য লইয়া মুণীন্দ্রবাবুর সহিত দেখা করিতে আসেন তাহার একটা হিসাব রাখিলে ছোট গল্প বা নভেল লেখার উপাদানের অভাব হয় না। সভা-সমিতিতে প্রায়ই ইঁহার নিমন্ত্রণ থাকে, তাহার মধ্যে খেলার পুরস্কার বিতরণ, শ্রাদ্ধবাসর, শোকসভা, জনহিতকর প্রতিষ্ঠান সবই আছে। অতি তুচ্ছ বিষয় অবলম্বন করিয়া শিক্ষাপ্রদ অথচ কৌতুককর বক্তৃতা দিবার শক্তি ইঁহার অসাধারণ। ইঁনি সাহিত্য জগতে 'প্রসাদ কবি' নামে পরিচিত। দীর্ঘজীবনে অনেক নাটক, নভেল, ছোট গল্প ও জীবনী লিখিয়াছেন, সমস্ত বই পড়ি নাই কিন্তু যে কয়খানি পড়িয়াছি

তাহাদের ভিতর দিয়া যে লোহিতবর্ণ সূত্রের মত একটা বিশুদ্ধ চিন্তা ও ভগবদ্‌বিশ্বাসের ধারা অবলীলাক্রমে বহিয়া যাইতেছে তাহা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ইংরাজকবি Goldsmith বলিয়াছেন:— "Innocently to amuse the imagination in this dream of life is Wisdom"। ইংরাজ সমালোচক Abercrombie এই কথার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন "And yet of our greatest we ask something more than this............We look to our greatest artists to give us an uplifting and inspiring vision of Life."

'প্রসাদ কবির' সাহিত্যসৃষ্টি লক্ষ্য করিলে এই আদর্শের কথাই মনে পড়ে—তিনি জীবনের সৌন্দর্য্য দেখাইয়াছেন, মানুষকে উচ্চ হইতে উচ্চতর জীবনের সন্ধান দিয়াছেন, বাস্তবতার দোহাই দিয়া কুৎসিৎ জীবনের মনোরম চিত্র অঙ্কিত করিয়া পাঠককে তাহার অজ্ঞাতসারে পশুজীবনের প্রতি আকৃষ্ট করেন নাই। এই বৃদ্ধ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় পুরাতন বাংলাদেশের এক জীবন্ত ইতিহাস। তাঁহার বংশ পরিচয়ে পুরাতন বাংলার গৌরব-চিহ্নিত বংশগুলির মর্ম্মকথা নিহিত আছে, অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে সংবাদপত্রের অভ্যুদয় ইঁহার যৌবন স্মৃতির সহিত বিজড়িত। বাংলা দেশের সংবাদ-পত্রে স্বাধীন চিন্তার অভিব্যক্তিতে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড কার্জ্জনের মুখের ভ্রুকুটীভঙ্গী মুনীন্দ্রবাবুর বর্ণনায় যেন সজীব হইয়া আমাদের চক্ষের সম্মুখে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। মুনীন্দ্রবাবুর অপেক্ষাও প্রাচীন অনেকে হয়ত বাংলাদেশে এখনও জীবিত আছেন কিন্তু ইঁহার মত সাহিত্য, সমাজ ও রাজনীতির বিক্ষুব্ধ আবর্ত্তে পড়িয়া নানা অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিবার অধিকার বর্ত্তমানে আর কেহই লাভ করেন নাই। তাই সময় সময় আমরা তাঁহার পুরাতন স্মৃতি-কথা মুগ্ধ হইয়া শ্রবণ করি।

মানুষের ছোটখাট কাজের মধ্যেই অনেক সময় তাহার চরিত্রের প্রকৃত সন্ধান পাওয়া যায়। বড় কাজে লোকখ্যাতি, গৌরব, শক্তি-পরিচালনার একটা উন্মাদনা আছে, তাই বড় কাজ দিয়া বিচার করিলে হয়ত ভ্রম হইতে পারে কিন্তু ছোট কাজ মানুষের প্রকৃত চরিত্র নীরবে উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়। নাতি-নাতনীগুলিকে সঙ্গে লইয়া নিয়মিত ভাবে বেড়ান মুনীন্দ্রবাবুর কর্ত্তব্যের মধ্যে অন্যতম, অসুস্থ পরিজনের মলমূত্রাদি নিজহস্তে পরিষ্কার করিতে তাঁহার কোন ঘৃণা অথবা সঙ্কোচ নাই। অথচ বাড়ীতে দাসদাসী আছে, স্ত্রী এবং পুত্রবধূগণ আছেন কিন্তু এই স্বেচ্ছব্রত সেবাতেই তাঁহার আনন্দ। প্রতিবাসীগণের উপকার করিতে ইনি সর্ব্বদাই উৎসুক, সময়ের অভাব অথবা অসুস্থতার অজুহাত সচরাচর তাঁহার নিকট শুনিতে পাওয়া যায় না। আবার এই বৃদ্ধ কখনও কখনও অপ্রত্যাশিতভাবে দুর্ব্বাসার রূপ গ্রহণ করেন, তখন দৃপ্তচক্ষু, বজ্রনির্ঘোষী কণ্ঠ ও বাক্যস্রোতের সমন্বয়ে যে চিত্র চক্ষের সম্মুখে প্রতিভাত হয় তাহা যুগপৎ ভীতি ও কৌতুকপ্রদ। কিন্তু শীতল হইতেও দেরী লাগে না। ভাষা এবং মনের উপর একটা সহজ সংযম অনেক-সময় ইঁহার মধ্যে লক্ষ্য করিয়াছি। ইঁহার স্নেহ-প্রবণ চরিত্রের একটা দুর্ব্বলতা বিশেষ করিয়া আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে—পরিবারবর্গের বিশেষতঃ নাতিনাতিনীদিগের মধ্যে কাহারও অসুখ করিলে, এই সদানন্দ বৃদ্ধের মুখ মলিন হইয়া যায়, শরীর ও মনের শিথিলতা দেখিলে মনে হয় যেন এক দিনেই পরমায়ুর দশবর্ষ অতিক্রম করিয়াছেন, স্বাভাবিক সদম্ভ পদবিক্ষেপ অতি মৃদুমন্দগতিতে পরিণত হয়, সহজজাত কৌতুক সেদিন আর মুখ হইতে বাহির হয় না, সকলকে ধমকাইয়া, অপরের মুখ বন্ধ করিয়া সাধারণতঃ তাঁহার যে বাক্যস্রোত আমাদের সান্ধ্যসভায় প্রবাহিত হয় তাহার গতি দুশ্চিন্তার বালুধারায় অবরুদ্ধ হইয়া যায়, বড়

বালিসটি মাথায় দিয়া সতরঞ্চীতে দেহ এলাইয়া নিঃশব্দে একটি মোটা চুরুট মুখে দিয়া জড়ের মত পড়িয়া থাকেন। এই চুরুটও প্রতিক্ষণের দুশ্চিন্তার চাপে মুহুর্মুহুঃ নিভিয়া যায়, অন্যমনস্ক হস্তে ৩।৪টি দেশলাই-এর কাঠি নষ্ট করিয়া আবার সেটিকে ধরাইয়া লইতে হয়। আমি বুঝিতে পারি, আজ বাড়ীতে হয় রঞ্জীর মাথা ধরিয়াছে অথবা বুলুর পেটের অসুখ করিয়াছে। ভগবানে সরল বিশ্বাস ইঁহার কথাবার্ত্তায় ধরা পড়ে। কাতর প্রার্থনায় ইনি আস্থাবান। ইঁহার ধারণা—They never sought in vain, that sought the Lord aright। শাস্ত্রের দোহাই নাই, তপ, জপ, আরাধনা নাই, আছে শুধু অশ্রুজলের নিবেদন। আবার গঙ্গাস্নানে ইঁহার নিত্যপ্রীতি, গঙ্গাতীরে যাইয়া "সীতারাম" নামধ্বনিতে কৃত্রিম কোপ দেখাইয়া বাঙ্গালী, উড়িয়া, স্ত্রী-পুরুষ, হিন্দু-মুসলমান নানা-সংমিশ্রণের পথচারী ও গঙ্গাস্নায়ী লোকের মুখে বিচিত্রস্বরে ঘোষিত 'সীতারাম' নাম শ্রবণ করিতে ইঁহার অসীম উৎসাহ। এমন কি পথ দিয়া যাইতে যাইতে আমেরিকান সৈন্যগণও 'সিটার‍্যাম' 'সিটার‍্যাম' শব্দ করিয়া আমাদের বৃদ্ধকে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করে, তিনি তখন লগুড়হস্তে ক্ষিপ্রগতিতে চতুর্দ্দিকে জনতাকে তাড়া করিয়া বেড়ান। এই 'সীতারামের' কোলাহল গঙ্গাতীরে এক নিত্যপরিচিত অপূর্ব্ব দৃশ্য। সংসারে দুর্গম পথে নিরন্তর সংগ্রামশীল মানুষের ক্ষতবিক্ষত দেহের ভিতর সযত্নে সুরক্ষিত এই বিশুদ্ধ ভগবৎ-প্রীতি আমাকে বড়ই আনন্দ প্রদান করে। বাংলাদেশের এক প্রসিদ্ধ পরিবারের বংশধর, নানাসদ্‌গুণবিভূষিত সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের মত বিচিত্রচরিত্র লোক আধুনিক বাংলাদেশ হইতে তিরোহিত হইতেছে, কিছুদিন পরে হয়ত আমাদের রত্নপ্রসূ মাতৃভূমি ঠিক এমনটি আর দেখাইতে পারিবে না।

(১৪)

২৫শে মে বেলা প্রায় ১॥০ঘটিকার সময় পূর্ব্বের বন্দোবস্তমত আমি যাইয়া পূর্ণিমা ও তাহার খুকীকে আমাদের বাড়ীতে লইয়া আসিলাম। পূর্ণিমা এখনও দুর্ব্বল। তাহার সকালে বিকালে দুধসাবু, বেলা ১০॥০টার সময় মাছের ঝোল ও ভাত, সন্ধ্যা ৭॥০টার সময় লুচি ও মাছের তরকারী ইত্যাদি, ব্যবস্থা আমাকেই করিতে হইয়াছে। কোন গুরুপাক দ্রব্য যাহাতে পূর্ণিমা না খায় সে বিষয়ে আরতিকে উপদেশ দিয়াছি এবং নিজেও লক্ষ্য রাখিয়াছি। ছেলেমেয়ে হওয়ার পর আমার মেয়েরা যখন নূতন আমার বাড়ীতে আসে তখন তাহাদের দুর্ব্বল অবস্থায় যে সমস্ত বন্দোবস্ত করা উচিত তাহা সমস্তই আমাকে করিতে হয়। গৃহস্থালীর এই সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া নিজের "গৃহিণীপণায়" নিজেই বিস্মিত হই ও মনে মনে হাসি।

(১৫)

কিছুদিন হইতে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ দত্ত মহাশয়ের সহিত পরিচয় হইয়াছে এবং তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। নগেন্দ্রবাবু রাওলপিণ্ডিতে বহুদিন চিকিৎসা ব্যবসায় উপলক্ষে বাস করিয়াছিলেন। গত যুদ্ধের সময় তিনি ক্যাপ্টেন হইয়াছিলেন। সার্কুলার রোডে ডেপুটী পুলিশ কমিশনারের আফিসের ঠিক বাম পার্শ্বে তুলসী-মঞ্চ-চিহ্নিত তাঁহার ত্রিতল বাটী। বিপত্নীক এই ভদ্রলোক চিকিৎসা ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া এখন সর্ব্বতোভাবে ধর্ম্মজীবন যাপন করিতেছেন। নগেন্দ্রবাবু বৈষ্ণব—বৈষ্ণব শাস্ত্রগ্রন্থেও তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি। তাঁহার লিখিত "মনস্তত্ত্ব ও মনোজয়" নামক ধর্ম্মগ্রন্থখানি তিনি আমাকে উপহার দিয়াছিলেন এবং তাহা

পাঠ করিয়া বিশেষ উপকৃত বোধ করিয়াছিলাম। বইখানির মধ্যে নীরস বাক্যচ্ছটা নাই, প্রাণের অনুভূতির পরিচয় বহুস্থানে বিকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। নানাসময়ে তাঁহার ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কথাবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া মনে হইয়াছে যে জীবনে তিনি ধর্ম্ম উপলব্ধি করিয়াছেন, শুষ্ক শাস্ত্রের আলোচনাতেই তাঁহার ধর্ম্মজীবনের সম্যক পরিচয় নহে। নগেন্দ্রবাবু প্রিয়দর্শন, গৌরবর্ণ, অপেক্ষাকৃত খর্ব্বাকৃতি। অনেক সময় বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি যে তাঁহার প্রফুল্লমুখে ধর্ম্মজীবনের কোমলতা, ঔজ্জ্বল্য ও অন্তর্মুখীনতা সর্ব্বদাই বিরাজ করিতেছে। তিনি আমাকে বিগ্রহের সম্মুখে প্রণাম করিবার শাস্ত্রবিহিত বিধি শিক্ষা দিয়াছেন, ধর্ম্মজীবনে সাধুসঙ্গের প্রভাব বিশদভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন, বহুশাস্ত্রঅলঙ্কৃত তাঁহার বিশাল মন আমার সঙ্কুচিত দৃষ্টির সম্মুখে প্রসারিত করিয়া আমাকে বিস্মিত করিয়াছেন। চালদাবাগান বৈষ্ণব সম্মিলনীতে প্রত্যহ সন্ধ্যায় কীর্ত্তন ও হরিকথা হইয়া থাকে। নগেন্দ্রবাবুর উপদেশমত সেইখানে যাইয়া আমি ক্ষণিকের জন্যও সংসারের দুঃখতাপ ভুলিয়া বৈষ্ণবগণ সন্নিধানে আনন্দলাভ করিয়া কতদিন রাত্রি ১০ঘটিকার পর বাড়ীতে ফিরিয়া আসিতে আসিতে ভাবিয়াছি যে, হরিসংলাপচিহ্নিত সেই দিন আমার আত্মবিস্মৃত জীবনে সার্থক হইয়াছে। নগেন্দ্রবাবু প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা বৈষ্ণব সম্মিলনীতে যাইয়া বিগ্রহের সম্মুখে বসিয়া নিবিষ্টমনে মালাজপ করিয়া থাকেন। আমি দূর হইতে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া কতদিন চিন্তা করিয়াছি যে, কি আনন্দ এই বৈষ্ণব নামজপে পাইতেছেন যে গভর্ণমেণ্টের খেতাব, সমস্ত জীবনে অভ্যস্ত ডাক্তারী-পেশা, সুরম্য ত্রিতল বাসগৃহ সমস্ত বিস্মৃত হইয়া সাধারণ মানুষের মত কাঠের একটি জীর্ণ বেঞ্চিতে বসিয়া এমন তন্ময় হইয়া বিগ্রহের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন। আমিও তো কিছুদিন হইতে মধ্যে মধ্যে

এই বৈষ্ণব সম্মিলনীতে যাইতেছি কিন্তু বেশ বুঝিতে পারি মনের সে সরসতা আমার নাই, নাম-শ্রবণে আনন্দের উদ্রেক হয় না। ভগবান যাঁহাকে দয়া করিয়া আত্মসাৎ না করেন সে মানুষ নিজে চেষ্টা করিয়া কখনও তাঁহার অসীম আনন্দের অধিকারী হইতে পারে না। আমি সেই দয়ার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছি।

(১৬)

শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুহ সিটী কলেজে আমার সহযোগী ছিলেন, বর্ত্তমানে তিনি বরিশাল ব্রজমোহন কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক। এবার গ্রীষ্মাবকাশের সময় বিপিনবাবু আসিয়া দেখা করিলেন এবং বলিলেন যে হার্ণিয়া হইয়া তিনি কষ্ট পাইতেছেন, কলিকাতার ডাক্তারেরা অস্ত্রোপচারের পরামর্শ দিয়াছেন এবং সার্কুলার রোডের Calcutta Medical School-এ ভর্ত্তি হইয়া সেইখানে অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা করা হইবে। জুন মাসের প্রথমদিকে বিপিনবাবুর অস্ত্রোপচার হইল এবং আমি মধ্যে মধ্যে যাইয়া দেখিয়া আসিতে লাগিলাম। বিপিনবাবু ভগবৎ-বিশ্বাসী লোক, তিনি অসীম ধৈর্য্যসহকারে অস্ত্রচিকিৎসার সমস্ত যন্ত্রণা সহ্য করিলেন। আমি বিকালবেলা হাসপাতালে যাইলে বিপিনবাবু আমার সহিত প্রফুল্ল মনে গল্প করিতেন। ২৬শে জুনের কথা আমার মনে আছে। আমি হাসপাতালে যাইয়া দূর হইতে দেখিলাম বিপিনবাবুর স্ত্রী রোগশয্যার পার্শ্বে একটি ছোট টুলের উপর বসিয়া আছেন এবং শয্যাশায়ী রোগী প্রফুল্লচিত্তে তাঁহার সহিত মৃদুস্বরে কি কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। আমার মনে হইল উভয়ের মধ্যে সংসার সম্বন্ধেই কোন কথাবার্ত্তা হইতেছে। স্বামীস্ত্রীর এই বিশ্বস্ত আলাপে বাধাসৃষ্টি করিবার আমার ইচ্ছা ছিল না তথাপি অতদূর যাইয়া দেখা না করিয়া ফিরিয়া

আসিতে ইচ্ছা হইল না। বিপিনবাবু স্ত্রীর সহিত আমার পরিচয় করিয়া দিলেন,—দেখিলাম শ্যামবর্ণ, ক্ষীণদেহ কিন্তু মুখখানি সুন্দর এবং প্রফুল্ল। আমি সেদিন অল্পক্ষণ বসিয়াছিলাম এবং বিপিনবাবুর সহিত কথাবার্ত্তার অন্তরালে তাঁহার স্ত্রীকে লক্ষ্য করিতেছিলাম। হাসপাতালে কক্ষগুলির বায়ু মলিন ও রোগক্লিষ্ট রোগীদের উষ্ণ শ্বাসপ্রশ্বাসে যেন ভারাক্রান্ত। তাহারই ভিতর স্বামীর রোগে উদ্বিগ্না, সাধারণ বাঙ্গালী গৃহস্থবাড়ীর লজ্জাশীলা এই গৃহলক্ষ্মী তাঁহার ক্ষীণ বাহু দুইটি রোগীর শয্যার উপর রাখিয়া বসিয়া আছেন, কোমল চক্ষু দুইটি হইতে যেন স্নেহ ও প্রীতি স্বামীর উপর বর্ষিত হইতেছে,—আমার মনে হইল এই দুই কোমল হস্ত যেন দুর্ভেদ্য প্রাকার গঠিত করিয়া স্বামীকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে, সেখানে স্বয়ং মহাকালেরও প্রবেশের শক্তি অথবা অধিকার নাই। আমি বসিয়া বসিয়া ভাবিলাম ও দেখিলাম রোগশয্যার পার্শ্বে স্ত্রীর উপস্থিতি হইতে বঞ্চিত সংসারী রোগী যথার্থই ভাগ্যহীন। বিপিনবাবু কয়েক সপ্তাহ হাসপাতালে থাকিয়া সুস্থ হইয়া বরিশালে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

(১৭)

পূর্ণিমার শরীর ক্রমশঃ ভাল হইতেছে। তাহার এখানে আসার পর হইতে দেড় মাসের উপর সময় কাটিয়া গিয়াছে এবং ইতিমধ্যে খুকীও একটু বড় হইয়াছে। খুকীর নাম উমা। উমা আজকাল আমাদের মুখের দিকে তাকাইতে শিখিয়াছে, হাসি তাহার মুখে প্রায়ই লাগিয়া আছে। আরতি খুকীকে লইয়া খুব খুসি। ১৮ই জুলাই সকাল বেলায় আমি বাহিরের ঘরে বসিয়া কাজ করিতেছি আরতির গলার শব্দ শুনিয়া সিঁড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। উমাকে একটি কাঁথার মধ্যে শোয়াইয়া পুঁটলীর মত করিয়া আরতি সিঁড়ি দিয়া নামিতেছে এবং চীৎকার

করিয়া পূর্ণিমাকে বলিতেছে 'শীগগীর চেয়ার পাত, তত্ত্ব যাচ্ছে (দুইটি চেয়ার যোগ করিয়া কাঁথা পাতিয়া উমা শয়ন করে)। কত বড় ক্ষীরের সন্দেশ দেখো।' আমি ভাবিলাম উমা হয়ত পুঁটলীর চাপে হাঁপাইয়া উঠিতেছে। কিন্তু নীচে নামিয়া আরতি যখন পুঁটলীটা খুলিল তখন দেখি উমার মুখ হাসিতে ভরিয়া গিয়াছে।

আরতি ও পূর্ণিমার ভাব ও ঝগড়া শরতের রৌদ্র ও মেঘের মত অনবরতই চলিতেছে। বহুবর্ষ পূর্ব্বে আমার স্ত্রীকে একখানি বাংলা "ওমর খৈয়াম" উপহার দিয়াছিলাম, সেইখানি এতদিন আমাদের বাড়ীতেই ছিল। কিছুদিন পূর্ব্বে পূর্ণিমা সেই বইখানি পড়িবার জন্য আরতির নিকট হইতে চাহিয়া লইয়াছিল। পড়া শেষ হইল কিন্তু পূর্ণিমা বইখানি আর ফেরৎ দিল না। আরতি মধ্যে মধ্যে সে কথা উল্লেখ করিয়া পূর্ণিমার সহিত ঝগড়া করে, পূর্ণিমা নির্ব্বিকার, সহজ কথায় উত্তর দেয়—"সব বইই তুই নিবি, আমরা কিছু পাব না?" আরতি তখনকার মত নিরুত্তর, কিন্তু কয়েকদিন পরে আবার সেই দাবীর প্রশ্ন উঠে। একদিন বিকালে আরতি উঠানে পায়চারী করিতেছে, আমি বাহিরের ঘরে চেয়ারে বসিয়া আছি, পূর্ণিমা উঠানের একপার্শ্বে খুকীকে লইয়া বসিয়া আছে। আরতি মনের আনন্দে ঘন ঘন পদচালনা করিয়া উঠানের চতুর্দ্দিকে প্রহরীর মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। পূর্ণিমা কিয়ৎক্ষণ তাহার দিকে বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, তাহার পর হঠাৎ বলিয়া উঠিল "এসব বাচালের লক্ষণ,—মেয়েমানুষের আবার পায়চারী।" আরতির গ্রাহ্য নাই, যাহা করিতেছিল তাহাই চলিতে লাগিল। আমি ভাবিলাম যে, ছোট বোনের ভবিষ্যৎ কল্যাণ কামনা অপেক্ষা পূর্ণিমা হয়ত আশঙ্কা করিতেছিল যে, ঘুরিতে ঘুরিতে কোন সময় আরতি উমাকে মাড়াইয়া দিবে, সুতরাং ছোট বোনকে বাচাল স্বভাবের দোষ দেখাইয়া

নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিল। আবার সেইদিন রাত্রিতে শুইতে যাইবার সময় পূর্ণিমা উপর হইতে আরতিকে বলিতেছে শুনিলাম— "টুটুন রাণি আন পানি।" এইরূপ মেঘ ও রৌদ্র প্রায়ই লক্ষ্য করিতেছি।

পূর্ণিমার তীব্র মন্তব্য হইতে তাহার বাবাও সময় সময় রক্ষা পায় না। কোন কোন দিন অবসর থাকিলে আমি বাহিরের ঘরে মেজেয় শুইয়া বিশ্রাম করি, মেয়েরা কাছে বসিয়া গল্প করে। ২১শে জুলাই শনিবার, বেলা ১টার সময় আমার ক্লাস আরম্ভ হইবার কথা, সেইজন্য সকালবেলা প্রায় ১১টার সময় কাজকর্ম্ম সারিয়া মেজেয় একটু শুইয়া পড়িবার উপক্রম করিলাম। আরতি হাতের কাছে কোন বস্ত্রখণ্ড না পাইয়া পূর্ণিমাকে আঁচল দিয়া মেজেটি ভাল করিয়া পুঁছিয়া দিতে বলিল। এই কাজ সাধারণতঃ আরতি নিজেই করে কিন্তু তখন তাহার ক্রোড়ে উমা নিদ্রিত। পূর্ণিমা তাহার শুভ্র বস্ত্র ময়লা করিতে আপত্তি জানাইল এবং অন্য কোন বস্ত্রখণ্ডের সন্ধানে যাইবার উপক্রম করিল। এদিকে দেরী হইতেছে দেখিয়া আরতি বলিল, "বাবার শোবার জায়গা, তাও নিজের কাপড় দিয়ে পুঁছে দিতে পারিস্ না?" কিন্তু বাবার প্রতি সম্মান দেখাইবার জন্য আরতি এই কথাগুলি বলিবামাত্র পূর্ণিমা তীব্রকণ্ঠে উত্তর দিল, "বাবার শোবার জায়গা তো কি? কাপড়টা নষ্ট কর্ব্ব?" বাবার সব সম্মান মুহূর্ত্তে ধূলিসাৎ হইয়া গেল।

(১৮)

আজকাল মধ্যে মধ্যে সন্ধ্যার পর চালদাবাগান বৈষ্ণব সম্মিলনীতে যাইতেছি। শ্রীযুক্ত দ্বিজপদ গোস্বামী মহাশয় কিছুদিন হইতে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের 'রায়রামানন্দ সংবাদ' পাঠ করিতেছেন। গোস্বামী মহাশয়ের

মধুর কণ্ঠ, ভাব-বিশ্লেষণ শক্তি ও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিবার প্রণালী একত্র হইয়া সমস্ত বিষয়বস্তুটিকে মধুর হইতে মধুরতর করিয়া তুলিতেছে। আমরা অধ্যাপকের কার্য্য করি, কঠিন বিষয়বস্তু সহজ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়াই আমাদের কার্য্য। কিন্তু এই গোস্বামী মহাশয়ের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিলে অধ্যাপনার সমস্ত গর্ব্ব চূর্ণ হইয়া যায়, সময় সময় মনে হয় যে, এই অধ্যাপকের শক্তির নিকট আমার মত ইংরাজির অধ্যাপকের শক্তি কত তুচ্ছ। কি হৃদয়গ্রাহীরূপে জটিল বস্তুসমূহ সরল করিয়া গোস্বামী মহাশয় শ্রোতৃবৃন্দের নিকট উপস্থিত করেন! ২রা আগষ্ট তারিখে সন্ধ্যার পর চালদাবাগানে উপস্থিত হইলাম। সেইদিন শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় শ্রীজীবের 'ভক্তি-সন্দর্ভ' পাঠ করিতেছিলেন। এই গোস্বামী মহাশয়ও বৈষ্ণবধর্ম্মগ্রন্থে সুপণ্ডিত এবং শ্রীবৃন্দাবন ধামে বহুদিন বাস করিয়া ধর্ম্মসাধনা করিয়াছিলেন। ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে গোস্বামী মহাশয় শ্রীমদ্‌ভাগবতে বসুদেবের উক্তি "সাধবো দীনবৎসলাঃ" উদ্ধৃত করিলেন। সাধুসঙ্গ না হইলে ভগবৎকৃপা হয় না ইহাই সেদিনকার পাঠ্য বিষয় ছিল। গোস্বামী মহাশয় বলিলেন যে, মনুষ্যদেহে গোবিন্দভজন না করাই দীনাবস্থা। সাংসারিক দুরবস্থা সাধুদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না, একমাত্র আধ্যাত্মিক দুরবস্থাই তাঁহারা দীনাবস্থা বলিয়া মনে করেন এবং দয়াপরবশ হইয়া, দীনবৎসল সাধুরা সেই শোচনীয় আত্মবিস্মৃত পাশবিক অবস্থা হইতে মানুষকে উদ্ধার করিয়া থাকেন। তবে ক্বচিৎ কখন সাংসারিক দুরবস্থাও সাধুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। সাধু নিজে হয়ত বহুপূর্ব্বে সংসার প্রতিপালন করিয়াছিলেন অথবা সংসারের ভিতরে থাকিয়া দুঃখতাপে দগ্ধ হইয়াছিলেন। আজ কোন সংসারীকে মহা-মোহময় কটাহে দগ্ধ হইতে দেখিয়া হঠাৎ বহুদিন-বিস্মৃত স্বপ্নের মত

সংসারের দুঃখকষ্ট সাধুর মনে পড়িল, হয়ত দয়া করিয়া ইচ্ছাপ্রভাবে সংসারীর সংসার দুঃখ মোচন করিয়া দিলেন। ইহাও কখনও কখনও দেখা যায়, কিন্তু ইহা সাধুদিগের সাধারণ কার্য্য নহে; সাধারণতঃ সাধুরা আধ্যাত্মিক দুরবস্থা দেখিয়া বিচলিত হন এবং কৃপা করিয়া দীনবৎসলরূপে সেই দীনাবস্থা মোচন করিয়া অনন্ত আনন্দের সন্ধান দিয়া থাকেন। গোস্বামী মহাশয় অতি বিশদভাবে এই কথাগুলি শ্রোতৃবৃন্দকে বুঝাইয়া দিলেন, আমি মুগ্ধ-বিস্মিত হৃদয়ে তাঁহার প্রত্যেকটি কথা হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করিলাম, মনে হইল তাঁহার সমস্ত কথাগুলি কোন গভীর অনুভূতির অন্তঃস্থল হইতে বাহির হইয়া আমাদিগের হৃদয়ে অসীম শক্তি সহকারে প্রবেশ করিতেছে। রাত্রি দশ ঘটিকার পর বাড়িতে ফিরিবার সময় "সাধবো দীনবৎসলাঃ" কথাগুলি পুনঃ পুনঃ কাণে বাজিতে লাগিল।

(১৯)

৩রা আগষ্ট তারিখে বলাইদা একমাসের ছুটি লইয়া বর্ম্মার নিকটস্থ একটি দ্বীপ হইতে কলিকাতায় আমাদের বাড়ীতে আসিল। তাহার নিকট যুদ্ধের অনেক অদ্ভুত বিবরণ শুনিলাম। জাপানী Shell-এর ভিতরকার এক টুকরা ধারাল লৌহখণ্ড বলাইদা সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে, সেটি আমাদিগকে দেখাইল। আরতি ও পূর্ণিমা বলাইদার জন্য চিংড়ি মাছের কাটলেট, লাউপাতা ও চিংড়ি সিদ্ধ, ইলিশমাছ ভাতে, প্রভৃতি তাহার মুখরোচক নানাবিধ তরকারী যত্নসহকারে রাঁধিয়া দিত। বলাইদা ডাব খাইতে অত্যন্ত ভালবাসে, ডাবের জলে চিনি মিশাইয়া রোজ ৩।৪টি ডাব খায়। এখন ডাবের দর প্রত্যেকটি পাঁচ আনা। বলাইদা ক্যাপ্টেন সাহেব সুতরাং তাহার জন্য আরতি ও পূর্ণিমা দামের দিকে

লক্ষ্য না করিয়া তাহার প্রিয় সমস্ত জিনিষই সময়মত আনাইয়া দিয়াছে। একমাস আমাদের বাড়িতে থাকার পর ২রা সেপ্টেম্বর রাত্রি ১০টার Military Special ট্রেণে বলাইদা চট্টগ্রাম যাত্রা করিয়াছে। ইতিমধ্যে জাপানী যুদ্ধ থামিয়া গিয়াছে, সুতরাং চট্টগ্রাম হইতে এখন তাহাকে কোথায় যাইতে হইবে তাহার স্থিরতা নাই।

১৫ই আগষ্ট তারিখে জাপানী যুদ্ধ শেষ হইল। সকলেই মনে করিয়াছিল, এমন কি ইংলণ্ড ও আমেরিকার রাজনৈতিক পণ্ডিতগণও বলিয়াছিলেন যে, জাপানী যুদ্ধ এখনও কিছুদিন চলিবে কারণ জাপানীরা বীরের জাতি তাহারা সহজে পরাজয় স্বীকার করিবে না। কিন্তু Atom Bomb (আণবিক বোমা) আবিষ্কারের ফলে যুদ্ধের গতি হঠাৎ পরিবর্ত্তিত হইল। আমেরিকা এই বোমা আবিষ্কার করিয়া জাপানের উপর প্রয়োগ করিল। এই বোমা অত্যন্ত মারাত্মক ও ধ্বংসকারী। জাপানের যে দুইটি সহরের উপর ইহাদের ব্যবহার হইয়াছে, সে দুই সহরের লক্ষ লক্ষ শিশু, নারী, যুবক ও বৃদ্ধ এমন কি পশুপক্ষী পর্য্যন্ত হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। এইরূপ নির্ম্মম লোকহত্যা আন্তর্জাতিক নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া কোন কোন ইংরাজ মনীষীও মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু সহজে যুদ্ধ জিতিবার লোভ আমেরিকা ও ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিতে পারে নাই, সুতরাং সমস্ত ধর্ম্ম ও নীতি বিসর্জ্জন দিয়া তাহারা মৃত্যুর এই তাণ্ডবলীলা জাপানে অভিনীত করিয়াছে। জাপান এখন আমেরিকার পদতলে নিষ্পেষিত। টোকিও ও জাপানের অন্যান্য স্থানে যুদ্ধবিরতির চুক্তিমত আমেরিকান সৈন্যগণ অবতরণ করিয়াছে এবং ধীরে ধীরে জাপানের সমস্ত শক্তি নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে। কিন্তু মনে হয় যে, এই আণবিক বোমা অথবা তদপেক্ষাও অন্য কোন মারাত্মক অস্ত্র আবিষ্কার করিতে জগতের অন্যান্য জাতি এবং

পরাজিত জার্ম্মানী ও জাপানও চেষ্টা করিবে। স্বাধীন বুদ্ধিমান জাতির অসাধ্য কিছুই নাই। সুতরাং যখন অন্যান্য জাতিরা মারাত্মক অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইবে তখন পুনরায় যুদ্ধ বাধিয়া উঠিবে এবং হয়ত প্রতি-হিংসাবশে যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়াই কোন জাতির উপর এই নূতন অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া সমস্ত দেশটাকেই পঙ্গু অথবা ধ্বংস করিয়া ফেলিবে। আমেরিকা ও ইংলণ্ড যুদ্ধ জিতিয়াছে সত্য কিন্তু ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া চিন্তা করিলে আমরা জগতের শান্তি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারি না।

ইউরোপের যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, কিন্তু আজ কয়েকদিন হইল ইটালীর ডিক্‌টেটার মুসোলিনীর জামাতা কাউণ্ট সিয়ানোর যুদ্ধকালীন ডাইরি সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত হইতেছে। কাউণ্ট সিয়ানো কিছুদিন পূর্ব্বে যুদ্ধের সময় বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া শোচনীয় ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার বিশ্ববিখ্যাত শ্বশুর মুসোলিনীও নিজ দেশবাসীর হস্তে পশুর মত নিহত হইয়াছেন। আজ সকলেই মুসোলিনীর দোষ দেখাইতেছে, তাঁহাকে প্রশংসা করিবার লোক আজ বিরল। অথচ একদিন এই দেশপ্রেমিক সমগ্র ইটালীতে কত সম্মান পাইয়াছিলেন তাহা চিরদিন ইতিহাস সাক্ষ্যপ্রদান করিবে। কিন্তু

An habitation giddy and unsure
Hath he that buildeth on the vulgar heart.

সুতরাং আজ এই কর্ম্মবীর মুসোলিনীর ইটালীর সর্ব্বত্র নিন্দিত ও অনাদৃত হওয়া বিচিত্র নহে।

Count Ciano ১৯৪২ সালের ২৮শে মার্চ্চের একটি ঘটনা তাঁহার ডাইরীতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার ডাইরীর একাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"২৮শে মার্চ্চ। মৃত বৈমানিকের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ স্বর্ণপদক বিতরণ করা হয়। ব্রুণোর বিধবা পত্নীকেও পদক দেওয়া হয়। (মুসোলিনীর পুত্র ব্রুণো ১৯৪১ সালে ৭ই আগষ্ট বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হন।) মুসোলিনীর মুখের ভাব সম্পূর্ণ অপরিবর্ত্তিত; তাঁহাকে প্রস্তর মূর্ত্তির ন্যায় দেখাইতেছিল। ব্রুণোর স্ত্রী যেন শত শত নিরাশ্রয়াদের মধ্যে একজন, এইভাবে মুসোলিনী তাহার অঙ্গে পদকটি পরাইয়া দেন। কাহারও কাহারও মনে সন্দেহ জাগে মুসোলিনী কি অতিমানুষ অথবা অমানুষ? তিনি উহার কোনটিই নন। মুসোলিনী কেবল জানেন যে, তাঁহার মধ্যে দুর্ব্বলতা দেখা দিলে অন্যান্যদের মধ্যেও উহা ছড়াইয়া পড়িবে।"

সিয়ানোর ডাইরী পড়িয়া মনে প্রশ্ন জাগে—অতিমানুষ আর কাহাকে বলে? যে লোক কঠোর কর্ত্তব্য-বুদ্ধির নিকট নিজ অন্তরের কোমলতাকেও বিসর্জ্জন দিতে পারে, মৃত পুত্রের স্মৃতি-বিজড়িত উদ্গত অশ্রুকেও রুদ্ধ করিতে সমর্থ, সে লোক জগতে যদি অতিমানুষ না হয় তাহা হইলে আর কাহাকে অতিমানুষ বলিব?

(২০)

২৩শে আগষ্ট এক গুরুতর বিপদ হইতে ভগবানের দয়ায় রক্ষা পাইলাম। বিকাল প্রায় ৫।।০ ঘটিকার সময় সার্পেণ্টাইন লেনের ছাত্র শ্রীমান তারাপদর মোটর গাড়িতে চড়িয়া পরীক্ষার কাগজপত্র লইয়া আমি বালীগঞ্জে I. A. পরীক্ষার Head Examiner শ্রীযুক্ত মোহিনী মোহন ভট্টাচার্য্যের বাড়ি যাইতেছিলাম। শিয়ালদহ ষ্টেশনের নিকট বৌ-বাজার ও সার্কুলার রোডের সংযোগস্থলে ট্রাফিক পুলিস হাত

দেখাইলে আমাদের গাড়িখানি থামিল। সম্মুখে একখানি বিরাটকায় আমেরিকান মিলিটারী লরি, আমাদের পশ্চাতেও ঠিক আর একখানি ঐরূপ লরী দাঁড়াইয়াছিল। শিয়ালদহের নিকট শ্রীমান তারাপদকে মোটরগাড়ি হইতে নামাইয়া দিলাম। ট্রাফিক পুলিসের নির্দ্দেশে গাড়িগুলি পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিয়া বৌ-বাজার ষ্ট্রীট অতিক্রম করিয়া সার্কুলার রোডের দিকে কয়েকগজ অগ্রসর হওয়ামাত্র পশ্চাৎগামী মিলিটারী লরী আমাদের মোটরখানিকে অত্যন্ত জোরে ধাক্কা মারিল। ধাক্কা খাইয়া আমাদের গাড়ীটি সম্মুখগামী মিলিটারী লরীতে ধাক্কা মারিল এবং পিছাইয়া আসিয়া পুনরায় পশ্চাৎগামী লরীর সহিত ধাকা খাইল। মুহূর্ত্তের মধ্যেই এই সমস্ত ব্যাপার সংঘটিত হইল। আমি যখন ঘটনা সম্বন্ধে সচেতন হইলাম তখন দেখি, আমাদের মোটর গাড়ির পুরু কাঁচগুলি চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং সেই কাচগুলির আঘাতে আমার শরীরের নানাস্থান হইতে রক্ত পড়িতেছে, বিশেষ করিয়া একখণ্ড কাঁচের আঘাতে আমার মস্তকের পশ্চাৎভাগ কাটিয়া যাওয়ায় প্রচুর পরিমাণে রক্তস্রাব হইতেছে। মুহূর্ত্তের মধ্যে আমাদের মোটরের চারিপাশে অসংখ্য লোক জমিয়া গেল, সকলেই সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিল। মিলিটারী লরীর আমেরিকান ড্রাইভারটি আসিয়া আমাকে হাসপাতালে লইয়া যাইতে চাহিল কিন্তু তাহার সাহায্য ব্যতিরেকেই আমি অন্যান্য লোকের সহায়তায় নিকটবর্ত্তী ক্যাম্বেল হাসপাতালে যাইলাম এবং তথায় ডাক্তারবাবু আমার মাথা ও পায়ের আঘাতগুলি বাঁধিয়া দিয়া আমাকে ছাড়িয়া দিলেন। বাড়ী আসিয়া ঘটনাটি যতই চিন্তা করিতে লাগিলাম ততই ভয় ও বিস্ময়ে মন অভিভূত হইতে লাগিল। মোটরের সামনের পুরু কাঁচগুলি ভাঙ্গিয়া চতুর্দ্দিকে তীব্রবেগে বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল অথচ আমার মুখের সামনে

আঘাত না লাগিয়া পশ্চাৎ দিকে কি করিয়া আঘাত লাগিল তাহা বড়ই বিস্ময়কর ব্যাপার। আমার প্রতিবাসী ডাক্তারবাবুরা বলিলেন যে, পুরু কাঁচ যদি মুখের দিকে লাগিত তাহা হইলে চক্ষু অন্ধ হইয়া যাইতে পারিত অথবা গলায় লাগিলে গুরুতররূপে আহত হইতাম। বোধ হয় ধাক্কা খাইয়া আমি সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলাম এবং সেই সময় কাঁচগুলি আমার মাথার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছিল এবং তাহারই কোনটির আঘাতে মাথার পিছন দিক কাটিয়া গিয়াছিল। বাড়ীতে বসিয়া যতই ঘটনাটি চিন্তা করিতেছিলাম ততই বিশ্বজননীর দয়ার কথা স্মরণ করিয়া অশ্রুতে আমার চক্ষু পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। আমার মনে হইল, দুইটি সবলবাহু আমাকে চতুর্দ্দিক হইতে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, আমার কর্ম্মফলের কণিকামাত্র আমাকে ভোগ করাইবার জন্য বিশ্বজননীর অনুমতিক্রমে ক্ষুদ্র এক কাঁচখণ্ড আমাকে আঘাত করিয়া মৃত্যুর কবল হইতে আমাকে অব্যাহতি দিল। ২।৩দিন কলেজ হইতে ছুটি লইলাম, তাহার পর কর্ম্মে যোগ দিতে সক্ষম হইয়াছিলাম, মাথার ক্ষত আরোগ্য হইতে প্রায় পনর দিন সময় লাগিয়াছিল। আমি বাড়ী ফিরিয়া আসিলে পূর্ণিমা ও আরতি রক্তসিক্ত জামা-কাপড় ও ব্যাণ্ডেজবাঁধা মাথা দেখিয়া ভয়ে পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। অরুণা পরে এই সংবাদ পাইয়া আরতিকে লিখিল, "মাথার কোন্ জায়গায় কেটেছে লিখো। শুনে আমার হাত পা কাঁপছিল।......... সুকু চিঠি পড়ে বলছিল, 'মা,' আমার পা কিরকম করছে, দাদুর ঐরকম কেটেছে শুনে। আমি ২।৩ মাস আগে বাবার ঐরূপ হয়েছে স্বপ্নে দেখেছিলাম। ৺মার কাছে পূজা মানত করেছিলাম কিন্তু পূজা দেওয়া হয় নি, নানা ঝঞ্ঝাটে।" করুণা কয়েকদিন পরে সংবাদ পাইয়া লিখিল, "আজ সারাদিন বাবার মিলিটারী লরীর ধাক্কা

খাওয়ার কথা মনে পড়ছে আর আমার বুকের মধ্যে শিউরে শিউরে উঠছে। ভগবান খুব রক্ষা করেছেন। মিলিটারী লরীতে ধাক্কা খেয়ে বাঁচা মানে ভগবানের রক্ষা করা ছাড়া আর কিছু নয়। মনে কর্লেই মাথা ঘুরে যাচ্ছে। কতবার যে তোমার ছোটজামাইবাবুর কাছে বলেছি যে 'কি সর্ব্বনাশ হত বল দিকিন'। বাবার মস্ত ফাঁড়া গেল। ৺মা কালী রক্ষে করেছেন।" আমি মেয়েদের পাংশুবর্ণ মুখ দেখিয়া ও ভীত ও চিন্তাকুলিত পত্র পড়িয়া ভাবি হয়ত ইহাদেরই শঙ্কিত স্নেহ আমাকে সর্ব্ববিধ বিপদ হইতে রক্ষা করে এবং ইহাদের জন্যই হয়ত আমার জীবন ধারণের এখনও প্রয়োজন আছে।

(২১)

কলেজে নূতন সেসন এই বৎসর আরম্ভ হইবার পূর্ব্ব হইতেই অর্থাৎ জুন মাস হইতে অনেকগুলি ছাত্র পড়ান পাইয়াছি। বৎসরের প্রারম্ভে এত অধিক সংখ্যক ও এত অধিক টাকার ছাত্র পড়ান পূর্ব্বে আর কখনও পাই নাই। কম্পার্টমেণ্টাল I. A. পরীক্ষার জন্য তিনটি ছাত্র আমার নিকট পড়িয়াছিল, ইহার মধ্যে দুইজন সপ্তাহে ৪দিন পড়ার জন্য মাসে একশত টাকা করিয়া দিয়াছিল। একজন ইহার মধ্যে সিন্ধুপ্রদেশবাসী শ্রীমুরলিধর মারতানি, আশুতোষ কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক I Sc. ছাত্র. ১৬৪ বকুল বাগান রোডে থাকিত। ইহার পিতা ব্যবসায়ী। শ্রীমান হরিপদ কুণ্ডু, কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের I. Sc. ক্লাসের ছাত্র, ৩৭৬ গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড (নর্থ) সালকিয়া হইতে আমার বাড়ীতে পড়িতে আসিত—ইহারা প্রত্যেকেই মাসিক ১০০৲ টাকা হিসাবে দিত। তৃতীয় ছাত্রটি শ্রীমান তারাপদ দত্ত, ৫২নং সার্পেণ্টাইন লেন, আমার ভূতপূর্ব্ব ছাত্র। তারাপদ ফেব্রুয়ারী মাসের পরীক্ষায়

ইংরাজিতে অকৃতকার্য্য হইয়া ইংরাজিতে I. A. কম্পার্টমেণ্টাল দিবার জন্য পুনরায় আমার নিকট পড়িতেছিল। তারাপদর পিতা শ্রীযুক্ত হরিপদ দত্ত মহাশয় তারাপদকে ইংরাজি পড়াইবার জন্য আমাকে পূর্ব্ব বৎসরের মত মাসিক ১১০৲ টাকা হিসাবে দিয়াছিলেন কিন্তু আমি তখন কেবলমাত্র ইংরাজি পড়াইতেছি বলিয়া ৮০৲ লইয়া বাকী ৩০৲ তাঁহাকে ফেরৎ দিই। সুতরাং তিনটি ছাত্র কম্পার্টমেণ্টালের জন্য দুইমাস পড়িয়া আমাকে সর্ব্বসমেত পাঁচশত ষাট টাকা দিয়াছিল। (প্রতিমাসে ১০০৲+১০০৲+৮০৲)। ভগবানের দয়ায় এই তিনটি ছাত্রই কম্পার্টমেণ্টাল পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হয় এবং তাহাদের কল্যাণ-কামনায় সার্কুলার রোডস্থ শিব মন্দিরে আমি বিশ্বেশ্বরের নিকট পূজা প্রদান করি। এই ছাত্রগুলির পড়ান শেষ হইবামাত্র পুনরায় পাঁচটি নূতন ছাত্র পড়ান আরম্ভ হয়। শ্রীমান অনন্ত কুমার সামন্ত ও শ্রীমান শ্যামসুন্দর সামন্ত, রিপন কলেজ, I. Sc. পরীক্ষার্থী। ইহারা সহোদর ভ্রাতা। ২৪।১ ঘোষ লেন হইতে সপ্তাহে তিনদিন ইহারা একত্র একই সময়ে আমার নিকট পড়িতে আসে এবং মাসিক একশত টাকা হিসাবে পারিশ্রমিক দেয়। শ্রীমান গুণেন্দ্রমোহন দাস, রিপণ কলেজ, B. A. পরীক্ষার্থী, ৯ জষ্টিস চন্দ্র মাধব রোড, ভবানীপুরে বাড়ী। গুণেন্দ্র হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ শ্রীযুক্ত লালমোহন দাস মহাশয়ের পৌত্র, হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দাস মহাশয়ের পুত্র। এই ছাত্রকে সপ্তাহে তিনদিন ইংরাজি ও বাংলা পড়াইবার জন্য ভবানীপুর যাইতে হয়, মাসিক পারিশ্রমিক ১২০৲ টাকা। তৃতীয় ছাত্রটি শ্রীমান কুমার কৃষ্ণ সেন, স্কটিস চার্চ্চ কলেজের ছাত্র, ৩নং ব্যাপটিষ্ট রোড সালকিয়া হইতে সপ্তাহে তিনদিন আমার বাড়ীতে পড়িতে আসে। মাসে ৯০৲ টাকা করিয়া আমাকে দিতেছে। কুমার

তাহার I. A. পরীক্ষার সময় আমার নিকট পড়িয়াছিল। আমার চতুর্থ ছাত্রটি শ্রীমান তারাপদ দত্ত, ৫২নং সার্পেণ্টাইন লেন। শ্রীমান তারাপদকে আজ প্রায় তিন বৎসর পড়াইতেছি, এবার কম্পার্টমেণ্টাল পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া রিপণ কলেজে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইয়াছে। আমি তারাপদকে ইংরাজি, ইকনমিক্‌স্, বাংলা ও সংস্কৃত অর্থাৎ তাহার B. A. পরীক্ষার সমস্ত পাঠ্যবিষয়গুলিই তাহার বাড়ীতে যাইয়া সপ্তাহে চারদিন পড়াইতেছি, মাসিক বেতন ১৪৫৲ টাকা। আমার পঞ্চম ছাত্র শ্রীমান বিশ্বনাথ দত্ত, তারাপদর সহোদর ভ্রাতা। গত দুই বৎসব এই দুই ভ্রাতাকে একসঙ্গে পড়াইয়াছিলাম। বিশ্বনাথ এইবার ফেব্রুয়ারী মাসের পরীক্ষায় ইংরাজি এবং বিজ্ঞানে অকৃতকার্য্য হইয়া রিপণ কলেজে দ্বিতীয় বার্ষিক I. Sc. ক্লাসে পুনবায় ভর্ত্তি হইয়াছে। তাহাকে সপ্তাহে তিনদিন ইংরাজি ও বাংলা পড়াইতে যাই, মাসিক বেতন ৮০৲ টাকা। এই পাঁচটি ছাত্র এখন পড়াইতেছি। ছাত্রগুলি সকলেই ভদ্র ও বিনয়ী, আমার সহিত ইহাদেব সকলেরই স্নেহের সম্বন্ধ গাঢ়, আমার শিক্ষা-প্রণালীতে ইহাদের অসীম বিশ্বাস। ছাত্র-বিষয়ে আমার চিরদিনই সৌভাগ্য, অভদ্র অথবা দুর্ব্বিনীত ছাত্র আমি কখনও পাই নাই। কলেজের গুরুতব পরিশ্রমের পর এই পাঁচটি ছাত্র পড়ানর সময় করা কঠিন, কিন্তু যিনি কর্ম্ম দিয়াছেন তিনিই আমাকে নিমিত্তরূপে স্থাপন করিয়া কর্ম্ম সুচারুরূপে করাইয়া

(২২)

আমার এই দীর্ঘ অধ্যাপক জীবনে ছাত্রদিগের বাড়ীতে যাইয়া পড়ান উপলক্ষ্যে কোন কোন ছাত্রের পিতার সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ হইয়াছে। কত বিচিত্র চরিত্রের লোক দেখিয়াছি, বিচিত্র গৃহ

এবং তদপেক্ষাও বিচিত্র সংসার-যাত্রা প্রণালী দেখিয়াছি তাহার নির্ণয় নাই। আমার চক্ষুদ্বয় সর্ব্বদাই অনুসন্ধিৎসু, ভগবানের অপূর্ব্ব সৃষ্টি-বৈচিত্র্য দেখিয়া সময় সময় বিশেষ প্রীতিলাভ করি। আজ প্রায় দুই বৎসরের অধিক কাল তারাপদ ও বিশ্বনাথকে পড়ান উপলক্ষ্যে তাহাদের বাড়ী যাতায়াত করিয়া গৃহস্বামী শ্রীযুক্ত হরিপদ দত্ত মহাশয়কে ঘনিষ্ঠ-ভাবে জানিবার ও চিনিবার সুযোগ হইয়াছে। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে ১লা নভেম্বর সন্ধ্যা ৭টার সময় আমি ছাত্র দুইটিকে প্রথম পড়াইতে যাই। সেইদিন গৃহের একপার্শ্বে বসিয়া হরিপদবাবু আমার পাঠ শ্রবণ করেন— Milton-এর "On his blindness" কবিতাটি পড়াইয়াছিলাম। তাহার পর হইতে দুই বৎসরের অধিককাল ছেলেদের পড়ান হইল, তিনি আর কোন দিন পড়াইবার ঘরে প্রবেশ করেন নাই, আমাকে বিশ্বাস করিয়াছেন, ছেলেদের সম্পূর্ণ ভার আমার উপর ছাড়িয়া দিয়াছেন। তাঁহার এই বিশ্বাস সময় সময় আমাকে চিন্তিত করে, ছেলেরা পড়াশুনা না করিলে উদ্বিগ্ন হই, আশঙ্কা হয় যদি কোনস্থানে আমার কর্ত্তব্যচ্যুতি ঘটে তাহা হইলে ভগবানের নিকট অপরাধী হইতে হইবে। ছেলেরা আমার এই উদ্বিগ্ন মন বুঝিতে পারে না, তাহারা আমার নির্দ্দেশমত পড়াশুনা করা সম্বন্ধে অনেক সময় উদাসীন। এই বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে যখন তারাপদ I. A. পাস করিয়া B. A. Class-এ ভর্ত্তি হইল তখন আবার নূতন করিয়া তাহাকে এবং বিশ্বনাথকে বিভিন্ন সময়ে পড়াইবার জন্য হরিপদবাবু আমাকে অনুরোধ করিলেন। আমি সম্মত হইলে তিনি মৃদু হাস্য করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কত টাকা দিতে হবে?" আমি বলিলাম, "আপনার বিচারের উপর আমার আস্থা আছে, আপনি যা দেবেন আমি তাই নোব।" তিনি পুনঃ পুনঃ বলিলেন, "আপনি যা চাইবেন আমি তাই দোব, আপনিই বলুন।" কথাটা আমি পূর্ব্ব

হইতেই ভাবিয়া আসিয়াছিলাম, বলিলাম, "তারাপদর জন্য মাসে ১৪৫৲ টাকা, বিশ্বনাথের জন্য মাসে ৮০৲ টাকা আমাকে দেবেন।" হরিপদবাবু বলিলেন, "বেশ তাই দোব, পড়াতে আরম্ভ করুন।" এক কথাতেই পারিশ্রমিক স্থির হইয়া গেল, হরিপদবাবুর মনে কোন দ্বিধা উপস্থিত হইল না, তিনি চিন্তা করিলেন না, দরদস্তুর না করিয়া সহজেই সমস্ত কার্য্যটি সমাপ্ত করিলেন। কিন্তু অসীম বিভবশালী লোকের সহিত পাঁচ টাকা কমবেশীর জন্য আমাকে অনেক সময় দরদস্তুর করিতে হইয়াছে অথচ এই দরদস্তুর করা আমার স্বভাববিরুদ্ধ। আমি ভাবিয়া চিন্তিয়া যাহা আমার প্রয়োজন, যাঁহার কমে আমি পড়াইতে পারি না, তাহাই দাবী করি, নানাবিধ বাক্য-বিন্যাসের দ্বারা কমবৃদ্ধি আলোচনা করিতে আমার মন বিরক্তিতে পূর্ণ হয়। আমার জীবনে ২।১টি মাত্র ক্ষেত্রে সদ্বিবেচক লোক দেখিয়াছি যাঁহারা আমার মনের ভাব বুঝিয়াছেন এবং বাজারের মত দরদস্তুর করার লজ্জা ও হীনতা হইতে আমাকে নিষ্কৃতি দিয়াছেন। হরিপদবাবু সেইরূপ অল্পসংখ্যক ব্যক্তিগণের মধ্যে অন্যতম।

হরিপদবাবুর কথা সময় সময় ভাবি। হরিপদবাবু বাল্যকালে দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া ধীরে ধীরে উন্নতি সোপানে আরোহণ করিয়াছেন। দীর্ঘাকার, অপেক্ষাকৃত স্থূলকায়, উজ্জ্বলবর্ণ, প্রশান্ত-দৃষ্টি এই ভদ্রলোকের সমস্ত আকৃতিকে আচ্ছন্ন করিয়া একটা স্নিগ্ধ কোমলতা আছে যাহা একমাত্র লক্ষ্মীশ্রী-সম্পন্ন মানুষের মধ্যেই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপ আকৃতি-বিশিষ্ট লোকের দুঃখ-দারিদ্র্য আসিলেও তাহা সাময়িক, ইহা সহজেই অনুমান করা যায়। চিরদুঃখী, চিরদরিদ্র লোকের সমস্ত দেহকে বেষ্টন করিয়া একটা বিবর্ণ রুক্ষতা বিরাজ করে তাহা তীক্ষ্ণদৃষ্টি লোকের নিকট সহজেই ধরা পড়িয়া যায়। হরিপদবাবু স্থিরবুদ্ধি ও মৃদুভাষী,

দাসদাসীগণের সহিত কথা কহিবার সময়ও তাঁহার উচ্চকণ্ঠ কখনও আমার শ্রুতিগোচর হয় নাই। বাগানে মালী হয়ত কর্ত্তব্যপালন করিতেছে না, দাসদাসী হয়ত বিরক্তি উৎপাদন করিয়াছে, ছেলেরা হয়ত পড়াশুনা না করিয়া বন্ধুবান্ধবদিগেব সহিত সিনেমা দেখিয়া সময় ও অর্থের অপব্যয় করিতেছে তথাপি এই গৃহস্বামীব পরুষকণ্ঠ গৃহটিকে প্রতিধ্বনিত করিতেছে না, যেন তিনি এই দোষত্রুটি ও কর্ত্তব্যচ্যুতি সংসারযাত্রা-জীবনের স্বাভাবিক সহচর বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার নিজের জীবনে কঠোর কর্ত্তব্যপরায়ণতা আমি প্রতিক্ষণ লক্ষ্য করিয়াছি। একদিন দেখিলাম, রেডিওতে তাঁহাদের কোন আত্মীয় কোনও বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন বলিয়া সংসারের বালকবালিকা, আত্মীয়-স্বজন সকলেই একটা প্রতিফলিত গৌরবেব আনন্দে চঞ্চল। সময়টি কিন্তু এমনই স্থির হইল যে, তখন হরিপদবাবুকে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় George Telegraph Institute-এ নিত্যনিয়মিত কর্ম্ম-সম্পাদনের জন্য যাইতে হইবে। বাটির কেহ কেহ তাঁহাকে রেডিও শুনিয়া কর্ম্মস্থলে একটু দেরীতে যাইতে অনুরোধ করিলেন। আমার কৌতূহল হইল, দেখি, এই স্বকর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি এরূপক্ষেত্রে কিরূপ আচরণ করেন। পরদিন পড়াতে যাইয়া সন্ধান লইয়া জানিলাম যে, স্বল্পভাষী এই ভদ্রলোক সমস্ত অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া নিয়মিত সময়েই George Telegraph School-এ চলিয়া গিয়াছিলেন। আরও অনেকক্ষেত্রে হরিপদবাবুর এইরূপ কঠোর কর্ত্তব্যনিষ্ঠা আমি লক্ষ্য করিয়াছি—কর্ত্তব্যপালন আছে, কর্ত্তব্যপালনের কোলাহল নাই, কর্ত্তব্য-পালন করিতেছেন কিন্তু মনে কর্ত্তব্যপালনের অহঙ্কার নাই, সচেতনতা আছে কিনা তাহাও সন্দেহ। ইংলণ্ডের বিখ্যাত প্রধানমন্ত্রী পিট একদিন বলিয়াছিলেন যে, ধৈর্য্যশীলতাই প্রধানমন্ত্রীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ। এই মহৎ গুণ

মানবজীবনে অলঙ্কারস্বরূপ এবং প্রকৃতি-সম্ভূত, চেষ্টা করিয়া কখনও এই গুণ অর্জ্জন করা যায় না। আমি কোনদিন হরিপদবাবুর ধৈর্য্যচ্যুতি হইতে দেখি নাই। হঠাৎ অবস্থা পরিবর্ত্তনের একটা মাদকতা আছে, এই মাদকতা অতি ধীর ও বিবেচক ব্যক্তিকেও রূঢ় ও উদ্ধত করিয়া তোলে,—ইহা আমি অনেকক্ষেত্রে লক্ষ্য করিয়াছি। কিন্তু দারিদ্র অবস্থা হইতে বিভবশালী হইয়াও এই ভদ্রলোক নিজ চরিত্রের মাধুর্য্য হারাইয়া ফেলেন নাই। হরিপদবাবু বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ কোন শিক্ষালাভ করেন নাই, স্কুল-কলেজের ছাপ তাঁহার নাই। কিন্তু শিক্ষা এবং সংস্কৃতির মধ্যে সম্বন্ধ সচরাচর পরিলক্ষিত হয় না—শিক্ষিত অথচ পশুবৃত্তিসম্পন্ন, নিরক্ষর অথচ প্রকৃত মানুষ অনেক সময় দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। হরিপদবাবুর সমস্ত আচার-ব্যবহারেব মধ্যে একটা সহজ, অনায়াসঅর্জ্জিত সংস্কৃতি অনুক্ষণ পরিস্ফুট। হরিপদবাবু আত্মীয় প্রতিপালক। আজ প্রায় তিন বৎসরকাল এই বাটীতে যাতায়াত করিয়াও আমি এই পরিবারস্থ সমস্ত মুখগুলি চিনিতে পারিলাম না। কত দূরসম্পর্কীয় পুরুষ ও স্ত্রীলোক এই বাটীতে থাকিয়া স্কুল কলেজে পাঠ করিতেছেন, অথবা চাকুরী করিতেছেন, অথবা বায়ু পরিবর্ত্তন করিতে আসিয়াছেন, অথবা সুদূর পল্লী পরিত্যাগ করিয়া "আজব সহর কলিকাতা" পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন তাহার নির্ণয় নাই। ইংরাজিশিক্ষিত ব্যক্তিরা এইরূপ পরগৃহবাসী লোককে "drones" বলিয়া ঘৃণা করেন কিন্তু হিন্দু আদর্শ একদিন অন্যরূপ ছিল,—"বহুপোষী হও" ইহা গুরুজনের একটা শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ বলিয়া গ্রহণ করা হইত। এইরূপে পল্লবিত, বহুশাখাপ্রশাখাপ্রসারিত, ঘনচ্ছায় বনস্পতির ন্যায় সংসারের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া বহুজনের আশ্রয়ভূত জীবনের একটা অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য আছে। ভগবান একজনের অঞ্জলি হয়ত কনকে রতনে পূর্ণ করিয়া

দিতেছেন কিন্তু যদি সেই ভাগ্যবান ব্যক্তি মনে করেন যে, শুধু তাঁহারই উদরপূরণের নিমিত্ত এই দান তাহা হইলে ভুল হইবে,—অন্নপূর্ণা হয়ত অনেকের মুখে অন্ন তুলিয়া দিবার জন্যই একজনের করপুট ভরিয়া দান করিতেছেন, অজস্রধারায় সেই দান অঞ্জলি ছাপাইয়া মাটিতে পড়িয়া যাইতেছে তবুও তাঁহার দান নিঃশেষিত হইতেছে না। বিধাতার এই নিগূঢ় উদ্দেশ্য যিনি বুঝিতে পারিয়াছেন তিনি ধন্য, তাঁহারই সৌভাগ্য সার্থক। হরিপদবাবু ভগবদ্‌বিশ্বাসী লোক,—ভগবদ্‌চরণে বিশ্বাস না থাকিলে এই জড়পিণ্ড মনুষ্যদেহ কি আত্মীয়স্বজন, সমাজ অথবা নিজের নিকট এত মধুর হইতে পারে? প্রতিদিন সকালে এবং সন্ধ্যায় হরিপদবাবু ভগবদ্‌চিন্তন করেন, সেই সময় সহস্র কাজ পড়িলেও তাঁহাকে বিরক্ত করিবার অধিকার কাহারও নাই। এতবড় একটা বৃহৎ পরিবারের নানাবিধ সাংসারিক চিন্তা, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত George Telegraph-এর দৈনন্দিন কর্ম্মসূচি সবই তখন তাঁহার মন হইতে অন্তর্হিত, নিশ্চল হইয়া ধ্যান করিতেছেন, তখন সমস্ত উপাধি-বর্জ্জিত মানুষ হইয়া বিশ্বজননীর শ্রীচরণে আত্ম-নিবেদন করিতেছেন। এইরূপ সংসারের বিক্ষুব্ধ আবর্ত্ত হইতে তীরে উঠিয়া সমস্ত দিনের মধ্যে একবারও বিশ্বপিতার সম্মুখে একাকী মুখোমুখি হইয়া বসিবার সৌভাগ্য হইতে অধিকাংশ কর্ম্মী ও ধনী-লোকই বঞ্চিত। ঐশ্বর্য্যের অভিশাপ এইখানেই—মহামায়া ঐশ্বর্য্য দিয়া মানুষকে ভুলাইয়া রাখেন, মানুষ স্বর্ণরৌপ্যের চাকচিক্যে মোহিত হইয়া 'যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি' যাঁহার জ্যোতিতে সব জিনিষ উজ্জ্বল,—তাঁহাকে বিস্মৃত হইয়া যায়।

হরিপদবাবুর চরিত্রের আর একটা দিক আছে যাহা আমার শিক্ষক-জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। হরিপদবাবু পুত্রকন্যাগণকে শিক্ষা

দিবার জন্য যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেন তাহা প্রকৃতপক্ষে বিস্ময়কর। সুদীর্ঘ আটাশ বৎসরব্যাপী শিক্ষাব্রতীজীবনে আমি হরিপদবাবু অপেক্ষা অনেক অধিক ধনী গৃহস্থের বাড়ী ছাত্রছাত্রী পড়াইয়াছি, এই কার্য্য উপলক্ষ্যে বহু লক্ষপতি, এমন কি কোটিপতির সংস্পর্শেও আমাকে আসিতে হইয়াছে। কিন্তু দেখিয়াছি পুত্রকন্যার শিক্ষার জন্য অর্থব্যয় করিলেও তাঁহারা উদার নহেন, অর্থব্যয় করিতেছেন কিন্তু সেটা যেন অতিরিক্ত ব্যয় অথবা অর্থের অপব্যয়, তাঁহাদের মন এই অর্থব্যয়ের জন্য যেন সর্ব্বদাই ক্লিষ্ট ও সঙ্কুচিত। পুত্রকন্যাগণেব শিক্ষার জন্য হরিপদবাবু কিরূপ অর্থব্যয় করেন তাহার উদাহরণ দিতেছি। দুইটি ছেলের পড়ানর জন্য আমাকে ১৪৫৲+৮০৲ টাকা দেন, একটি বিজ্ঞানের শিক্ষক মাসিক ১০০৲ টাকা, বিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়ের জন্য অপর শিক্ষক মাসিক ১৪০৲ টাকা পান—এই দুইটি পুত্রের প্রাইভেট টিউটারের জন্য মাসিক ৪৬৫৲ টাকা খরচ হইতেছে। কন্যাগণের মধ্যে কেহ কেহ স্কুল কলেজে পড়ে তাহাদের জন্য শিক্ষক আছেন, গান শিখাইবার শিক্ষকও আছেন। এইরূপে মাসে পুত্র-কন্যাগণের শিক্ষকদের জন্য অন্ততঃ সাতশত টাকা ব্যয় হয়—ইহা ব্যতীত স্কুল কলেজের মাহিনা তো আছেই। কিন্তু এত অর্থব্যয় যাহাদের জন্য অনায়াসে করিতেছেন তাহারা এই অর্থব্যয়ের পশ্চাতে যে উদার ও আশান্বিত মন রহিয়াছে তাহা কি কখনও দেখিতে পায়? সংসারের ধনী অথবা দুঃখী, পণ্ডিত অথবা মূর্খ, সকলেরই নিজ নিজ অভাব অভিযোগ আছে, এই দুঃখসঙ্কুল সংসারে সম্পূর্ণ সুখী হইবার অধিকার লইয়া কেহই জন্মগ্রহণ করে নাই। হয়ত এই কঠিন সংসারপথে বিচরণ করিতে করিতে হরিপদবাবুর পদদ্বয় ক্ষতবিক্ষত হইয়া যাইতেছে তাহার সন্ধান আত্মীয়স্বজন অথবা বন্ধুবান্ধব কেহই

রাখেন না। তাঁহারা ভাবেন সহজেই অর্থ আসিতেছে, সহজেই সংসার-চক্র অগ্রসর হইতেছে, দুঃখ নাই, বেদনা নাই, মানুষের জীবন যেন কতই সরল ও সুন্দর! হরিপদবাবুর অন্তরের নিভৃত স্থানে হয়ত কোথাও বেদনা লুক্কায়িত আছে, সংসারযাত্রাপথে পদদ্বয় হয়ত ক্লিষ্ট ও ক্ষতবিক্ষত—ইহার হিসাব-নিকাশ তাঁহার সংসারের অতি নিকটবর্ত্তী লোক, এমন কি পুত্রকন্যাগণের নিকটও নিশ্চয়ই অজ্ঞাত। এইরূপ মানুষ দেখিলে কবি Matthew Arnold লিখিত তাঁহার পিতার সম্বন্ধে কবিতার লাইনগুলি আমার মনে পড়ে।

If in the paths of the world,
Stones might have wounded thy feet,
Toil or dejection have tried
Thy spirit, of that we saw
Nothing—to us thou wast still
Cheerful, and helpful, and firm!

এই কবিতার প্রত্যেকটি কথা দুঃখতাপদগ্ধ সংসারের প্রত্যেক পিতার সম্বন্ধেই প্রযোজ্য—সে পিতা ধনী অথবা দরিদ্র হউন, পণ্ডিত অথবা মূর্খ হউন, ইংরাজ অথবা বাঙ্গালী হউন, সকল পিতার অন্তরের এই একই ইতিহাস।

বিচিত্র উপাদানে গঠিত হরিপদবাবুর চরিত্র আমি অনেক সময় বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি, চিন্তা করিয়াছি এবং ইহাই বুঝিয়াছি যে, গুণরাশিবর্জ্জিত মানুষের কখনও আকস্মিক উন্নতি হইতে পারে না, বিশ্বপিতার দয়ার অধিকারী হইতে হইলে সুখদুঃখের সংঘাতে মানব-চরিত্রে প্রস্ফুটিত নানাবিধ কুসুম দিয়াই তাঁহার আরাধনা করিতে হয়।

(২৩)

২৩শে সেপ্টেম্বর রবিবার বেলা দুইটার সময় পূর্ণিমা তাহার শ্বশুর বাড়ী চলিয়া যাইল, সুকুমারের জ্বর হইয়াছিল বলিয়া আমি নিজেই পূর্ণিমা ও খুকীকে রাখিয়া আসিলাম। এবার পূর্ণিমা চারমাস আমাদের এখানে ছিল। তাহার জন্য দুধ, মাছ ও মাংসের প্রচুর পরিমাণে ব্যবস্থা করা হইয়াছিল এবং খাদ্যদ্রব্য বেশ পরিপাক হওয়ায় ক্রমশঃ তাহার স্বাস্থ্যোন্নতি হয়। পূর্ণিমার খুকী উমা আমার ও আরতির অত্যন্ত প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। প্রফুল্ল কমলের মত নির্ম্মল মুখখানি সর্ব্বদাই হাসিতে বিকশিত, দীর্ঘায়ত চক্ষু দুইটিতে যেন সর্ব্বদাই কৌতূহল মাখান রহিয়াছে। আনন্দ হইলে উমা অস্ফুট শব্দ করিত এবং আমি ক্রোড়ে করিয়া বেড়াইলে চারিদিকে তাকাইয়া তাহার কৌতূহলনিবৃত্তি করিত। সকাল হইলেই আরতি উঠানে বিছানা করিয়া তাহাকে শোয়াইয়া দিত এবং সে প্রফুল্ল মনে অস্ফুট শব্দ করিতে করিতে খেলা করিত। নীল আকাশের দিকে সে নির্ণিমেষ চক্ষে চাহিয়া থাকে। আমি বাহিরের ঘর হইতে "খুকু" বলিয়া ডাকিলে তৎক্ষণাৎ চক্ষু ঘুরাইয়া শব্দের স্থানটি লক্ষ্য করিবার চেষ্টা করে। সমস্ত দিনের মধ্যে তাহার কান্না একবারও শ্রুতিগোচর হইত না, কেবল ক্ষুধা পাইলে ঈষৎ ক্ষুঁৎ ক্ষুঁৎ করিত। আমি তাহার সেই শব্দের অর্থগ্রহণ করিতে পারিতাম। হরলিকের দুগ্ধ তাহার বড়ই প্রিয় ছিল, এবং বোতলে করিয়া হরলিক দিলে নিমিষের মধ্যেই তাহা নিঃশেষিত করিয়া ফেলিত। সপ্তাহে কোন কোন দিন তাহাকে কালমেঘের রস দেওয়া হইত এবং সেই সময় উমার বিকৃত মুখ এবং জিব দিয়া রসটি ঠেলিয়া ফেলিবার চেষ্টা দেখিলে আমরা হাস্য সংবরণ করিতে পারিতাম না। কোনরূপে কালমেঘ গলাধঃকরণ করার পরও অভিমানের রাগ ও কান্না কিয়ৎক্ষণ

পর্য্যন্ত চলিত, আমি ক্রোড়ে লইয়া সমস্ত উঠানটি বেড়াইয়া তাহাকে শান্ত করিতাম। মাত্র ৪।৫ মাস বয়সেই উমা কোল বিচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। একদিন দ্বিপ্রহরের পর সে পূর্ণিমার সহিত তাহার ঠাকুরদাদার বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়াছিল, সেখানে কাহারও কোলে থাকিবে না, অপরিচিত মুখ দেখিয়া অনবরত কাঁদিতেছিল। ফণী একদিন আসিয়া ক্রোড়ে লইল, কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য তাহার মুখের দিকে উমা জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, তাহার পরই ঠোঁট ফুলাইয়া কান্না। তাহার জগতে এখন তিনটি মুখ আছে, একটি তাহার মার, অপরটি তাহার ছোট মাসির, এবং তৃতীয়টি তাহার দাদামহাশয়ের—বাকী পৃথিবীটা কেবলমাত্র ভীষণাকৃতি মুখচোখে পরিপূর্ণ। উমা বড়ই শান্তস্বভাবা এবং ভীতু। শঙ্খধ্বনি হইলে, অথবা রাস্তায় ঘড়ঘড় শব্দে কোন যানবাহন যাইলে, অথবা নিকটে বসিয়া কেহ হাঁচিলে উমা তৎক্ষণাৎ ঠোঁট ফুলাইতে আরম্ভ করে এবং অনেক আদর-যত্নের পর এবং সাহস দিতে দিতে তবে শান্ত হয়। এই মানবিকা প্রায় চারমাস আমার সময়ের অনেকখানি অধিকার করিয়াছিল এবং সে চলিয়া যাওয়ার পর কয়েকদিন বাড়ীটি যেন শূন্য মনে হইত।

(২৪)

২৫শে সেপ্টেম্বর অপ্রত্যাশিতভাবে কলিকাতার সমস্ত কলেজগুলি ৺শারদীয়া পূজা উপলক্ষে বন্ধ হইয়া গেল। ৪ঠা অক্টোবর কলেজ হইয়া ছুটি হইবার কথা ছিল কিন্তু ট্রামকর্ম্মচারীরা ধর্ম্মঘট করায় ছেলেদের কলেজে যাতায়াতের অত্যন্ত অসুবিধা হইতে লাগিল। অধ্যাপক-গণের মধ্যে যাঁহারা দূরে থাকেন তাঁহারা কেহ বা পদব্রজে, কেহ বা

ট্যাক্সি করিয়া অনেক অসুবিধা ভোগ করিয়া কলেজে আসিতেছিলেন। এই সমস্ত কারণে কলেজগুলি নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। ট্রাম প্রায় ৯।১০ দিন বন্ধ ছিল। আমাদের কলেজ ১লা নভেম্বর খুলিবে।

(২৫)

৩০শে সেপ্টেম্বর, রবিবার দ্বিপ্রহরে শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী চৌধুরী তাঁহার গিরিডির বাড়ীতে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার ছেলেমেয়েদের লিখিত পত্রে আমি কয়েকদিন পরে এই ঘটনা জানিতে পারি। বঙ্কুবাবুর সহিত আমার বহুদিনের পরিচয়। প্রায় আটাশ বৎসর পূর্ব্বে সিটি কলেজের ছাত্রাবাসে Assistant Superintendent থাকাকালীন তাঁহার সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়। তখন তিনি ঐ ছাত্রাবাসের ডাক্তার। আমাদের উভয়ের বয়সের পার্থক্য অনেক ছিল, কিন্তু তথাপি উভয়ে অনেক সময় বসিয়া মন খুলিয়া সাংসারিক সুখ-দুঃখের কথা বলিতাম। তিনি মেডিক্যাল কলেজের L. M. S. পাশ ডাক্তার ছিলেন এবং চিকিৎসা-বিদ্যায় তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। আমি তাঁহার মেয়েদের মধ্যে প্রায় সকলকেই তাঁহার বাড়ী যাইয়া পড়াইয়াছি। তাঁহার মধ্যমা কন্যা বীণা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে হঠাৎ কলেরা রোগে মারা যায়, সেই সময়ে এই পিতার যে দুঃখ আমি দেখিয়াছিলাম তাহা অবর্ণনীয়। বঙ্কুবাবুর শোকসন্তপ্ত স্নেহের সাধারণতঃ বাহ্যিক কোন প্রকাশ ছিল না কিন্তু আমি তাঁহার অন্তঃস্থলের স্নেহের সময় সময় পরিচয় পাইতাম। বঙ্কুবাবুর সহিত আমি তাঁহার হরিপালের বাটী গিয়াছি, তাঁহার গিরিডির বাড়ীতে যাইয়া আমি একবার কয়েকদিন ছিলাম। বঙ্কুবাবু এবং তাঁহার স্ত্রীর আদর-

যত্নের কথা আমার চিরদিন স্মরণ থাকিবে। তাঁহার স্ত্রীকে প্রকৃতই সহধর্ম্মিনী বলিয়া মনে হইত। বঙ্কুবাবুর শ্বশুর মহাশয় একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম প্রচারক ছিলেন, তাঁহার নিজ জীবন এবং ধর্ম্মপ্রচারের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। বঙ্কুবাবুর স্ত্রী তাঁহার পিতার অনেক সদ্‌গুণের অধিকারিণী হইয়াছিলেন, বিশেষ করিয়া সেবাই তাঁহার জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। বঙ্কুবাবুর মত সরল, শান্তপ্রকৃতি বন্ধু-বৎসল লোক আমি বেশী দেখি নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন এবং সেই সময়েও আমার বাটীতে আসিয়া দেখা করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর হইতে চক্ষুর পীড়া হওয়ায় তিনি ভাল দেখিতে পাইতেন না, তথাপি বন্ধুবান্ধবদিগের বাড়ীতে চিকিৎসার জন্য অথবা অন্য কোন কারণে যাইতে তিনি ইতস্ততঃ করিতেন না। আমার নিজের এবং ছেলেমেয়েদের অসুখের সময় তিনি কতদিন আমার বাটীতে আসিয়া বিনা পারিশ্রমিকে রোগী দেখিয়া গিয়াছেন তাহার নির্ণয় নাই। বঙ্কুবাবু ব্রাহ্ম ছিলেন কিন্তু আমাদের উভয়ের মধ্যে ধর্ম্মবিশ্বাসের প্রভেদ থাকিলেও তাঁহার সহিত ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কথাবার্ত্তা কহিয়া এবং তাঁহার জ্বলন্ত বিশ্বাস দেখিয়া মনে বড়ই আনন্দ পাইতাম। ৯ই অক্টোবর, মঙ্গলবার প্রাতে ৮॥০ঘটিকার সময় গিরিডির বাড়ীতে তাঁহার পারলৌকিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। আমি কলিকাতায় ঠিক ঐ সময়ে তাঁহার পরলোকগত আত্মার কল্যাণার্থ ভগবৎ চরণে কাতরকণ্ঠে প্রার্থনা করি। বঙ্কুবাবুর মৃত্যুতে আমার প্রকৃত কল্যাণ-কামী একজন বন্ধু আমি হারাইলাম।

(২৬)

১লা অক্টোবর সোমবার সকাল ৭-৩৫ মিনিটের ট্রেণে আরতি অরুণার সহিত ভাগলপুর যাইল। পূর্ব্বদিন ফণী আসিয়া বেলা ১২টার

সময় আরতিকে কালীঘাট লইয়া গিয়াছিল এবং সেই রাত্রি কালীঘাটে থাকিয়া আরতি পরদিন সকালে অরুণার সহিত ভাগলপুর যাত্রা করে। আমি ষ্টেশনে গিয়া তাহাদিগকে দেখিয়া আসি এবং ট্রেণ ছাড়িয়া দিলে বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছিলাম। বহুদিন হইতে আরতির শরীর ভাল যাইতেছিল না, মাছ, মাংস, দুধ, ঘি, ঔষধ নানাবিধ ব্যবস্থা করিতেছিলাম তথাপি যেন রোগা হইয়া যাইতেছিল। ফণীরা ভাগলপুর যাইবে শুনিয়া আমি আরতির যাওয়ার কথা প্রস্তাব করিলাম এবং ফণী আনন্দের সহিত সম্মত হইল। আরতি ভাগলপুরে পৌঁছিয়া আমাকে ২রা অক্টোবর চিঠি দিয়াছিল, আমি সেই চিঠি পরদিন বিকালে পাইয়াছিলাম। আরতি লিখিয়াছিল "·········কাল আমরা সন্ধ্যা ৭টার সময় ভাগলপুর এসে পৌঁছেচি। কাল সাঁইথিয়া ষ্টেশনে কেষ্ট কাকা লুচি, আলুর দম, রসগোল্লা এক হাঁড়ি, শঙ্করের দুধ বোতলে করে, পান, এক কলসী জল, লুচি খাবার জন্য সালপাতা এক গোছ দিয়েছিলেন।·········আমি ট্রেণ থেকে পুষ্পদের বাড়ী দেখতে পাচ্ছিলাম।·········লুচি ইত্যাদি অনেক দিয়েছিলেন, আমরা খেয়েও অনেক ছিল।·········গাড়িতে ভিড় ছিল না।·········কাল রাত্রি ৯টার সময় মান্তিদি ও আমি ও মানারা খেয়ে নিয়ে শুয়েছিলাম দোতালাতে। আজ সকালে ৬টার সময় উঠে চান করে একবাটি গরম দুধ ও দুটো পান্তুয়া খেয়েছিলাম, তার খানিকটা পরে গরম লুচি চারটে, বেগুন ভাজা, পটল ভাজা, ভাল আখের গুড় খেয়েছিলাম।·········বাড়ীটি খুব বড়, অনেক লোক।·········আমি যে ঘরে বসে আপনাকে চিঠি লিখছি সেই ঘর থেকে প্রকাণ্ড একটা পাঁচিল ঘেরা ফলের বাগান দেখতে পাচ্ছি। বামুনদি ঠিকমত কাজ কচ্ছে কিনা লিখবেন। ঝিটা ঠিক মত আসে কিনা।·········আপনি

বড় কোরে চিঠি দেবেন। আপনার জন্য আমার বড় মন কেমন কচ্ছে। টোটাই।”

আরতি এখান হইতে যাওয়ায় আমার অনেক অসুবিধা হইতেছে, কারণ আমার জুতা বুরুষ করা এবং অন্যান্য ছোট ছোট নানাবিধ কাজ সে সমস্তই করিত। আমি সংসারের কোথায় কি আছে জানি না, হিসাবপত্রও রাখি না। ভাগলপুর যাইবার ৮।৯ দিন আগে হইতে সে সংসারের সমস্ত জিনিষপত্র গুছাইয়া রাখিয়া আমাকে কাগজের ফর্দ্দে সমস্ত লিখিয়া দিয়াছিল। সে অরুণার কাছে আছে আমি নিশ্চিন্ত, পরিশ্রম করিতে হইবে না, ভাল জায়গায় বায়ু পরিবর্ত্তন হইবে, শরীরের উন্নতি হইবার সম্ভাবনা।

৫ই অক্টোবর, শুক্রবার, মহালয়া। তর্পণ করিবার জন্য তিল, গঙ্গাজল, আসন, প্রভৃতি সমস্ত জিনিষ আরতি পূর্ব্ব হইতেই ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিল। আমি তর্পণ করিলাম। বৎসরের এই একদিন বাবার কথা বেশী করিয়া মনে পড়ে। আমি জানি সংসারে তাঁহার আশীর্ব্বাদ আমার বর্ম্মস্বরূপ, আমার কোন পাপ অথবা দোষত্রুটি এই আশীর্ব্বাদের রক্ষা-কবচ হইতে আমাকে বঞ্চিত করিতে পারিবে না। সংসারের সকলে রুষ্ট হইতে পারে, আমাকে পরিত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু এই এক জায়গায় আমার স্নেহের দাবী আছে, সেই দাবী আমি জোর করিয়া করি। বহু ভাগ্যে এমন পিতা পাইয়াছিলাম,—এমন স্নেহশীল, ক্ষমাশীল, আদর্শচরিত্র পিতা। আমার মনুষ্য জীবনের শত ব্যর্থতার মধ্যে এই একটি মাত্র সার্থকতা আছে। তাই তর্পণের দিন তাঁহাকে ভক্তি করিয়া তিল ও গঙ্গাজল অর্পণ করি, তাঁহার তৃপ্তির জন্য ভগবানের নিকট কাতর হইয়া প্রার্থনা করি।

মহালয়ার দিন বামুনদি কাজে আসিল না, গঙ্গাস্নান করিয়া তাহার জ্বর। ছোট ডাক্তারবাবুর বাড়ী হইতে দুইবেলা অন্নব্যঞ্জন আসিল। রাত্রিতে ভাত খাইবার পর এঁটো পাড়িতে ডাক্তারবাবুর ঝি সিন্ধু আসিল না, সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। অনেকক্ষণ তাহাব জন্য অপেক্ষা করিয়া নিজেই ন্যাতা লইয়া এঁটো পরিষ্কার করিলাম এবং উচ্ছিষ্ট বাসনগুলি বাহিরে কলের নিকট রাখিয়া আসিলাম। এঁটো পাড়া কাজটি কখনও করিয়াছি কিনা মনে পড়ে না, সুতরাং একটা নূতন অভিজ্ঞতা হইল। যদি বাঁচিয়া থাকি এবং বিশ্বজননীর দয়ায় আমার মনস্কামনা পূর্ণ হয় তাহা হইলে এইরূপ ছোটখাট কাজ সমস্তই করিবার জন্য আমাকে প্রস্তুত হইতে হইবে।

(২৭)

আজকাল আমার নিকট বলাই ও নিমাই নামে দুইটি বালক প্রায়ই আসে। তাহাদের মা নিকটস্থ একটি বাটিতে ঝিয়ের কার্য্য করে। বালক দুইটির বয়স যথাক্রমে ৪।৫ এবং ২।২॥০ বৎসর বলিয়া মনে হয়। বিশেষ করিয়া কনিষ্ঠ নিমাই আমার বড়ই প্রিয়। অপেক্ষাকৃত হৃষ্টপুষ্ট শ্যামবর্ণ নিমাইকে তাহার মা কাজে বাহির হইবার সময় বাড়ীতে বাঁধিয়া রাখিয়া আসে, বাঁধন শক্ত হইলে সে খুলিতে পারে না, কিন্তু কোন কোন দিন সে বাঁধন খুলিয়া ফেলে এবং আমার কাছে আসিয়া উপস্থিত হয়। রাস্তা হইতে মৃদুকণ্ঠে 'বাবু' বলিয়া আমাকে ডাকে এবং আমি তাহাকে আহ্বান করিলেই ঘরের ভিতরে চলিয়া আসে। কোন কোন দিন দিগম্বর এই বালক ধূলা ও কাদায় সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া উপস্থিত হয় তখন তাহার ধূলিধূসরিত অপাপবিদ্ধ কোমল দেহ-যষ্ঠি বড়ই সুন্দর দেখায়। মাতা দাসীবৃত্তি করিয়া সংসার প্রতিপালন করে কিন্তু মাতার এই হীন

কর্ম্মের গ্লানি বালককে স্পর্শ করিতে পারে না, মাতা দরিদ্র অথবা ধনী সে সংবাদ এই বালকের নিকট নাই। তাহার মৃদু ও আধ আধ কথা আমার বড়ই মিষ্ট লাগে। তাহার বাম হস্তে কনিষ্ঠ অঙ্গুলিটির উপরিভাগের খানিকটা কাটিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে, সেই ক্ষত আমাকে মধ্যে মধ্যে দেখায় এবং আমি ফুঁ দিয়া দিলে খুসী হয়। আমি তাহাকে সকালে দুধ খাইতে দিই, কোনদিন বা বিস্কুট খায়, পয়সা প্রত্যহই দিতে হয়। একটি আনি দিলে নিমাই কিছুতেই লয় না, একখানি দুই পয়সার টুকরা দিলে তবে খুসী হয়। নিমাইয়ের কাছে দুই পয়সার টুকরা আনি অপেক্ষা অধিক মূল্যবান। মধ্যে তাহার জ্বর হইয়াছিল, জ্বর গায়েই আমার নিকট পলাইয়া আসিত। পয়সা দিয়া ছোলাভাজা আমসত্ত্ব প্রভৃতি খারাপ খাবার কিনিয়া খায় বলিয়া তাহাকে কোনদিন পয়সা দিতে আপত্তি করিলে নিমাই ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া অস্ফুটস্বরে গর্জ্জন করে এবং মাটিতে পা ঠুকিয়া তাহার অসন্তোষ প্রকাশ করে, তখন বাধ্য হইয়া তাহাকে পয়সা দিতে হয়। অজ্ঞাত ও অপরিচিত "বাবুর" উপর বালকের এই স্নেহের দাবী আমার বড়ই মধুর লাগে। একদিন আমার গলায় পৈতা দেখিয়া নিমাই জিজ্ঞাসা করিল "গলায় দড়ি কেন?" আমি হাসিয়া ভাবিলাম ব্রাহ্মণত্ববর্জ্জিত মানুষের গলায় যজ্ঞোপবীত দড়িতেই পরিণত হইয়াছে! বালকের সরল হাসি আমার ভিতর ও বাহিরের অন্ধকার ক্ষণকালের জন্যও দূর করিয়া দেয়।

(২৮)

২৬শে অক্টোবর, বেলা ২-২৫ মিনিটের ট্রেণে আমি, আমার ছাত্র শ্রীমান্ গুণেন্দ্র মোহন দাস ও তাহার ভৃত্য ভুবন নবদ্বীপ যাত্রা করিলাম এবং তথায় তিন রাত্রি বাস করিয়া সোমবার সকালের ট্রেণে

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। নবদ্বীপ যাওয়া সম্বন্ধে ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিতেছি।

শ্রীমান্ গুণেন্দ্র মোহন দাসের কথা পূর্ব্বেই লিপিবদ্ধ করিয়াছি। আজ প্রায় মাসাধিকের উপর হইল তাহাকে পড়ান উপলক্ষ্যে আমাদের পরিচয় হইয়াছে। গুণেন্দ্রের পিতামাতা বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত, ইঁহাদের ভবানীপুরস্থ বাটিতে গোবিন্দজীর নিত্য সেবা হইয়া থাকে। সম্প্রতি ২।৩ বৎসর পূর্ব্বে প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া পিতা সুরেশ বাবু নবদ্বীপে মহাপ্রভু-পাড়ায় একখানি সুন্দর ত্রিতল গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। গৃহস্বামী মধ্যে মধ্যে নবদ্বীপ যাইয়া থাকেন, অন্য সময়ে বাড়ীটি তালাবন্ধ থাকে। নবদ্বীপে যাইয়া থাকিবার এইরূপ সুযোগের কথা শুনিয়া আমার নবদ্বীপ যাইবার ইচ্ছা হইল এবং গুণেন্দ্র উৎসাহের সহিত আমার প্রস্তাব সমর্থন করিল। ৺শারদীয়া পূজার অব্যবহিত পরেই নবদ্বীপ যাইবার কথা ছিল কিন্তু সেই সময় কয়েকদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হওয়ায় নবদ্বীপ যাত্রা পিছাইয়া দিতে হইল। ২৬শে অক্টোবর একটি নাতিবৃহৎ পুঁটলি লইয়া আমি ট্রামে করিয়া যথা-সময়ে হাবড়া ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম। পূর্ব্ব হইতেই গুণেন্দ্র আসিয়া-ছিল, সঙ্গে তাহার পিতা সুরেশবাবু এবং গুণেন্দ্রের মন্ত্রদাতা গুরু। সুরেশবাবু কিছুদিন পূর্ব্বে অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন, সেদিনও তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ নন। তথাপি আমাদিগকে ষ্টেশনে তুলিয়া দিতে আসিয়াছেন দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। তিনি পুনঃ পুনঃ বলিলেন যে, গুণেন্দ্র ছেলেমানুষ সঙ্গে যাইতেছে, হয়ত আমার কতরকম অসুবিধা হইবে। আমি বলিলাম যে তীর্থ করিতে যাইতেছি, অসুবিধা ভোগ করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু সঙ্গে চাকর যাইতেছে, সুবৃহৎ বাড়ীতে বাস করিব সুতরাং অসুবিধার সম্ভাবনাও বিশেষ নাই। গুণেন্দ্রের গুরুদেব

প্রভুপাদ শ্রীকানাই লাল গোস্বামী বাঁকুড়া জেলার শ্রীপাট পুরুলীয়া গ্রামনিবাসী। পূর্ব্বেই কার্ত্তিক মাসে শ্রীমদ্‌ভাগবৎ পাঠ উপলক্ষ্যে সুরেশবাবুর বাড়ীতে ইঁহার সহিত আলাপ হইয়াছিল। ইনি একজন খাঁটি বৈষ্ণব, নিজে অমানী অথচ শিক্ষক বলিয়া আমাকে বিবিধ উপায়ে সম্মান প্রদর্শন করিতেছিলেন। যথা সময়ে সুরেশবাবু ও বৈষ্ণব মহাশয় বিদায় গ্রহণ করিলেন, আমি, গুণেন্দ্র ও ভুবন ট্রেণে উঠিয়া বসিলাম।

সন্ধ্যা প্রায় ৬টার সময় নবদ্বীপ ষ্টেসনে পৌঁছিলাম এবং গুণেন্দ্রের পরিচিত এক কোচম্যানের ঘোড়ার গাড়িতে করিয়া মহাপ্রভু-পাড়ায় তাহাদের বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। বাড়ীটি নানাবিধ দেশী ও বিলাতি মূল্যবান তালায় ভিতর ও বাহিরে আবদ্ধ—যেন সংসারী বদ্ধজীব, বাসনার অসংখ্য রজ্জুতে দৃঢ়ভাবে শৃঙ্খলিত। দরজা খুলিতে এবং আলো জ্বালিতে অনেক সময় অতিবাহিত হইল। বাড়ীটির নাম "স্মৃতি সৌধ"—গুণেন্দ্রের পিতামহ ভূতপূর্ব্ব হাইকোর্টের জজ শ্রীযুক্ত লালমোহন দাস মহাশয়ের স্মৃতির সহিত ইহা বিজড়িত। একটি প্রশস্ত প্রকোষ্ঠে আমার শয্যা রচিত হইল, গুণেন্দ্র পার্শ্ববর্ত্তী একখানি ঘরে আশ্রয় লইল, ভুবন নীচের ঘরে বিছানা করিল। আমার শয়নকক্ষে ৺তারকনাথ, ৺বিশ্বনাথ ও গুণেন্দ্রের কক্ষে কালীঘাটের ৺কালীর চিত্র দেওয়ালে রহিয়াছে দেখিলাম। এক বিশ্বনাথ ব্যতীত আর সকলেই আমার অতিপরিচিত,—হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে অধিষ্ঠিত দেবদেবী। মনে বড়ই আনন্দ হইল। কিয়ৎক্ষণ বাড়ীতে বিশ্রাম করিয়া আমরা রাত্রি প্রায় ১০টার সময় গোবিন্দজীউয়ের মন্দিরে ভোগ খাইতে যাইলাম। অতি সুন্দর কারুকার্য্যখচিত মন্দির, কিন্তু সুন্দর হইতেও সুন্দর দেখিলাম শ্রীগোবিন্দজীর বিগ্রহ, বামপার্শ্বে

রাধারাণী, দক্ষিণপার্শ্বে শ্রীগৌরাঙ্গ মূর্ত্তি। অতি মনোরম ও মূল্যবান পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারে বিগ্রহগুলি চতুর্দ্দিক শোভা করিয়া বিরাজমান। সেবায়েৎ মহারাজ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার সিং মহাশয়ের সহিত পরিচয় হইল। ইনি মণিপুরনিবাসী। গৌরবর্ণ, প্রশান্তবদন, সদাহাস্যময় এই বৈষ্ণব সংসারের সহিত সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া গোবিন্দজীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। আরতি হইল, আরতির সময় সেবায়েৎ মহারাজ প্রাঙ্গণের একটি দ্বারের একপার্শ্বে অতি দীনের মত দাঁড়াইয়া বিগ্রহের প্রতি নিবদ্ধদৃষ্টি, জোড়হস্ত,—কখনও বা করতল বিস্তৃত করিয়া, কখনও বা বাহুদ্বয় ঊর্দ্ধে তুলিয়া মনের বিভিন্ন ভাবতরঙ্গ নির্ব্বাক অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা বিগ্রহের নিকট নিবেদন করিতেছিলেন। যথাসময়ে প্রসাদ পাইলাম, সে শুদ্ধ, সাত্ত্বিক, দেবনিবেদিত ভোজ্য-দ্রব্য গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইলাম। বাড়ীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শয্যা-গ্রহণ করিলাম, কিন্তু সেদিন রাত্রিতে নিদ্রাকর্ষণ হইতে অনেক বিলম্ব হইল।

২৭শে অক্টোবর, শনিবার অতি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিলাম। আমার শয্যাকক্ষের ঠিক সম্মুখে রাস্তার অপর পারে "জগাই মাধাই উদ্ধার" মন্দির। এই মন্দিরেব সম্মুখস্থ প্রাঙ্গনে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে একজন বিধবা রমণী "নারায়ণ রক্ষা কর," "গুরু রক্ষা কর" বলিতেছিলেন এবং সম্মার্জ্জনীহস্তে মন্দিরের প্রাঙ্গণ পরিস্কৃত করিতেছিলেন। এই শব্দে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া আমি ও গুণেন্দ্র প্রথমেই শ্রীগৌরাঙ্গ মন্দির যাইলাম। সেখানে শ্রীমদ্‌ভাগবৎ পাঠ হইতেছিল। তাহার পর আরও নানাস্থানে বিগ্রহ দর্শন করিলাম, সোণার গৌরাঙ্গমূর্ত্তি দেখিলাম। প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় ক্লান্ত হইয়া বাড়ীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া স্নান সম্পন্ন করিলাম এবং বেলা প্রায়

২টার সময় গোবিন্দ মন্দিরে যাইয়া ভোগ গ্রহণ করিলাম। সেবায়েৎ মহারাজ যেখানে আমার আহারের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন তাহা শ্রীগোবিন্দ বিগ্রহের বাহিরের বারান্দায় হইলেও শ্রীগোবিন্দ বিগ্রহ হইতে অধিক দূরে নহে। ভোগ গ্রহণ করিতে করিতে আমার মনে হইতে লাগিল যে, শ্রীগোবিন্দ স্নেহ করিয়া তাঁহার ক্রোড়ের কাছে বসাইয়া আমাকে ভোজন করাইতেছেন। তাঁহার দয়ার কথা স্মরণ করিয়া আমার চক্ষে জল আসিতে লাগিল, আমি গোপনে চক্ষু মুছিতে মুছিতে ভোগ গ্রহণ করিলাম। পরে বাড়ীতে ফিরিয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া আমি, গুণেন্দ্র ও ভুবন তিনজনে বেলা প্রায় ৫টার সময় সমাজবাড়ি যাইলাম। এই সমাজবাড়ি নবদ্বীপের এক বিখ্যাত স্থান। এখানে শ্রীরাধার বিগ্রহ আছেন। কিন্তু এই স্থানের প্রসিদ্ধির বিশেষ কারণ এই যে, ইহার সহিত দুইজন বৈষ্ণব সাধুপুরুষের নিবিড় সংস্রব রহিয়াছে। শ্রীরামদাস বাবাজী ও শ্রীললিতা সখী উভয়েই বৈষ্ণব চূড়ামণি শ্রীচরণ দাস বাবাজীর মন্ত্রদীক্ষিত শিষ্য। এই সমাজবাড়িতে শ্রীচরণ দাস বাবাজীর সমাধির উপর তাঁহার উপবিষ্ট পিত্তলনির্ম্মিত সুবৃহৎ মূর্ত্তি। এই সমাজবাড়িতে বহু বৈষ্ণব ও ভক্তলোক যাতায়াত করনে, অনেক লোক প্রত্যহ এখানে ভোগ গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং উৎসব উপলক্ষ্যে সহস্র সহস্র লোক প্রসাদ পাইয়া কৃতার্থ হন। শ্রীরামদাস বাবাজীর অনেক অর্থশালী শিষ্য আছেন এবং তাঁহাদের প্রদত্ত অর্থে এই সমাজবাড়ির প্রচুর ব্যয় অতি সহজেই সঙ্কুলান হইয়া যায়। শ্রীরামদাস বাবাজী বৈষ্ণব মহাপুরুষ, তাঁহাকে দেখিবার এবং তাঁহার মধুর কীর্ত্তন শুনিবার আকাঙ্খা আমার বহুদিন হইতেই ছিল, কিন্তু আমি সমাজবাড়িতে যাইয়া দেখিলাম তিনি সেদিন তথায় অনুপস্থিত। শ্রীললিতা সখী নামে পরিচিত বৈষ্ণব সাধুপুরুষ শ্রীরামদাস বাবাজীর গুরুভ্রাতা। যৌবনে

সংসার পরিত্যাগ করিয়া ইনি ললিতা সখীর ভাবে সাধনা করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন এবং তদবধি স্ত্রীলোকের ন্যায় বেশভূষা, অলঙ্কার প্রভৃতি পরিধান করেন এবং মন্দিরের সকলেই তাঁহাকে 'মা' বলিয়া ডাকেন। আমি পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলাম যে, ইনি অসাধারণ পণ্ডিত অথচ বিনয়ের প্রতিমূর্ত্তি। আমি ও গুণেন্দ্র শ্রীললিতা সখীকে দর্শন করিতে যাইয়া দেখিলাম যে, তিনি বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছেন, তখনও ভক্ত-সমাগম হয় নাই। বেশ নির্জ্জনভাবে তাঁহাকে পাইয়া আনন্দিত হইলাম এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার নির্দ্দেশমত একটি সতরঞ্চীর উপর উভয়ে আসন গ্রহণ করিলাম। শ্রীললিতা সখী আমাদের সম্মুখে একটি অপরিসর বিভিন্ন আসনে উপবিষ্ট। আমরা সকলেই নির্ব্বাক—আমি নিবিষ্টমনে তাঁহাকে লক্ষ্য করিতেছি, অপেক্ষাকৃত স্থূলকায় এই সাধক বৃদ্ধ, মুখমণ্ডলে শ্মশ্রুর রেখা মাত্র নাই, হিন্দুস্থানী রমণীগণের ন্যায় একটি নানাবর্ণে রঞ্জিত সাড়ি পরিধান করিয়াছেন, মুখে নথ, হস্তে কিছু কিছু অলঙ্কার, মস্তকটি কপোলদেশ পর্য্যন্ত অবগুণ্ঠিত। আমি অপেক্ষা করিতেছি, তিনি কিছু বলিবেন, আমি শুনিব, কিন্তু তিনি নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছেন, মধ্যে মধ্যে এক একবার আমার দিকে তাকাইয়া দেখিতেছেন। সাধুদিগকে প্রশ্ন করা আমার স্বভাববিরুদ্ধ, আমার সাধন-ভজন নাই, বদ্ধজীব, সাধুকে জিজ্ঞাসা করিবার মত কোন প্রশ্নই তো মনে উদিত হয় না। তথাপি সাধুর কথা শুনিবার জন্য উৎসুক হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। এইরূপে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইবার পর আমি অতি বিনীতভাবে বলিলাম, আমার একটি সংশয় আছে, তাঁহার অনুমতি পাইলে নিবেদন করিতে পারি। শ্রীললিতা সখী ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "জিজ্ঞাসা করুন, কিন্তু আমি উত্তর দিতে পার্ব্ব কিনা জানিনা।" আমি বলিলাম যে সাধুরা হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ ইত্যাদি নাম করিয়া থাকেন,

এই বত্রিশ অক্ষর মহামন্ত্র সাধুমুখে অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। যদি কেহ গুরুর নিকট দীক্ষিত না হইয়া এই সিদ্ধমন্ত্র জপ করে তাহা হইলে তাহার মনুষ্যজন্মের উদ্দেশ্য সফল হইবে কি? শ্রীললিতা সখী বহুক্ষণ ধরিয়া নানাবিধ উপাখ্যান, বিশেষতঃ অজামিল উপাখ্যান এবং শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করিয়া, অতি স্নেহপূর্ণ ও মধুর কণ্ঠে ধীরে ধীরে আমাকে তাঁহার মন্তব্য বুঝাইতে লাগিলেন, আমি বিস্মিত হইয়া শুনিলাম। যুক্তি ও শাস্ত্র-বাক্যের দ্বারা সমস্ত কথাগুলি সুশৃঙ্খলিত, উদাহরণ ও অন্যান্য বিষয়ের অবতারণায় বক্তব্য বিষয় হইতে অতিদূরে যাইয়া পড়িতেছেন, আমি আশঙ্কা করিতেছি হয়ত প্রধান সূত্র হারাইয়া গেল কিন্তু কি অসাধারণ বুদ্ধিশক্তির দ্বারা পুনরায় ঠিক বিষয়বস্তুতে আসিয়া পড়িতেছেন! তাঁহার প্রত্যেকটি কথা সত্য ও সাধনসিদ্ধ, ইহা আমি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে লাগিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন যে, কেবল-মাত্র হরিনামে মানুষ মুক্তি পাইবে না ইহা বলা যায় না, কিন্তু গুরুমুখশ্রুত মন্ত্রের শক্তি অনেক অধিক। নাবিক-বিহীন নৌকা হয়ত স্রোতোমুখে ভাসিতে ভাসিতে ঠিক কিনারায় আসিয়া লাগিতে পারে অথবা সামান্য ঝড় উঠিলে বিপথে চালিত হইতেও পারে। কিন্তু সুদক্ষ নাবিক থাকিলে নৌকা ঝড়বৃষ্টি কাটাইয়া তীরে নিশ্চয়ই উঠিবে। মনুষ্য জীবনেরও সেইরূপ একজন কাণ্ডারী প্রয়োজন। তিনি নিম্নলিখিত শ্লোকটি উল্লেখ করিলেন—

সাঙ্কেত্যং, পারিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণং অশেষাঘহরং বিদুঃ।

এবং বলিলেন, ইহাতে পাপক্ষয় হইবে বলা আছে তাহাও বড় কম শক্তি নয়, কিন্তু ভগবৎদর্শন হইবে তাহা উল্লিখিত নাই। বিষয়প্রসঙ্গে মনুষ্যজীবনের রহস্যের কথা বলিলেন। মাতৃগর্ভে জীব জন্মার্জ্জিত দুষ্কৃতিরাশি স্মরণ

করে, কৃতকর্ম্মের জন্য অনুতপ্ত হয়, আবার ঠিক মৃত্যুসময়ে জীবনের সমস্ত অপকর্ম্ম বায়স্কোপের মত মানস চক্ষুর সম্মুখে একের পর এক উপস্থিত হয়, তখনও মানুষ অনুতপ্ত হয়, কিন্তু কর্ম্মবেশ, দুর্ব্বলহৃদয় জীব সমস্ত অনুতাপ ভুলিয়া সংসারে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিয়া থাকে। বায়স্কোপের কথা বলিবার সময় শ্রীললিতা সখী বলিলেন যে, তিনি কখনও বায়স্কোপ দেখেন নাই, তবে বায়স্কোপের কথা লোকমুখে শুনিয়াছেন। এইরূপে আমার প্রশ্ন উপলক্ষ্য করিয়া এই বৈষ্ণব সাধু আমাকে তাঁহার ভজনসিদ্ধ শাস্ত্রসম্মত নানাবিধ কথা অতি স্নেহসহকারে শুনাইলেন, আমি প্রায় এক ঘণ্টারও অধিক এই সাধু সঙ্গ করিয়া ধন্য হইলাম। আমার সহিত কথাবার্ত্তা হইবার সময় একজন গেরুয়াবস্ত্রধারী, দীর্ঘশ্মশ্রু সাধু আসিয়া আমার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন এবং শ্রীললিতা সখীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। আমি লক্ষ্য করিলাম যে, সাধুকে প্রণাম করিতে দেখিয়াই শ্রীললিতা সখী যেন শিহরিয়া উঠিলেন এবং ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে "জয়গুরু" "জয়গুরু" কয়েকবার উচ্চারণ করিলেন। ইতিমধ্যে আমাকে যাহা বলিতেছিলেন তাহা শেষ হইল, সাধু প্রশ্ন করিলেন "ঈশ্বরকে কি করে পাওয়া যায়?" অতি সংক্ষেপে নীরসকণ্ঠে শ্রীললিতা সখী বলিলেন "গুরুকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তিনি যাহা বলিবেন তাহাই অভ্যাস করিলে ভগবানকে পাইবেন।" সাধু বলিলেন "মা, আমি আপনাকেও তো গুরু মনে করি, তাই তো এসেছি।" শ্রীললিতা সখী বলিলেন "সে তো শুধু মনে করা, সেটা তো সত্যি কিছু হ'লনা।" সাধু পুনঃ পুনঃ অন্যান্য প্রশ্ন উত্থাপন করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পুনঃ পুনঃ একই উত্তর হইতে লাগিল, "আমি এর বেশী আর কিছু জানি না।" আমি আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলাম যে, সাধুর প্রতি তিনি সদয় নহেন, যেন বিরক্তি সহকারে তাঁহার কথার উত্তর

দিতেছেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন, "ঐখানে পাঠ হচ্ছে শুনুন্ গিয়ে।" সাধু অবশেষে উঠিয়া যাইলেন, আমি আরও কিয়ৎক্ষণ শ্রীললিতা সখীর সহিত কথা কহিলাম, কেবলই মনে হইতে লাগিল আমার মহাসৌভাগ্য যে আমি সংসারী, বদ্ধজীব হইলেও আমার উপর তাঁহার বিরক্তি নাই, প্রতি বাক্যের ভিতর দিয়া যেন স্নেহ ও দয়া আমার উপর বর্ষিত হইতেছে। অবশেষে তাঁহাকে প্রণাম করিলাম এবং বিদায় লইবার সময় বলিলাম, "অনেকদিন থেকে আপনাকে দর্শন কর্ব্বার ইচ্ছা ছিল আজ সে আশা পূর্ণ হল। আজ আমার জীবনের একটা সার্থক দিন।" তিনি আমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিয়া বলিলেন, "আপনি ভক্তিমান লোক, আপনার সঙ্গে এই সমস্ত কথা আলোচনা করে আমার নিজের কত উপকার হ'ল।" আমি লজ্জায় অধোবদন হইয়া বৈষ্ণবোচিত বিনয় দর্শন করিয়া সেই কথা ভাবিতে ভাবিতে সমাজবাড়ি পরিত্যাগ করিলাম।

২৮শে অক্টোবর, রবিবার অতিপ্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিয়া নীচেয় আসিলাম এবং মুখহাত প্রক্ষালন করিয়া রাস্তার সম্মুখের বারান্দায় দাঁড়াইয়া জনস্রোত দেখিতে লাগিলাম। কত নরনারী অবিরত চলিতেছে তাহার নির্ণয় নাই। ইহাদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অধিক। কেহ বা মালা জপ করিতে করিতে যাইতেছে, কেহ বা সাজিপূর্ণ ফুল লইয়া যাইতেছে, কেহ বা আমাদের বাড়ীর বাম পার্শ্বে অদ্বৈত মন্দিরে প্রবেশ করিতেছে, আবার কেহ কেহ পরিচিত লোক দেখিয়া সংসারের সুখদুঃখ আলোচনা করিতেছে। ক্বচিৎ কখনও ২।১টি কিশোরী লক্ষ্য হইতেছে, স্নান করিয়া মাতা অথবা অন্য আত্মীয়ার সহিত নৈবেদ্য লইয়া যাইতেছে। কোন কোন কণ্ঠিধারী, কৌপীন-পরিহিত বৈষ্ণব দেখিতেছি, মালা জপ করিতে করিতে চলিয়াছেন, পথে জনস্রোতের দিকে দৃষ্টি নাই।

হঠাৎ নিকটস্থ মন্দিরের একজন গোস্বামী মহাশয় পথ দিয়া যাইতে যাইতে আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "শ্রীগৌরাঙ্গের মঙ্গল আরতি দেখিবেন আসুন, ইহা দেখিবার জন্য দেশদেশান্তর হইতে লোক আসিয়া থাকে।" পূর্ব্বদিন তাঁহার সহিত আমার পরিচয় হইয়াছিল, আমি তাঁহার কথা শুনিয়া তাঁহাকে অনুসরণ করিলাম। শ্রীগৌরাঙ্গ মন্দির আমাদের বাড়ীর ডানদিকে, ঠিক্ একখানি বাড়ীর পরেই। মন্দির প্রাঙ্গণে অসংখ্য নরনারী সমবেত হইয়াছিলেন, আরতি তখন আরম্ভ হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে বৈষ্ণব-পরিবেষ্টিত একস্থানে দাঁড়াইয়া আমি আরতি দেখিতে লাগিলাম। মনে হইল শ্রীমহাপ্রভু আমাকে দয়া করিয়া এইস্থানে আহ্বান করিয়াছেন, আজ তাঁহার প্রভাত-আরতি-রঞ্জিত শ্রীমুখ দেখিয়া ধন্য হইব। আরতি দেখিয়া, কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া, অসংখ্য বৈষ্ণব পদধূলি-রঞ্জিত প্রাঙ্গণে প্রণাম করিলাম এবং শান্ত ও উজ্জ্বল মন লইয়া বাড়ী ফিরিলাম।

বেলা প্রায় ৯টার সময় আমি, গুণেন্দ্র ও ভুবন গঙ্গার অপরপারে মায়াপুর যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। পূর্ব্ব হইতেই সেবায়েৎ মহাশয় নৌকা বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। যাত্রী আমরা ছয় জন—আমি গুণেন্দ্র, ভুবন, গোবিন্দজীর মন্দিরনিবাসী একজন পথপ্রদর্শক বৈষ্ণব, এবং সেবায়েৎ মহাশয়ের পুত্র এবং শ্যালক। সেবায়েৎ মহাশয় সংসার-ত্যাগী, তবে মধ্যে মধ্যে কোন কোন আত্মীয় আসিয়া নিজব্যয়ে এখানে কিছুদিন বাস করিয়া থাকেন। পুত্রটি তখন কৃষ্ণনগর কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র, সে পূজাবকাশের সময় মন্দিরে আসিয়া বাস করিতেছিল, শুনিলাম তাহার খুল্লতাত তাহার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেন। শ্যালকটি মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্র। পথ দিয়া গঙ্গাতীরের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে আমি লক্ষ্য করিলাম যে, কণ্ঠির মালাধারী, কৌপীন-পরিহিত

একজন তরুণবয়স্ক বৈষ্ণব পথের ধারে নিক্ষিপ্ত অন্নব্যঞ্জন হইতে কিছু কিছু বাছিয়া লইয়া ভক্ষণ করিতেছেন। আমি সেইদিকে গুণেন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলাম এবং বৈষ্ণবকে চার আনা পয়সা দিতে বলিলাম। গুণেন্দ্র তাঁহাকে চার আনা পয়সা দিতে চাহিলে বৈষ্ণব মৃদু হাস্যসহকারে তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন, আমি লক্ষ্য করিলাম তাঁহার মুখ যেন ঈষৎ লজ্জিত। গুণেন্দ্র বারংবার অনুরোধ করিল, বৈষ্ণব বারংবার দৃঢ়তার সহিত দান গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন এবং অন্য পথ দিয়া চলিয়া যাইলেন। আমি ভাবিতে ভাবিতে গঙ্গাতীরে উপনীত হইলাম। নৌকা প্রস্তুত ছিল, আমরা উঠিয়া বসিলাম। প্রশান্ত গঙ্গা, কোথাও বা দুই একটি নৌকা যাত্রী লইয়া অথবা মাছ ধরিবার জন্য ধীরে ধীরে যাইতেছে। আমাদের নৌকা গঙ্গা দিয়া আসিয়া একটি খালের মধ্যে প্রবেশ করিল। খালের মুখে জেলেরা জাল পাতিয়া মাছ ধরিতেছে। আমরা দেখিলাম, একটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎকায় মৎস্য জালে পড়িয়াছে, দেখিতে দেখিতে সে জাল ছিঁড়িয়া পলাইয়া গেল। মাছ দেখিয়া গুণেন্দ্রের মহা উৎসাহ আবার ছিন্নজাল মৎস্য পলাইয়া গেলে দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল। গঙ্গার তীরে তীরে কাদাখোঁচা পাখী চরিয়া বেড়াইতেছে, গুণেন্দ্র উৎসাহ সহকারে বলিয়া উঠিল, "বন্দুকটা থাকলে এক গুলিতেই অনেকগুলো মারা যেত।" আমি তাহার মাছ এবং পাখী সম্বন্ধে মন্তব্য শুনিয়া মনে মনে হাসিলাম যে, গঙ্গাবক্ষে বসিয়া মায়াপুরের মন্দিরের প্রতি নিবদ্ধ-দৃষ্টি গুণেন্দ্র যৌবনসুলভ হিংসাভাব পরিত্যাগ করিতে পারিতেছে না, অথচ মাছ-মাংসের প্রতি ইহার বিশেষ আকর্ষণ নাই, ভবানীপুরের বাড়ীতে সমস্ত কার্ত্তিকমাসব্যাপী শ্রীভাগবতপাঠ হইবে, সেখানে মৎস্য প্রবেশ করিবে না, সাত্ত্বিক নিরামিষ ভোজনই করিতে হইতেছে বলিয়া ইহার মনে কোন ক্ষোভ নাই। খালের জল গভীর নয়, শুনিলাম ১০।১৫

দিনের মধ্যেই খালটি একেবারেই শুকাইয়া যাইবে। মাঝিরা স্থানে স্থানে অবতরণ করিয়া নৌকা ঠেলিয়া লইয়া চলিল। একঘণ্টার উপর সময় নৌকায় যাইতে হইল, পরে নৌকা হইতে নামিয়া প্রায় দশ মিনিট হাঁটিয়া আমরা মায়াপুর মন্দিরে পৌঁছিলাম।

মায়াপুর গঙ্গার পূর্ব্বতীরে অবস্থিত এবং এই স্থানের মন্দির-নির্ম্মাণকারী বৈষ্ণব সম্প্রদায় বলেন যে, ইহাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মস্থান এবং লীলাক্ষেত্র,—বর্ত্তমানে নবদ্বীপ বলিয়া খ্যাত তীর্থস্থান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলাক্ষেত্র নহে। গঙ্গার গতিপরিবর্ত্তনের সহিত আদি নবদ্বীপের অধিকাংশ স্থান নদীগর্ভে অন্তর্হিত হইলে নবদ্বীপবাসীগণ বর্ত্তমান নবদ্বীপে আসিয়া বাস কবিতে আরম্ভ করেন। মায়াপুরের যে কিয়দংশ গঙ্গাগর্ভে বিলীন হয় নাই তাহার মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর জন্মস্থান, শ্রীবাস অঙ্গন, প্রভৃতি স্থানগুলি এখনও বিদ্যমান। সমস্ত দেখিয়া ও শুনিয়া আমার মনে হইল মায়াপুরের কিয়দংশ যে শ্রীচৈতন্য প্রভুর জন্মস্থান এবং লীলাক্ষেত্র সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রধান মন্দিরে শ্রীগৌরাঙ্গদেব, শ্রীলক্ষ্মীদেবী ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার বিগ্রহ দেখিলাম। নিকটেই একটি মন্দিরে শচীমাতার বিগ্রহ, শিশু নিমাই তাঁহার নিকট শায়িত। বৈষ্ণবগণ বলিলেন যে, এই স্থানেই শ্রীচৈতন্য প্রভুর জন্ম হইয়াছিল। শ্রীবাস অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত মন্দির, খোলভাঙ্গার মাঠ, প্রভৃতি সেই যুগের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান দেখিলাম, দূরে দূরে মন্দির দেখিলাম, শ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি, বিগ্রহ সেই সমস্ত মন্দিরে স্থাপিত। পথ দিয়া অগ্রসর হইতে হইতে লক্ষ্য করিলাম বালকেরা বই লইয়া মায়াপুরের স্কুলে পড়িতে যাইতেছে। একটি বালককে পূজার অবকাশের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, সে বলিল পূজার ছুটি বেশীদিন হয় না, বর্ষার সময় প্রায় ২॥০ মাস স্কুল বন্ধ থাকে। ছেলেটি নিকটবর্ত্তী বামুনপুকুর গ্রাম হইতে আসিতেছিল।

একটি মন্দিরে আরতি হইতেছিল, মন্দির প্রাঙ্গণে দুইটি কিশোরবয়স্ক বৈষ্ণব বালক কীর্ত্তন করিতেছিলেন, মন্দিরের ভিতর আর একটি চশমা-পরিহিত বৈষ্ণব যুবক আরতি করিতেছিলেন। ইঁহারা সকলেই কৌপীনপরিহিত, বৈষ্ণবের মালা ইঁহাদের কণ্ঠে বিরাজ করিতেছিল। চশমা-পরিহিত বৈষ্ণব যুবকটি কত যত্ন ও ভক্তিসহকারে আরতি করিতেছেন লক্ষ্য করিলাম। চামর দিয়া যখন বিগ্রহকে ব্যজন করিতেছিলেন তখন চামরটি তাঁহার মৃদুহস্ত সঞ্চালনে যেন পুষ্পের মত বিকশিত হইয়া চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল, চামরে যেন বৈষ্ণব পুরোহিতের শুভ্র আত্মা প্রতিফলিত হইতেছিল, হৃদয়ের সমস্ত ভক্তি ও আত্মনিবেদন যেন সেই চামরের প্রতি হিল্লোলে ফুটিয়া উঠিতেছিল। এই যুবকের মুখ আমি লক্ষ্য করিলাম, শিক্ষা এবং সংস্কৃতির একটা ছাপ তাঁহার সমস্ত মুখে পরিব্যাপ্ত। আমার মনে হইল, ইনি বিশ্ব-বিদ্যালয়েও শিক্ষালাভ করিয়াছেন, যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের তুচ্ছ অর্থকরী বিদ্যা ইঁহার বর্ত্তমান ধর্ম্মজীবনে একেবারেই নিষ্ফল এবং অর্থহীন। মন্দিরের প্রাঙ্গণে দুইজন বৈষ্ণব কীর্ত্তন করিতেছিলেন, বয়স ১৭।১৮ বৎসরের অধিক নহে,—গৌরবর্ণ দেহ, আকর্ণবিস্তৃত নয়ন, একটা শুভ্র পবিত্রতা সমস্ত মুখমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করিয়া বিরাজ করিতেছিল। মুখের প্রতি লোমকূপে যেন একটা করুণ উদাস ভাব লক্ষ্য করিলাম। অতি মধুর কণ্ঠে ইঁহারা গান গাহিতেছিলেন। আকৃতি দেখিয়া বাঙ্গালী কিনা আমার সন্দেহ হইল, উভয়ের আকৃতির সামঞ্জস্য দেখিয়া সহোদর ভ্রাতা বলিয়া মনে হইল। এক একবার তাঁহাদের প্রশান্ত উদারদৃষ্টি আমার মুখের উপর পড়িতেছিল, আমার সহিত চোখোচোখি হইতেছিল, আমার সমস্ত শরীর যেন সেই স্নিগ্ধদৃষ্টিতে জুড়াইয়া যাইতেছিল। আমি দেখিতেছিলাম আর ভাবিতেছিলাম ইঁহারা এই কিশোর বয়সেই

শ্রীগৌরাঙ্গের জন্য সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়াছেন, এই বয়সে জিহ্বা, কর্ণ, চক্ষু, প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ কত ভোগসুখের লালসা করিয়া থাকে, আজ ইঁহাদের সমস্ত ইন্দ্রিয় নিগৃহীত, সমস্ত বিষয়ভোগ-বাসনা ভাল করিয়া মুকুলিত হইবার পূর্ব্বেই ছিন্নবৃন্ত হইয়া কোথায় বিনষ্ট হইয়াছে। হয়ত ইঁহারা আরও ৫০।৬০ বৎসর বাঁচিবেন, বাসনাবর্জ্জিত জীবনের এই সুদীর্ঘ পথ কিসের আশায়, কি আনন্দে অতিবাহিত করিবেন তাহা ইঁহাদের জীবনদেবতাই একমাত্র জানেন। আমি নিবিষ্ট মনে দেখিতেছি, শুনিতেছি ও ভাবিতেছি এমন সময়ে গুণেন্দ্র আমাকে আকর্ষণ করিল, সময় হইয়াছে মন্দির পরিত্যাগ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে। ধীরে ধীরে পথ ধরিয়া শ্রীচৈতন্য মন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম এবং তথায় পরমান্ন প্রসাদ গ্রহণ করিলাম। এই পরমান্ন প্রসাদের অপূর্ব্ব স্বাদ, জীবনে পূর্ব্বে কখনও এরূপ পরমান্ন গ্রহণ করি নাই। নৌকা করিয়া বেলা প্রায় ১২॥০টার সময় নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিলাম।

নবদ্বীপ দেখিলাম। পোড়া-মা-তলা, বুড়ো শিবতলা, প্রায় আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে স্থাপিত মণিপুরী সুবর্ণ মন্দির দেখিলাম। আরও দেখিলাম ঊর্দ্ধদৃষ্টি, বিষয়কলুষবর্জ্জিত, আদর্শ বৈষ্ণব, সহরের কোলাহল তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতেছে না, যেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমবন্যায় বিধৌত সেই পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বের ভাগ্যবান নবদ্বীপবাসী। আবার বৈষ্ণবলিঙ্গধারী, তিলকমণ্ডিত গোস্বামী দেখিলাম যাঁহারা বাহিরের বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া অন্তরে বিষয়ভোগবাসনায় আকণ্ঠ নিমগ্ন, যাঁহাদের চিত্র দেশে দেশে, যুগযুগান্তরে চিরদিন অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে, সেই সাধুবেশী ধর্ম্মব্যবসায়ী, দেবতাকে হাটে হাটে বিক্রয় করা যাঁহাদের জীবিকা। কোন গোস্বামী দেখিলাম নিরীহ উড়িষ্যাবাসী তীর্থযাত্রী

নরনারীকে মন্দিরপ্রাঙ্গণে অতি মধুর বাক্যে প্রবেশ করাইয়া দিতেছেন, দেবতাকে দর্শন করিয়া তাহারা যখন বাহির হইয়া আসিতেছে তখন গোস্বামীর ভিন্ন মূর্ত্তি, লোভের হিংস্রতায় কণ্ঠের মালা মলিন হইয়া গিয়াছে, মুখের ভ্রূকুটি সমস্ত শরীরটিকে কুৎসিত করিয়া তুলিয়াছে। যাত্রীগণ দরিদ্র, কম্পিত হস্তে আট আনা পয়সা বাহির করিল, গোস্বামী হিসাব করিয়া বুঝাইয়া দিলেন ১৵০ দিতে হইবে, ব্যাঘ্রের মত পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, মলিন বস্ত্রখণ্ড খুলিয়া একটাকা দিয়া দরিদ্র তীর্থযাত্রীগণ নিষ্কৃতি পাইল। নবদ্বীপের রাস্তাঘাট ভগ্ন ও অপরিসর, দরিদ্র মিউনিসিপ্যালিটী ইহার অধিক আর কিছুই করিতে পারে না। কিন্তু সমস্ত দীনতা, লোভ, কদর্য্যতা ও বিষয়বাসনা-কলুষিত বায়ুর ঊর্দ্ধে তৃণ হইতেও সুনীচ, তরু অপেক্ষাও সহিষ্ণু, অমানী অথচ মানদ শত শত বৈষ্ণবের আত্মার ভাস্বর দীপ্তি নবদ্বীপের আকাশে বিরাজমান, সেই দীপ্তিতে নবদ্বীপ সমুজ্জ্বল, হিংসা, লোভ, বিষয়বাসনার নিবিড়তম অন্ধকারও সেই জ্যোতিকে ম্লান করিতে পারে নাই। শ্রীগৌরাঙ্গ-বিরাজিত, সাধুপদরেণুচিহ্নিত নবদ্বীপ তাই এখনও ধন্য।

২৯শে অক্টোবর, সোমবার সকালের ট্রেনে যাত্রা করিয়া বেলা প্রায় ১১৷৷০টার সময় কলিকাতায় পৌছিলাম। নবদ্বীপে যে কয়দিন ছিলাম ততদিন শ্রীমান গুণেন্দ্র আমাকে সর্ব্বক্ষণ যত্ন করিয়াছিল, আমার অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রয়োজনের প্রতিও তাহার দৃষ্টি ছিল। আমি সামান্য শিক্ষক, ছাত্র ধনীবংশসম্ভূত, তথাপি সে আমার সুখস্বচ্ছন্দতার প্রতি এতই মনোযোগী ছিল যে, আমি সময় সময় লজ্জিত হইতাম। নবদ্বীপে আহারাদির সমস্ত ব্যয় সে বহন করিয়াছিল, আমি কেবলমাত্র যাতায়াতের ট্রেন ভাড়া ও দেবদর্শনের প্রণামী দিয়াছিলাম। নবদ্বীপে আমার মোট ৩৮৲ টাকা খরচ হইল।

(২৯)

আরতি ভাগলপুরে যাইয়া ভালই আছে, মধ্যে মধ্যে তাহার চিঠিপত্র পাইতেছি। আরতি আমার "বড় চিঠি" পড়িতে ভালবাসে, প্রায়ই তাহার চিঠিতে "বড় চিঠি"র দাবী থাকে, সুতরাং নানাবিধ কাজের মধ্যেও তাহাকে সময় সময় "বড় চিঠি" লিখিতে হয়। আরতি না থাকায় কাজ আমার অনেক বাড়িয়াছে। কলেজে যাওয়া, ছাত্র পড়ান তো আছেই, তাহা ছাড়া যে সমস্ত কাজ বহুদিন করি নাই তাহাও এখন করিতে হইতেছে। ঝি সুবিধা বুঝিয়া প্রায়ই কামাই করিতেছে, রাঁধুনী নানাবিধ জিনিষ চুরি করিয়া সরিয়া পড়িয়াছে। কোন কোন দিন নিজেই সম্মার্জ্জনীহস্তে ঘর পরিষ্কার করিতেছি, কলসীতে খাবার জল কল হইতে ধরিতেছি, জুতা ঝাড়িতেছি, জিনিষপত্র রৌদ্রে দিতেছি, সকালবেলা ঘরের দরজা জানালা খুলিয়া দিতেছি, সন্ধ্যাবেলা বন্ধ করিতেছি। ছোট ছোট কাজ কত করিতে হয় তাহার নির্ণয় নাই। রাঁধুনী চলিয়া যাওয়ার পর হইতে ছোট ডাক্তারবাবুর (সুরেন্দ্রবাবু) বাড়ীতে দুইবেলা আহার করিতেছি। ডাক্তার বাবুর আদর-যত্নের সীমা নাই, নিজে খোঁজ-খবর লইতেছেন, যথা-সময়ে তাঁহার পাচক অন্নব্যঞ্জন আমার বাড়ীতে দিয়া যাইতেছে। আমি তাঁহার যত্নের জন্য লজ্জিত হই কিন্তু এখন অন্য কোন উপায় না থাকায় ডাক্তারবাবুকে বিরক্ত করা ছাড়া গত্যন্তর দেখি না। ডাক্তারবাবু মহাশয় ব্যক্তি,—আমার খাইবার উপযুক্ত জিনিষ তাঁহাকে দেওয়া চলে না। যদি কোনদিন মাছ অথবা মাংস কিনিয়া দিই, ডাক্তারবাবু পাঁচবার আসিয়া তাহার প্রতিবাদ করেন। এইরূপ সদাশয় ব্যক্তির নিকট আমার ঋণভার অনবরত বর্দ্ধিত হইয়াই চলিয়াছে,

নিজে কখনও তাঁহার কিছু উপকার করিয়া ঋণভারের অনুমাত্রও লাঘব করিব তাহার কোন সম্ভাবনা নাই।

১লা নভেম্বর শারদীয়া পূজার পর কলেজ খুলিল।

(৩০)

৪ঠা নভেম্বর রবিবার বেলা প্রায় ১টার সময় পানিহাটি যাইলাম। এই স্থানে গঙ্গাতীরে বটবৃক্ষমূলে প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কার্ত্তিক মাসে কৃষ্ণা দ্বাদশীর দিন বৃন্দাবন যাত্রার পথে অবতরণ করিয়াছিলেন। সেইজন্য প্রতিবৎসর কার্ত্তিকমাসের কৃষ্ণাদ্বাদশীর পরের রবিবারে এই বটবৃক্ষমূলে বৈষ্ণব সম্মিলনী হইয়া থাকে এবং তদুপলক্ষে ভজন কীর্ত্তন হয়। আমি পূর্ব্বে একবার এই পানিহাটিতে গিয়াছিলাম তাহা যথাস্থানে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। এবার আকর্ষণের অন্য কারণ ছিল। বৈষ্ণব মহাপুরুষ শ্রীরামদাস বাবাজীর কথা বহু জনমুখে শুনিয়াছিলাম এবং তাহার নামকীর্ত্তনের অপূর্ব্ব শক্তির কথাও আমার শ্রুতিগোচর হইয়াছিল। এই বৈষ্ণব-প্রবরকে দর্শন করিবার আকাঙ্খা বহুদিন হইতে মনে উদিত হইতেছিল, অনেক লোককে বলিয়াছিলাম যে, শ্রীরামদাস বাবাজীর কীর্ত্তন হইলে যেন আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। কিন্তু বহুদিন গত হইল, তাঁহার দর্শন লাভ হইল না। এইবার কয়েকদিন পূর্ব্বে বৈষ্ণবভক্ত রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় আমাকে বলিলেন যে, পানি-হাটিতে উৎসব উপলক্ষ্যে শ্রীরামদাস বাবাজীর কীর্ত্তন হইবে এবং ৪ঠা নভেম্বর রবিবারে তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন। ঐদিন ট্রেনে মোটরবাসে সাধারণতঃ এত ভিড় হয় যে, কলিকাতা হইতে পানিহাটি যাইবার চেষ্টা করিয়াও ইতিপূর্ব্বে সফলকাম হইতে পারি নাই। আমি নগেন্দ্রবাবুকে সেই কথা বলিলাম, তিনি হাসিয়া উত্তর

দিলেন যে, ইচ্ছা থাকিলে উপায়ের অভাব হইবে না। আমি বৈষ্ণবের এই আশ্বাসবাণীতে নিশ্চিন্ত হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

৪ঠা নভেম্বর, রবিবার বেলা প্রায় ১টার পূর্ব্বে নগেন্দ্রবাবুর বাড়ী ১১৪, আপার সার্কুলার রোডে উপস্থিত হইলাম। নগেন্দ্রবাবুর ছেলে ডাক্তার, তাঁহার মোটরগাড়িতে করিয়া নগেন্দ্রবাবু, তাঁহার শ্যালক শরৎবাবু ও আমি বেলা প্রায় ১-৪০মিনিটের সময় পানিহাটিতে উপস্থিত হইলাম। চতুর্দ্দিকে জন সমাগম হইয়াছে, স্থানে স্থানে কীর্ত্তন হইতেছে—'গৌর এল পানিহাটিতে।' সেখানে কলিকাতা চালদাবাগান বৈষ্ণব সম্মিলনীর কোন কোন ভক্তকে দেখিতে পাইলাম। বটবৃক্ষের ছায়ায় তৃণভূমিতে কিছুক্ষণ বসিবার পর নগেন্দ্রবাবু আমাকে নিকটস্থ মন্দিরে শ্রীগৌরাঙ্গমূর্ত্তি ও গঙ্গাতীরস্থ অপর একটি মন্দিরে শ্রীজগদ্ধাত্রীমূর্ত্তি ও শ্রীশিবমূর্ত্তি দেখিতে আহ্বান করিলেন। সেই স্থান হইতে ফিরিয়া মাধবীলতাকুঞ্জের মধ্যে শ্রীরাঘব পণ্ডিতের মহাসমাধি মন্দির ও তাঁহার পূজিত শ্রীমদনমোহন বিগ্রহ দর্শন করিলাম। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীমহাপ্রভুর পানিহাটি আগমনের বিশেষ বর্ণনা আছে এবং রাঘব মন্দিরে শ্রীচৈতন্যদেবের নিত্য আবির্ভাব হয় ইহাও উল্লিখিত আছে। শ্রীশচীমাতার রন্ধনে, শ্রীবাস অঙ্গনে, শ্রীনিত্যানন্দের নর্ত্তনে এবং শ্রীরাঘব ভবনে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নিত্য আবির্ভাব হইয়া থাকে। শ্রীরাঘব মন্দির হইতে বটবৃক্ষমূলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। সেখানে রজ্জুবেষ্টিত একটি সঙ্কীর্ণ স্থান শ্রীরামদাস বাবাজীর কীর্ত্তনের জন্য নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে দেখিলাম। নগেন্দ্রবাবু আমাকে সেই স্থানে বসিয়া অপেক্ষা করিতে বলিলেন।

প্রায় একঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছি। ছায়াসুশীতল তৃণাচ্ছাদিত ভূমিখণ্ডে অসংখ্য নরনারী সমবেত হইয়াছে। বটবৃক্ষমূলে

চত্বরের উপর শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দের বৃহৎ তৈলচিত্র স্থাপিত রহিয়াছে। আমি মনে মনে শ্রীহরির নাম স্মরণ করিতেছি ও চতুর্দ্দিকে তাকাইয়া দেখিতেছি। সম্মুখে গঙ্গার দিকে মুখ করিয়া আমি বসিয়া আছি, স্বচ্ছ জাহ্নবীবারি আমার দৃষ্টিগোচর হইতেছে। আমার ঠিক সম্মুখেই অনেক স্ত্রীলোক বসিয়া আছে, কিশোরী, যুবতী, বৃদ্ধা। কাহারও কাহারও গলায় কণ্ঠির মালা, কেহ কেহ মালাজপ করিতেছে, নামের সহিত জিহ্বার মৃদু সঞ্চালন মুখের উপরে পরিস্ফুট। একটি তন্বী কিশোরীকে লক্ষ্য করিলাম, গৌরাঙ্গী, উজ্জ্বলরঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করিয়াছে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিভিন্ন স্থান অলঙ্কার শোভিত, শুভ্র নিটোল গ্রীবাদেশে সংলগ্ন কণ্ঠির মালা এই কিশোরীর সৌন্দর্য্য যেন শতগুণে বর্দ্ধিত করিয়াছে। নিশ্চল হইয়া বসিয়া আছে, আমি ভাবিতেছি কি আনন্দের আশায় এই বালিকা এমন করিয়া জনসমুদ্রের মধ্যে অপেক্ষা করিতেছে! আর একজন আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। এই স্ত্রীলোকটি বিধবা, মধ্যবয়স্কা, পরিধানে থানধুতি, গলায় কণ্ঠির মালা, বক্ষাভ্যন্তরে লুক্কায়িত জপের মালা মুহুর্মুহুঃ সঞ্চালিত হইতেছিল। পার্শ্ববর্ত্তিনী কোন নারী কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে মৃদুহাস্য করিয়া সংক্ষেপে তাহার উত্তর দিয়া এই বৈষ্ণবী আবার মালার উপর মনঃসংযোগ করিতেছিল—উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, দীর্ঘাকার, আয়তচক্ষু, সমস্ত মুখমণ্ডলে একটা অনন্য-সুলভ গৌরবচিহ্ন, শুভ্র দন্তপংক্তি, যেন মুক্তার মত উজ্জ্বল, সুশোভিত ও ঘনসন্নিবিষ্ট। তাহার দীন বৈষ্ণব বেশ, বিধবার শুভ্রবস্ত্র ও অনলঙ্কৃত দেহের ভিতর দিয়া কি মহিমাই যে সেদিন ফুটিয়া বাহির হইতেছিল তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব। আমার দক্ষিণদিকে কিছুদূরে একজন বৃদ্ধ বৈষ্ণব কৌপীন পরিধান করিয়া নিশ্চল ও সমকায়শিরগ্রীব হইয়া বসিয়াছিলেন, চক্ষুদ্বয় মুদ্রিত, নিরন্তর নামজপে সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি

যেন নিমগ্ন। অনেকবার তাঁহার দিকে চাহিলাম, একবারও চক্ষু উন্মীলন করিতে দেখিতে পাইলাম না। এতো নরনারী সমবেত হইয়াছে, কোলাহল নাই, একটা কিসের অপেক্ষায় এই জনসমুদ্র নিস্তব্ধ। মাথার উপরে বটবৃক্ষের পত্রসঞ্চালনের মর্ম্মরধ্বনি, দূরাগত মনুষ্যকণ্ঠের অস্পষ্ট শব্দ, আমার ক্রোড়ের সম্মুখে ছিন্নবস্ত্রপরিহিত, শ্মশ্রুকণ্টকিতমুখ এক বৃদ্ধ বৈষ্ণব, মৃদু বায়ু সঞ্চালনে শরীর যেন স্নিগ্ধ হইতেছে, আমার মনের ভিতর নামজপ চলিতেছে তথাপি মন যেন কি এক অস্পষ্ট আশায় নিরন্তর চঞ্চল। আমিও সকলের মত প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া আছি।

প্রায় একঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া থাকিবার পর বেলা ৩৷৹টার সময় শ্রীরামদাস বাবাজী বৈষ্ণববৃন্দ পরিশোভিত হইয়া কীর্ত্তন সহযোগে বটবৃক্ষকে প্রদক্ষিণ করিয়া রজ্জুগণ্ডীচিহ্নিত স্থানে আসিয়া উপবেশন করিলেন। আমি সমস্ত ভুলিয়া সহস্র চক্ষু দিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে লাগিলাম। তেজঃপুঞ্জদেহ, মুখে এক অপূর্ব্ব স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ। পাঠ ও কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। শ্রীরামদাস বাবাজীর সম্মুখে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ প্রসারিত, পার্শ্বে তাঁহার বৈষ্ণব শিষ্যবৃন্দ, আমি বাবাজীর দক্ষিণ পার্শ্বে মাত্র ৫।৬ হাত দূরে উপবিষ্ট, চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট অথবা দণ্ডায়মান জনসমুদ্র। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের মধ্যলীলায় ষোড়শ পরিচ্ছেদের "প্রভুর হইল ইচ্ছা যাইতে বৃন্দাবন" হইতে আরম্ভ করিয়া "সেই নৌকা চড়ি প্রভু আইলা পানিহাটি" পর্য্যন্ত সমস্ত শ্লোকগুলি সুর করিয়া বাবাজী অন্যান্য বৈষ্ণবগণের সহিত কীর্ত্তন করিলেন এবং মধ্যে মধ্যে স্বরচিত পদাবলীতে ভাব ও সুর সংযোগ করিয়া সমস্ত বিষয়-বস্তুটিকে অতি মধুর ও হৃদয়গ্রাহী করিয়া তুলিলেন। মানুষের এত মধুর ও ভাবে দ্রবীভূত স্বর পূর্ব্বে আর কখনও শুনি নাই। কীর্ত্তন আরম্ভ

হইবার অল্পক্ষণ পরেই লক্ষ্য করিলাম যে, বাবাজীর শরীর মধ্যে মধ্যে শিহরিয়া উঠিতেছে। ক্রমশঃ আঁখিধারা গণ্ডদেশ প্লাবিত করিতে লাগিল এবং প্রেমবিহ্বল কণ্ঠে হঠাৎ উচ্চশব্দ করিয়া বাবাজী কণ্ঠরোধকারী ভাবোচ্ছ্বাসকে দমন করিবার চেষ্টা কবিতে লাগিলেন। কিন্তু সে ভাব কি দমন করা যায়! এক একবার সমস্ত দৃঢ় চেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া হাহাকার রোদনধ্বনি বাবাজীর মুখ হইতে নির্গত হইতেছে, বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠ যেন ক্ষীণ ও কম্পিত হইয়া উঠিতেছে। বাবাজী কীর্ত্তনের সুরে বলিতেছিলেন এই বটবৃক্ষমূলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আসিয়াছিলেন ইহা ধ্রুব সত্য, বাবাজী তাঁহার শ্রীগুরুমুখে ইহা শ্রবণ করিয়াছেন। জাহ্নবী, বটবৃক্ষ ও পানিহাটি আজিও তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। যখনই "শ্রীগুরু" শব্দটী উচ্চারণ করিতেছিলেন তখনই ভাব, শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে মস্তক অবনত করিয়া বাবাজী যেন অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বিহ্বল হইয়া পড়িতেছিলেন। বিশেষ বিশেষ শ্লোক গাহিবার সময় বাবাজী যেন ভাবে অভিভূত।

চণ্ডাল পবিত্র যাঁর শ্রীনাম শ্রবণে
হেন তোমার এই জীব পাইল দর্শনে॥

এই শ্লোকটি কীর্ত্তন করিবার সময় বাবাজীর যে ভাবান্তর দেখিলাম তাহা অবর্ণনীয়। কৃত্রিমতার লেশমাত্র নাই, যেন আপনি গ্রন্থপাঠ করিয়া কীর্ত্তন করিয়া আপনাকেই শুনাইতেছেন, এক বিশাল জন সমুদ্র যে তাঁহাকে ঘিরিয়া বিরাজ করিতেছে সে দিকে লক্ষ্য নাই। কত নরনারী, কৌপীনধারী বৈষ্ণব, তাঁহার ভাবোদ্বেলিত হৃদয়ের বীচিমালা স্পর্শে আত্মহারা হইয়া রোদন করিতেছে সেদিকে বাবাজীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতেছে না। কীর্ত্তন আরম্ভ হইবার কিছুক্ষণ পরে নৌকা যোগে তাঁহার আশ্রমের কয়েকটি বৈষ্ণব আসিয়া উপস্থিত হইলেন, নৌকার মন্থরগতির

জন্য তাঁহারা সময়মত পৌঁছিতে পারেন নাই। সকলে আসিয়া বাবাজীর চতুঃস্পার্শ্বে স্থান করিয়া লইলেন, বাবাজী একবারও সেইদিকে তাকাইয়া দেখিলেন না। আমার সম্মুখে উপবিষ্ট বৃদ্ধ বৈষ্ণব বহুক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়াছিলেন, চক্ষু দিয়া অবিরল ধারা নির্গত হইতেছিল। কীর্ত্তনের মধ্যভাগে যখন সমস্ত বায়ু ঘন ও ভারী হইয়া উঠিল তখন এই বৃদ্ধ বৈষ্ণব আর ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিলেন না, কীর্ত্তনের তালে তালে হস্তপদাদি ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করিতে করিতে জড়ের মত নিশ্চল হইয়া লম্বমান দেহে স্থির হইয়া পড়িলেন, চক্ষুদ্বয় সম্পূর্ণ নিমীলিত, মুখে ফেনোদ্গম হইতে লাগিল। শ্রীরামদাস বাবাজীর কোনদিকে দৃষ্টি নাই—ঋজু ও নিশ্চল হইয়া গ্রন্থের দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি বসিয়া আছেন। একঘণ্টা পঞ্চাশমিনিট তাঁহার কীর্ত্তন হইল, অথচ এই দীর্ঘ সময়ের ভিতর দেহের কোন চঞ্চলতা দেখিলাম না, মনও যেন শ্রীহরিদাসের মত "নিজ নেত্র দুই ভৃঙ্গ মুখ পদ্মে" দিয়া শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করিতেছে। কেবল লক্ষ্য করিলাম এই দুই ঘণ্টার মধ্যে একবার গঙ্গার কথা উল্লেখ করিবার সময় চক্ষু তুলিয়া প্রবাহিতা জাহ্নবীর দিকে তাকাইলেন, প্রেমধারাবিধৌত আরক্ত চক্ষুদ্বয় আমার দৃষ্টিগোচর হইল। এমন মধুর কীর্ত্তন কখনও শুনি নাই, এমন বৈষ্ণব আর কখনও দেখি নাই। বেলা ৩৷৷৹টা হইতে ৫টা ২০ মিনিট পর্য্যন্ত এইস্থানে কীর্ত্তন হওয়ার পর, সকলে রাঘব পণ্ডিতের সমাধিস্থানে গমন করিলেন, সেই স্থানেও বাবাজীর কীর্ত্তন হইল। নগেন্দ্রবাবু মাধবীলতার একটি ক্ষুদ্র শাখা আমাকে দিলেন, আমি সযত্নে তাহা রাখিয়া দিলাম। ৪ঠা নভেম্বর আমার জীবনে এক স্মরণীয় দিন। সেদিন সংসারের সমস্ত পাপতাপ ভুলিয়া কয়েকঘণ্টা সাধু সঙ্গ করিয়া বেলা প্রায় ৬৷৷৹ টার সময় নগেন্দ্রবাবুর মোটর গাড়িতে করিয়া বাড়ীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

(৩১)

২১শে নভেম্বর রাত্রি ৮ঘটিকার সময় চালদাবাগান বৈষ্ণব সম্মিলনী-গৃহে শ্রীযুক্ত দ্বিজপদ গোস্বামী মহাশয়ের শ্রীরাসলীলাকীর্ত্তন শ্রবণ করিবার জন্য গমন করিলাম। শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা উৎসব পূর্ব্বেই অতিবাহিত হইয়াছিল, কিন্তু সেই উৎসব উপলক্ষ্য করিয়া অদ্য কীর্ত্তন হইল। গোস্বামী মহাশয় সুকণ্ঠ গায়ক, যন্ত্র সংযোগে তাঁহার গীতগুলি বড়ই মধুর হইল। "চল চল চল বিজয়ীকুঞ্জে কুঞ্জববরগামিনী" পদাবলী হইতে আরম্ভ করিয়া কীর্ত্তন চলিতে লাগিল। অতি মধুর সুরে মহাজন-গ্রথিত পদাবলীসমূহ গীত হইতে লাগিল, প্রশস্ত প্রাঙ্গণ বাহিয়া যেন এক অপূর্ব্ব আনন্দস্রোত চলিয়াছে, শ্রোতৃবর্গেব মন তাহাতে ডুবিয়া যাইতেছে। এমন নির্ম্মল আনন্দ বহুদিন উপভোগ করি নাই। "বাজে বলয়া, বাজে নূপুরধ্বনি, কিঙ্কিনী," "উদ্ভটতালে যদি হার বনমালী, কেড়ে নিব বাঁশীচূড়া দিব করতালি", "বাঁশী লুকাইয়া শ্যাম চাহে চারিদিকে"—প্রভৃতি পদগুলি, সুর ও বাদ্য-সংযোগে সকলের মনের ভিতর এক অপূর্ব্ব ভাবের সৃষ্টি করিতেছিল। কীর্ত্তন শেষ হইলে গোস্বামী মহাশয় ভক্তগণসহ হরিনাম করিতে করিতে নৃত্য করিলেন। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! গোস্বামী মহাশয় স্থূলকায় অথচ নৃত্যের সময় যেন তাঁহার সমস্ত শরীরটি লঘু হইয়া গেল, অবলীলাক্রমে অর্দ্ধঘণ্টাকাল নৃত্য করিলেন, সুবিপুল দেহভার অনায়াসে বহন করিলেন, অবসাদ অথবা পরিশ্রমের লেশমাত্র চিহ্ন দেখা গেল না। আমি দরজার একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া নৃত্য ও গীত উপভোগ করিয়া, এক অনাস্বাদিতপূর্ব্ব আনন্দের সন্ধান পাইয়া রাত্রি প্রায় ১১টার সময় বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

(৩২)

খবরের কাগজে একজন ইংরাজ সিভিলিয়ান রাজকর্ম্মচারীর বক্তৃতা পড়িয়া যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত হইলাম। Mr. Rowley I.C.S. মধ্যপ্রদেশে Buldana-র Deputy Commissioner। তিনি ১০ই ডিসেম্বর Malkapur নামক স্থানে জনসাধারণের নিকট একটি বক্তৃতা দিয়াছেন, সংবাদপত্র সমূহে সেই বক্তৃতা উদ্ধৃত হইয়াছে। এরূপ উদার ও ধার্ম্মিক ইংরাজ ভারতবর্ষে সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। তিনি বক্তৃতা উপলক্ষ্যে বলিয়াছেন: "I am not to rule here but to serve. India demands that we should quit. The demand is just and as for myself I will quit if I cannot serve you. Before this, some of us have no doubt behaved arrogantly but times have taught another lesson. Now no one should be arrogant. I fully sympathise with your demands and I am open to all and will do my best to help you. In no other country has there been such hospitality as we get here. We must be and will be ever grateful to India."

এই ইংরাজ কর্ম্মচারীর বয়স কত জানিনা কিন্তু যে উদার মনোভাব লইয়া তিনি এই দেশে কর্ম্ম করিতে আসিয়াছেন তাহা সত্যসত্যই বিস্ময়কর। তিনি পরাধীন জাতির সেবা করিতে আসিয়াছেন বলিয়াছেন,—ইহাই হিন্দু শাস্ত্রের শিবজ্ঞানে জীবসেবা। দৈত্যকুলে প্রহ্লাদের মত এইরূপ ধর্ম্মপ্রাণ মহাপুরুষ জাতির অলঙ্কারস্বরূপ এবং এইরূপ ইংরাজ

এখনও আছেন বলিয়াই ইঁহাদের পুণ্যে এই জাতি সহস্রপাপ-কলুষিত হইয়াও আজিও সসাগরা ধরিত্রীর অধীশ্বর। আমি এই ইংরাজ কর্ম্মচারীর মহানুভবতা উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে একখানি চিঠি লিখিলাম।

(৩৩)

১৪ই পৌষ আমার জন্মদিন। এবার ২৯শে ডিসেম্বর ১৪ই পৌষ। আমার জন্মদিনের কথা আমি নিজে সময় সময় বিস্মৃত হইয়া যাই কিন্তু মেয়েরা ভুলে না, বিশেষ করিয়া আরতি ১৪ই পৌষ সম্বন্ধে সর্ব্বদাই জাগরুক। এবার সে ভাগলপুর হইতে পত্র লিখিয়া আমার জন্মদিন সম্বন্ধে একটা অস্বাভাবিক কলরবের সৃষ্টি করিয়াছে। জন্মদিনে এবং জন্মতিথিতে পরমান্ন খাইবার জন্য আরতি বারংবার আমাকে উপদেশ দিতেছে। এদিকে পূর্ণিমা আমার জন্মদিন স্মরণ করিয়া এখানে আসিয়া আমাকে পরমান্ন প্রভৃতি নানাদ্রব্য রন্ধন করিয়া খাওয়াইবার জন্য পত্র দিয়াছিল। করুণা বালী হইতে লিখিয়াছে, "১৪ই পৌষ আপনার জন্মদিন, বোধহয় আপনার পায়েস খাওয়া হয়নি? টুটুন নেই, কে ওসব মনে করে রাঁধবে?" অরুণাও জন্মদিনে পায়েস খাইবার জন্য আমাকে পত্র লিখিয়াছে। আমি মনে মনে হাসি যে, এখন জন্মদিন অপেক্ষা মৃত্যুদিনই আমার পক্ষে অধিকতর স্মরণীয় দিন অথচ মেয়েরা বাবাকে জন্মদিনের খোকা সাজাইয়া রাখিতে চাহিতেছে। "যে-প্রবল কালস্রোতে প্রলয়ের ধারা ভাসাইয়া যায় কত রবি চন্দ্র তারা," সেই মহাকালের সর্ব্বগ্রাসী শক্তির নিকট হইতে একটি তুচ্ছ জীবনের আরও তুচ্ছ জন্মদিন কাড়িয়া লইয়া মেয়েরা ধরিয়া রাখিতে চায়! মহাকাল আমার ইহজীবনের ৫১ বৎসর হরণ করিয়াছে, আজ আমি নিঃসম্বল, মৃত্যুদিনের জন্য এখনও কিছু পাথেয় সংগ্রহ করিতে পারি নাই। জন্মদিনের সার্থকতা মৃত্যুদিনই প্রদান করিয়া

থাকে। জানিনা আর কতদিন আছি, কিন্তু যদি ইতিমধ্যে মৃত্যুদিনের জন্য কিছু সঞ্চয় করিতে পারি তবে আমার জন্মদিন সার্থক বলিয়া গ্রহণ করিব। আমার বাড়ীতে বহুদিন রন্ধনকার্য্য না হওয়ায় উনুন প্রায় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, সুতরাং পূর্ণিমাকে এখানে আসিয়া রন্ধন করিতে বারণ করিলাম। ছোট ডাক্তারবাবুর বাড়ীতে মহাসমারোহে আমার জন্মদিনের পরমান্ন ভোজন করিলাম, কত কি ব্যঞ্জন তাহার নির্ণয় নাই। পাপতাপ-কলুষিতজীবন বৃদ্ধের জন্মদিন উৎসব, মহাকালের একটা বিরাট্ পরিহাস মাত্র।

৩১শে ডিসেম্বর, সোমবার, এখন রাত্রি ৭টা। আজ সমস্তদিন ছাত্র পড়াইয়া এখন বাহিরের ঘরে বসিয়া স্মৃতিকথা লিখিতেছি। আজ তিনমাস হইল আমি একা বাস করিতেছি, আরতি অরুণার সহিত ভাগলপুরে আছে। প্রতিবাসী ছোট ডাক্তারবাবুর বাড়ী হইতে দুই বেলা অন্নব্যঞ্জন আসিতেছে, অতি যত্নের সহিত ইঁহারা আমার ভার বহন করিতেছেন। ভগবানের দয়ায় অন্যান্য বৎসরের তুলনায় এই বৎসর ছাত্র পড়ানর সংখ্যা ও আয় অনেক বেশী। যুদ্ধ মিটিয়া গিয়াছে কিন্তু কোন দ্রব্যই সুলভ হয় নাই। অন্ন, বস্ত্র, সরিষার তৈল, মাছ, দুধ, প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি মহার্ঘ্য ও দুষ্প্রাপ্য। আমার বয়সের তুলনায় শরীর ভালই আছে। দিন কাটিয়া যাইতেছে, কিন্তু মন সময় সময় ভগবৎমুখী হইলেও অধিকাংশ সময় বিদ্রোহী, আমার শাসনের বহির্ভূত। তাই সর্ব্বদাই আমাকে শঙ্কিত জীবনভার বহন করিতে হয়, ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন আমার লজ্জা নিবারণ করেন, আমার মনুষ্যজন্ম সার্থক করিয়া তাঁহার শ্রীচরণের যোগ্য করিয়া লন।

তৃতীয় অধ্যায়

১৯৪৬

(১)

১৯৪৬ সাল। যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে। জার্ম্মানী ও জাপান সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া ইংলণ্ড ও আমেরিকার পদানত হইয়াছে। এতবড় একটা যুদ্ধ শেষ হইল তথাপি সাধারণ মানুষের দুঃখ ঘুচিল না। অন্নবস্ত্রের অভাব সমভাবেই চলিয়াছে। আরতি এখন ভাগলপুরেই আছে। আমি ডাক্তারবাবুর বাড়ীতে দুইবেলা আহার করিতেছি। ১লা জানুয়ারী সকালে সার্পেণ্টাইন লেনে বিশ্বনাথকে পড়াইয়া আসিলাম, বেলা ১টার সময় প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র শীতল পড়িতে আসিয়াছিল, তাহার পর বেলা ৩টার সময় সালকিয়া হইতে কুমার পড়িতে আসিল, সন্ধ্যাবেলা ৬॥০ টার সময় প্রতিবাসী শ্রীযুক্ত পঙ্কজকুমার দাস মহাশয়ের কন্যা ললিতা পড়িতে আসিয়াছিল। কাজের মধ্য দিয়াই সমস্ত দিন কাটিয়া গেল। সন্ধ্যাবেলা পূর্ণিমার বাড়ীতে আমার নববর্ষের নিমন্ত্রণ ছিল। সেখানে আহারাদি করিয়া রাত্রি প্রায় ১০॥০ টার সময় বাড়ী ফিরিলাম। এবার বিশ্বজননী আমাকে অনেক ছেলে পড়ান দিয়াছেন, যথেষ্ট আয় হইতেছে, তাঁহার দয়ায় এই ক্ষণভঙ্গুর শরীর লইয়া কর্ত্তব্যকর্ম্মগুলি সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইতেছি।

(২)

৮ই জানুয়ারী সন্ধ্যাবেলা চালদা বাগান বৈষ্ণব সম্মিলনীতে যাইয়া কীর্ত্তন ও "ভক্তি সন্দর্ভ" পাঠ ও ব্যাখ্যা শুনিলাম। পাঠপ্রসঙ্গে আচার্য্য শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় সাধুসঙ্গের ফল আলোচনা করিলেন। তিনি বলিলেন সাধুসঙ্গ ও সাধুকৃপা ব্যতীত ভগবৎলাভ হইতে পারে না। সেদিন বৈষ্ণবসেবার জন্য দশটি টাকা সঙ্গে লইয়াছিলাম। সাধারণতঃ মাসের শেষে পাঠমণ্ডপের নিকট একটি পাত্র স্থাপিত হইয়া থাকে এবং ভক্তবৃন্দ সেই পাত্রে সাধ্যমত অর্থ প্রদান করিয়া থাকেন। সকলের সম্মুখে সেই পাত্রে অর্থ প্রদান করিতে আমার লজ্জা হয়, সেইজন্য গোপনে নগেন্দ্রবাবুর হস্তে টাকা কয়টি দিয়াছিলাম, তিনি যথাস্থানে এবং যথাসময়ে টাকা দিয়া দিবেন ইহাই আশা করিয়াছিলাম। পাঠ সমাপ্ত হইলে নগেন্দ্রবাবু আচার্য্য শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গোস্বামী মহাশয়ের হস্তে টাকা কয়টি দিলেন এবং গোস্বামী মহাশয়কে প্রণাম করিবার জন্য আমাকে নির্দ্দেশ করিলেন। অন্যান্য ভক্তবৃন্দের সম্মুখে আমার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া আচার্য্য মহাশয়কে নগেন্দ্রবাবু বলিলেন "ইনি অধ্যাপক, ভক্তলোক, আপনার সেবার জন্য কিঞ্চিৎ অর্থ দিতেছেন, ইঁহাকে আশীর্ব্বাদ করুন।" আমি যন্ত্রচালিতবৎ আচার্য্য মহাশয়ের সম্মুখে প্রণাম করিলাম, তিনি প্রসন্নদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইলেন, আমার সমস্ত শরীর ও মন সেই বৈষ্ণবের প্রশান্তদৃষ্টিতে শীতল হইয়া গেল। কিন্তু সেদিনের লজ্জা আমি ভুলিতে পারিব না। শত শত চক্ষুর সম্মুখে "ভক্ত ও অধ্যাপক" বলিয়া পরিচিত হইয়া দশটি টাকা আমি দিতেছি, ইহা আচার্য্য মহাশয়ের নিকট প্রকাশিত হইলে আমি লজ্জায় ম্রিয়মান হইয়া পড়িলাম, আমার চক্ষু অশ্রুতে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। দেবমন্দির হইতে বাহির হইয়া পথে আসিতে আসিতে

নগেন্দ্রবাবুকে আমার লজ্জার কথা বারংবার বলিতে লাগিলাম, তিনি সকলের সম্মুখে আমাকে লজ্জিত করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার ব্যবহারের প্রতিবাদ করিলাম। নগেন্দ্রবাবু বলিলেন, ইহাতে লজ্জা নাই, সকলে আমার প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, তাহাতে আমার কল্যাণ হইবে। আমি কী লজ্জায় অভিভূত হইয়া সমস্ত পথ অতিক্রম করিয়া বাড়ী আসিলাম তাহা আমার অন্তর্য্যামী ভগবান ব্যতীত আর কেহই বুঝিতে পারিবে না।

(৩)

২১শে জানুয়ারী আরতি ভাগলপুর হইতে ফিরিয়া রাত্রিতে ফণীদের কালীঘাটের বাড়ীতে থাকিয়া পরদিন বেলা প্রায় ৩টার সময় ফণীর সঙ্গে এখানে আসিল। আরতি ভাগলপুর হইতে অনেক খাবার আনিয়াছে। তাহার স্বাস্থ্যের অপেক্ষাকৃত উন্নতি লক্ষ্য করিলাম।

২৬শে জানুয়ারী বিকাল প্রায় ৫॥০টার সময় ডাক্তারবাবুর বারান্দায় বসিয়া গল্প করিতেছি, এমন সময় বালক নিমাই আসিয়া উপস্থিত হইল। নিমাইয়ের কথা পূর্ব্বে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। ডাক্তারবাবু নিমাইকে দেখিয়া বলিলেন, "যদি রাগ না করেন তো একটা কথা বলি—টুটুনকে দিয়ে নিমাইয়ের এঁটো পাড়াবেন না। ঝিয়ের ছেলে, কি জাত তার ঠিক নেই, সর্ব্বদাই নোংরা হয়ে থাকে, নর্দ্দমা ঘাঁটে। আপনার কাছে ভাত খায় থাক্ কিন্তু টুটুনকে ওর এঁটো থালা ছুঁতে দেবেন না।" আমি হাসিলাম এবং ইহাতে কিছুই দোষ নাই বলিলাম। কিন্তু ডাক্তারবাবু আমার কথা ও যুক্তি স্বীকার করিলেন না। আসল ব্যাপারটা লিপিবদ্ধ করিতেছি। আরতির ভাগলপুর হইতে এখানে ফিরিয়া আসার পর হইতে নিমাই প্রত্যহ আমাদের বাড়ীতে

ভাত খায় এবং আমার নির্দ্দেশমত আরতি তাহার উচ্ছিষ্ট থালা সরাইয়া রাখে এবং স্থানটি গোবরের দ্বারা মার্জ্জনা করে। আরতি ইচ্ছায় হউক অথবা অনিচ্ছায় হউক এই কাজ করিয়া থাকে, ইহা ডাক্তারবাবু এবং তাঁহার স্ত্রী জানিতে পারিয়া আরতিকে নিমাইয়ের এঁটো ছুঁইতে বারণ করিয়াছিলেন এবং ডাক্তারবাবু সেই কথারই আমার নিকট পুনরাবৃত্তি করিলেন। এই কার্য্য সম্বন্ধে আমি ভাবিয়া দেখি নাই তাহা নহে কিন্তু আমি যেদিক হইতে ইহার বিচার করিয়াছিলাম তাহা ডাক্তারবাবুরা উপলব্ধি করেন নাই। নিমাইয়ের বয়স আন্দাজ তিন বৎসর—এই বয়সের বালক নিষ্পাপ এবং জাতিবর্ণবিহীন। পাপপুণ্য বিচারের শক্তি জাগ্রত না হইলে জাতির কোন প্রশ্নই উঠে না, সুতরাং কোন বালকেরই জাতি নাই, সব বালক সত্ত্ব-রজ-তমগুণের অতীত এক বিভিন্ন জাতি। আর একটা কথা আছে। সেবার দ্বারাই মানুষের কর্ম্মক্ষয় ও পাপক্ষয় হয় এবং নিষ্কলুষচরিত্র বালকের সেবা সাধুসন্ন্যাসীদের সেবার সমতুল্য। আমি বিশ্বাস করি, আরতি প্রীতির সহিত যদি এই বালকের উচ্ছিষ্ট মার্জ্জন করে, আহারাদির ব্যবস্থা করে তাহা হইলে এই সামান্য সেবাই তাহার জন্মান্তরের কর্ম্মফল বহুল পরিমাণে খণ্ডন করিয়া তাহার সৌভাগ্যোদয়ের কারণস্বরূপ হইবে। আমার নিজ জীবনের দিক দিয়া এই সেবার একটা সার্থকতা ও প্রয়োজনীয়তা আছে। আমি ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত নানাবিধ পাপভারে জর্জ্জরিত। মিথ্যা বিনয় প্রকাশ করা মহাপাপ, ইহা স্মরণে রাখিয়া আমি আমার মনের নিঃসংশয় বিশ্বাসের কথা লিপিবদ্ধ করিতেছি। দরিদ্র বালক অথবা ভিক্ষুককে আহার্য্য দ্রব্য দিয়া আমার মনে হয় যে, আমি নিজে অশেষবিধরূপে উপকৃত হইলাম। সংসারে প্রতি মুহূর্ত্তে যে পাপ করিতেছি তাহার চাপে

আমি চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইতাম কিন্তু এই বালক এবং দরিদ্রগণের হাসি এবং আশীর্ব্বাদই আমার ইহজীবনের রক্ষাকবচের কার্য্য করে। নিমাই আমাকে মধ্যে মধ্যে তৈল মাখাইয়া দেয়, হাতে একটু তৈল লইয়া আমার অঙ্গের স্থানে স্থানে লেপন করে। কোনদিন বা আমার পায়ে তৈল লাগাইয়া নিজের কর্দ্দমাক্ত ছোট পা দুইটি প্রসারিত করিয়া আমার সম্মুখে উপবেশন করে এবং তাহার পদদ্বয়ে তৈল মাখাইয়া দিবার জন্য আমাকে মৃদুকণ্ঠে আদেশ করে। আমি তৈল মাখাইয়া দিলে আনন্দ-বিস্ফারিত মুখে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করে, সে প্রসন্ন দৃষ্টিতে আমার মনে হয় আমার জন্মান্তরের উত্তপ্ত পাপভার নষ্ট হইয়া যাইতেছে। এখানে একজন ভিখারী প্রায়ই ভিক্ষা করিতে আসে,—এই পাড়াতেই ফুটপাতের উপর সে দিবারাত্র যাপন করে। তাহাকে পাড়ার সকলে পাগলা বলিয়া ডাকে। এই "পাগলা' প্রায়ই ভগবানের নাম উচ্চারণ করে এবং প্রায় প্রত্যহই আমার কাছে দুই আনা করিয়া পয়সা লইয়া যায়। একদিন সে আমাকে আসিয়া বলিল, "আমি গঙ্গাসাগরে স্নান করিতে যাইব, আমাকে দুইটি টাকা দিও।" গঙ্গা-সাগর যাত্রা করিবার ২।১দিন পূর্ব্বে সে আমার নিকট দুইটি টাকা লইয়া গেল এবং যাইবার সময় আমাকে বহুক্ষণ ধরিয়া আশীর্ব্বাদ করিল। এবার গঙ্গাসাগরে ষ্টীমারঘাট ভাঙ্গিয়া অনেক লোক মারা গিয়াছিল। আমি খবরের কাগজে সেই সংবাদ পড়িয়া পাগলের জন্য চিন্তিত হইয়া পড়িলাম। কিন্তু ঠিক সময়মত সুস্থদেহে প্রসন্নমনে পাগলা গঙ্গাসাগর হইতে ফিরিয়া আসিল এবং আমাকে একখানি কপিল মুনির চিত্র উপহার দিল। এই "পাগলা" পয়সা পাইলেই আমার কল্যাণ কামনা করে এবং আমার মনে হয় তাহার আশীর্ব্বাদ আমাকে অনেক বিপদআপদ হইতে রক্ষা করে। এই বালক ও ভিখারী

আমার নিকট যাহা গ্রহণ করে তাহার লক্ষগুণ তাহারা উজ্জ্বল করিয়া আমাকে ফিরাইয়া দেয়—ইহা আমার ধ্রুব বিশ্বাস। আমার প্রদত্ত অন্ন অথবা পয়সা না হইলেও তাহাদের দুঃখের জীবন ঠিক সমভাবেই কাটিয়া যাইবে কিন্তু তাহারা আমার দান গ্রহণ না করিলে আমার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা দুরূহ হইয়া উঠিত। গ্রহণ করিয়াই তাহারা আমাকে কৃতার্থ করিতেছে, আমাব ইহকাল ও পরকালের জীবনযাত্রা-পথ সহজ ও সরল করিতেছে, আমি তাহাদের নিকট ঋণী—এই বিশ্বাস আমার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া আছে।

(৪)

১১ই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যাবেলা চালদাবাগান বৈষ্ণব সম্মিলনীতে যাইতে-ছিলাম। চালদাবাগান গলিতে প্রবেশের পথে ফুটপাথের উপর ছিন্ন-কন্থা বিছাইয়া কয়েকটি ভিখারী শুইয়া ও বসিয়া গল্প করিতেছিল। একটি বৃদ্ধ ভিখারীকে লক্ষ্য করিলাম—দীর্ঘ পক্ক শ্মশ্রু, জীর্ণ দেহ, মস্তকে রুক্ষ শ্বেত কেশভার। ধীরে ধীরে হাঁটিতে হাঁটিতে শুনিলাম সে অপর ভিখারীকে বলিতেছে "ভগবান যা করেন তা ভালর জন্যে।" এই পুরাতন কথা ভিখারীর মুখ হইতে বাহির হইয়া যেন নূতনরূপে আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। ফুটপাথের উপর জীর্ণশয্যায় বসিয়া, অনশনে ক্লিষ্ট হইয়া, সংসারের সর্ব্ববিধ ভোগসুখ হইতে বঞ্চিত একমাত্র এই ভারতবাসী ভিখারীব মুখেই এতবড় সত্য ও বিশ্বাসের কথা সম্ভব।

(৫)

১৯শে ফেব্রুয়ারী বিকালবেলা ভবানীপুরে শ্রীমান গুণেন্দ্রকে পড়াইয়া বাসে করিয়া বাড়ি ফিরিতেছিলাম। সেইদিন গুণেন্দ্র আমাকে একটি

টিফিন কেরিয়ার কিনিয়া দিয়াছিল, বাসের মধ্যে সেটিও আমার সঙ্গে ছিল। Victoria College-এর সামনে বাসখানি থামিবামাত্র পিছন হইতে একখানি মিলিটারী লরি বাসে ধাক্কা মারিল। আমি ঠিক পিছনের বেঞ্চিতে বসিয়াছিলাম। ধাক্কা খাইয়া বাসখানি প্রবল বেগে সামনের দিকে চলিয়া গেল নতুবা বাসখানি ভাঙ্গিয়া যাইত এবং পিছনের বেঞ্চির সকলেই আহত হইত। আমার নূতন টিফিন কেরিয়ারটি ধাক্কা লাগিয়া বেঁকিয়া তুবড়াইয়া গেল। আরতি বলিল টিফিন কেরিয়ারটি অপয়া, আমি হাসিয়া বলিলাম খুবই "সপয়া"—বেচারী নিজের মাথায় আঘাত গ্রহণ করিয়া আমাকে রক্ষা করিয়াছে। এই বৎসর আরও ২।৩ বার ভগবানের দয়ায় মিলিটারী লরীর আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়াছি।

আরতি মধ্যে মধ্যে আমার কাছে ভাগলপুরের গল্প করে। ৯ই মার্চ্চ রাত্রি প্রায় ১০॥০টার সময় আহারাদি শেষ করিয়া বাহিরের ঘরে চেয়ারের উপর বসিয়া বিশ্রাম করিতেছি, আরতি মেজের উপর বসিয়া ভাগলপুরের গল্প আরম্ভ করিল। ভাগলপুরের বাড়ীতে একটি পোষা ছাগল আছে সে মাংস খায়, একটি বিড়াল আছে সে লোক-চক্ষুর সম্মুখে নিজের বৈষ্ণবতা প্রমাণ করিবার জন্য শাকের ঘণ্ট খায়, এবং সুবিধা পাইলে বড় মাছের মুড়া লইয়া পলায়ন করে, একটি কুকুর আছে আখ চিবাইয়া রস খাইতে তাহার অসীম উৎসাহ। নিজেদের বাড়ীর এরূপ অদ্ভুতধর্ম্মী জীবজন্তুগুলিকে লক্ষ্য করিয়া গৃহস্থগণ বলেন "আমাদের বাড়ীটি চিঁড়িয়াখানা।" আহারের পর আরামে বিশ্রাম করিবার সময় আরতির বর্ণনা ও মন্তব্য আমি বিশেষ করিয়া উপভোগ করি।

(৬)

২৪শে মার্চ্চ, রবিবার চালদাবাগান বৈষ্ণব সম্মিলনীতে "মহোৎসব" ছিল। নগেন্দ্রবাবু পূর্ব্ব হইতেই আমাকে সময়মত যাইবার জন্য বলিয়া রাখিয়াছিলেন। রাত্রি প্রায় ৯টার সময় আমি ও ছোট ডাক্তারবাবু সম্মিলনীগৃহে উপস্থিত হইলাম। সমস্ত দিনে প্রায় পাঁচ সহস্র লোক ভোগ গ্রহণ করিয়াছিল। আমরা প্রায় ৪০।৪৫ জন একসঙ্গে বড় হলঘরেতে প্রসাদ গ্রহণ করিতে বসিলাম। রায় বাহাদুর নগেন্দ্র দত্ত মহাশয় আমার দক্ষিণ দিকে, শ্রীযুক্ত মুণীন্দ্র প্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় আমার বামদিকে বসিয়াছিলেন, ছোট ডাক্তারবাবু নগেন্দ্রবাবুর দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়াছিলেন। চিঁড়া, দধি, পায়েস, মিষ্টান্ন, প্রভৃতি ভগবন্নিবেদিত শুদ্ধদ্রব্য পরমতৃপ্তি সহকারে ভোজন করিলাম। বৈষ্ণবদিগের সহিত ধূলায় বসিয়া পর্ণপত্রে শুদ্ধপ্রসাদ এমন আনন্দের সহিত আমি পূর্ব্বে আর কখনও খাই নাই। আহারের মধ্যে মধ্যে কোন বৈষ্ণব "সাধু সাবধান" বলিয়া নানাবিধ ধর্ম্মকথা শ্লোক করিয়া আবৃত্তি করিতেছিলেন এবং ভক্তবৃন্দ বিষম হুঙ্কারে "হুঁ" বলিয়া তাঁহার সমর্থন করিতেছিলেন। সেদিন আমার এক আনন্দের দিন। নূতন অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়া শুদ্ধ প্রসাদ গ্রহণ করিয়া প্রসন্নমনে রাত্রি প্রায় দশটার সময় বাড়ীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

২৫শে মার্চ্চ বেলা প্রায় ১২॥০টার সময় বাসে করিয়া ভবানীপুরে গুণেন্দ্রকে পড়াইতে যাইতেছিলাম। বাসটি যখন ধর্ম্মতলার মোড়ে আসিয়া দাঁড়াইল তখন বাসের অতি নিকটে Dustbin-এর সম্মুখে একটি ভিক্ষুক বালক আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। বয়স আন্দাজ দশ বৎসর, মাথায় ছোট ছোট করিয়া অনভ্যস্ত হস্তে এবড়ো-

খেব্‌ড়ো করিয়া কাটা চুল, বক্ষের পঞ্জরগুলি সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে। বালকটি অতি সন্তর্পণে ডাষ্টবিনের নিকট পরিত্যক্ত অপেক্ষাকৃত বৃহৎ একখণ্ড পাউরুটি কুড়াইতেছিল। আমি প্রথমতঃ জিনিষটিকে পাউরুটি বলিয়া বুঝিতে পারি নাই, দুর হইতে যেন কঠিন একখণ্ড ইষ্টকের মত বোধ হইতেছিল। আমার বাসটি প্রায় ২।৩ মিনিট দাঁড়াইয়াছিল এবং আমি সেই সময় তাহাকে লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। সেই পচা কঠিন পাউরুটি-টি লইয়া বালক আস্তে আস্তে কামড়াইতে লাগিল। আমি তাহাকে ডাকিয়া দুই আনা পয়সা দিলাম। দুই আনা টুকরাটির প্রতি একবার সে তাকাইয়া দেখিল, বিস্মিত মুগ্ধ ও সরল দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিল, মধুর হাসিতে শুষ্ক মুখখানি ভরিয়া গেল, সেই হাসি ও দৃষ্টির ছটায় আমার সমস্ত শরীর ও মন যেন শীতল হইয়া গেল। বাস ভবানীপুরের দিকে চলিল, অনেক দূর পর্য্যন্ত বারংবার আমার চক্ষুতে জল আসিতে লাগিল।

(৭)

২৬শে মার্চ্চ, মঙ্গলবার, সন্ধ্যাবেলা বিশ্ববিদ্যালয়ের খাতা দেখা শেষ করিয়া বসিয়া আছি, আরতি ধীরে ধীরে বাহিরের ঘরে আসিয়া আমার সহিত গল্প আরম্ভ করিল। আজ ২।৩ মাস হইতে একটি রাঁধিবার ঠাকুর রাখা হইয়াছে, সুতরাং আরতি আজকাল অনেক অবসর পায়। প্রায় ১১।১২ বৎসর পূর্ব্বে আরতি যখন প্রথম এই বৃন্দাবন লেনস্থ বাড়ীতে জাগুলি হইতে আসে তখন সে একাকী কাছাকাছি দোকানে দই সন্দেশ প্রভৃতি জিনিষ কিনিতে যাইত,—সেই সমস্ত পুরাতন কথা আরতি গল্প করিতে লাগিল। থানা-সংলগ্ন ডাকবাক্সে আরতি চিঠি দিয়া আসিত, অপেক্ষাকৃত দূরে গাঙ্গুরামের দোকান হইতে দধি কিনিয়া

আনিত। নিকটেই বিদ্যাসাগর ষ্ট্রীটে এক বৃদ্ধের খাবারের দোকান ছিল। তাহার নিকট সন্দেশ কিনিতে গেলে বৃদ্ধ অনেক কথা আরতিকে জিজ্ঞাসা করিত এবং আরতির চুড়ি নাই কেন তাহা প্রশ্ন করিত। একদিন জিলাপি কিনিয়া আসিবার সময় চিলে ছেঁা মারিয়া ঠোঙ্গাটি মাটিতে ফেলিয়া দিল এবং সমস্ত জিলাপি ছড়াইয়া পড়িল। সেই ধূলিমাখা জিলাপিগুলি কুড়াইয়া ভৎর্সনার ভয়ে ভীত হইয়া আরতি ধীরে ধীরে বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছিল—সে কথা আরতি সবিস্তারে বর্ণনা করিল। এই সময়ে আরতির দিদিদের কাহারও বিবাহ হয় নাই, সকলেই আমার কাছে ছিল। কিন্তু দিদিরা সকলে একত্র হইয়াও আরতির সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিত না। কতকটা ছোট বোন্‌টির প্রতি স্নেহের জন্য, কতকটা ছোট মেয়ের প্রতি তাহার ঠাকুমার ও আমার আদর দেখিয়া অন্যান্য মেয়েরা আরতিকে বিশেষ কিছু বলিত না, তাহারা কিছু তিরস্কার করিলেও আরতি গ্রাহ্য করিত না। কিন্তু সময় সময় তাহার দিদিরা একটি ব্রহ্মাস্ত্র আরতির প্রতি প্রয়োগ করিত এবং তাহাতে আরতি সম্পূর্ণ অভিভূত ও পরাজিত হইয়া পড়িত। "তুই ছোটবেলায় আমাদের মাকে খেয়েছিস্" বলিলেই আরতি একেবারে নিৰ্জ্জীব হইয়া পা দুইটি মাটিতে ছড়াইয়া অপরাধীর মত অজস্র ধারায় কাঁদিতে আরম্ভ করিত। আমি এই সমস্ত পুরাতন কথা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিলাম, আরতির বাল্যকালের বর্ণনা শুনিয়া সমস্তই আমার মনে পড়িতে লাগিল। এই পাড়ায় আমরা অনেকদিন আছি,—পল্লীর পার্শ্ববর্ত্তী অনেক স্থান আরতির সুপরিচিত।

২১শে এপ্রিল, রবিবার বিকাল প্রায় ৫॥০ ঘটিকার সময় করুণা তাহার তিনটি খোকাকে লইয়া জীবনের সহিত এখানে আসিয়াছে।



২৯শে এপ্রিল, সোমবার অরুণা তাহার তিনটি খুকী ও একটি খোকাকে লইয়া সন্ধ্যা প্রায় ৭৷৷৹ টার সময় ফণীর সহিত আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ৩০শে এপ্রিল, মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭৷৷৹ টার সময় পূর্ণিমা তাহার খুকীকে লইয়া সুকুমারের সহিত আসিয়া পৌঁছিয়াছে। জামাই তিনজনই মেয়েদের পৌঁছাইয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে। বহুদিন পরে চারটি মেয়ে আবার একত্র হইয়াছে—আনন্দ কোলাহলে ক্ষুদ্র বাড়ীটি সর্ব্বদাই মুখরিত।

৩০শে এপ্রিল কলেজের গ্রীষ্মাবকাশ আরম্ভ হইল, ২রা জুলাই কলেজ খুলিবার কথা আছে।

(৮)

১৬ই মে রাত্রি ৯-৪৫ মিনিটের সময় ভারত-সচিব Lord Pethick Lawrence দিল্লী হইতে বেতার বক্তৃতা করিবেন কথা ছিল। আজ কিছুদিন হইল Lord Pethick Lawrence, Sir Stafford Cripps ও A. V. Alexander এই তিনজন ব্রিটিশ মন্ত্রী ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছেন—উদ্দেশ্য ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সহিত পরামর্শ করিয়া তাহাদের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষে নূতন শাসনতন্ত্রপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করা। এই মন্ত্রীমণ্ডলী "Cabinet mission" নামে পরিচিত। ভারতবর্ষ যদি স্বাধীন হইতে চায় তাহা হইলে ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট তাহাতে বাধা দিবে না, ইহাই প্রধান মন্ত্রী Mr. Atlee বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্টে ঘোষণা করিয়াছেন। Congress ও Muslim League মিলিত হইয়া একমত হইবার জন্য Cabinet mission মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত নেহেরু, প্রেসিডেণ্ট আবুলকালাম আজাদ, Mr. Jinnah, প্রভৃতি নেতৃবর্গকে আহ্বান করিয়াছিলেন, কিন্তু Congress ও Muslim League একমত না হওয়ায় ১৬ই মে Cabinet

mission-এর সিদ্ধান্ত দেশবাসীকে জানাইবার জন্য Lord Pethick Lawrence রাত্রি ৯-৪৫ মিনিটের সময় বেতারে বক্তৃতা করেন। অতি সুস্পষ্টকণ্ঠে, বিশুদ্ধ ইংরাজীতে এই ইংরাজমন্ত্রী বক্তৃতা করিলেন। Constituent Assembly ও বিভিন্ন প্রদেশগুলির শাসনপদ্ধতি সম্বন্ধে তিনি মন্ত্রীমিশনের সিদ্ধান্তের কথা জনসাধারণের গোচর করিলেন। এই নূতন শাসনপদ্ধতি কার্য্যে অনুষ্ঠিত হইলে যদি দরিদ্র ভারতবাসীর আর্থিক ও রাজনৈতিক উন্নতি হয় তাহা হইলে ভারত-সচিবের আজিকার বক্তৃতা ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হইয়া থাকিবে।

(৯)

২রা জুন, বেলা ২টার সময় পূর্ণিমা তাহার খুকীকে লইয়া সুকুমারের সহিত তাহার শ্বশুরবাড়ী চলিয়া গেল, ৯ই জুন রবিবার বেলা ২-৫০ মিনিটের ট্রেনে শিয়ালদহ ষ্টেশন দিয়া করুণা তাহার তিনটি খোকাকে লইয়া জীবনের সহিত বালী চলিয়া যাইল, ঐ দিন সন্ধ্যা ৭ টার সময় অরুণা ট্যাক্সি করিয়া তাহার ছেলেমেয়েদের লইয়া ফণীর সহিত কালীঘাট চলিয়া গেল। প্রায় দেড়মাস আমাদের বাড়ী সন্ধ্যাবেলার বটবৃক্ষের মত নানা কলরবে মুখরিত হইতেছিল, আটটি বালকবালিকা চলিয়া যাইবার পর একটা যেন অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতা সমস্ত বাড়ীটিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। পরদিন সকালে আমাদের ঝি যশোদা কাজ করিতে আসিয়া একবার চারিদিকে চাহিয়া শুষ্কহাস্য করিয়া বলিল, "একগাদা ছেলেপীলে উঠোনময় বেড়াচ্ছিল, আজ বাড়ীটা কাণা মেরে গেছে। একেবারে নিঝুম"। যশোদা ছেলেমেয়েগুলিকে ভালবাসিত, বিশেষ করিয়া করুণার ছোট খোকা তাহার বড়ই প্রিয় ছিল। সকালে বাড়ীতে ঢুকিয়া কোন কাজ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে

ছোট খোকাকে কোলে লইয়া একটু ঘুরিয়া বেড়ান তাহার নিত্যনৈমিত্তিক কাজের অঙ্গস্বরূপ ছিল। শিশু-কোলাহল-মুখরিত বাড়ীর নিঃস্তব্ধতা আমাদের সকলকেই স্পর্শ করিয়াছে।

এইবার আমি নাতি-নাতিনী ও মেয়েদের লইয়া ঘোরতব সংসারীর মত প্রায় দেড়মাস অতিবাহিত করিয়াছি। শ্বশুর বাড়ীতে মেয়েরা নিজেদের সংসার করে, সেখানে সাধ্যের অতিরিক্ত পরিশ্রমও তাহাদিগকে সময় সময় করিতে হয়, সুতরাং আমার এখানে আসিয়া যাহাতে ইচ্ছামত প্রচুর মাছ, দুধ খাইয়া বিশ্রাম কবিয়া আনন্দ উপভোগ করে ইহা আমি সর্ব্বদাই চেষ্টা করি। অন্যবার মেয়েরা আসিয়া অনেক কাজ করিতে বাধ্য হয় কিন্তু এবার কয়েক মাস ধরিয়া "নারায়ণ" নামক পাচক রান্নার কাজ করিতেছে সুতরাং মেয়েরা রন্ধনের গুরু-পরিশ্রম হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিল। ছোট ছেলেমেয়েদের কাঁথা, জামা, ইজের প্রভৃতি সকাল বেলায় জলে কাচা অথবা সাবান দেওয়া একটা পরিশ্রমসাধ্য ব্যাপার। আমি এইবার পূর্ব্ব হইতেই যশোদা ঝিকে বেশী মাহিনা দিয়া এই সমস্ত কাঁথা, জামা, ইত্যাদি কাচা প্রভৃতি বাড়তি কাজ করাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। সুতরাং মেয়েদের অনেক অবসর থাকিবার কথা। কিন্তু অবসর তাহাদের তিলার্দ্ধও ছিল না, ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলির পরিচর্য্যা করিতে করিতে আমার মেয়েদের সমস্ত সকাল ও বিকাল অতিবাহিত হইত। এই গ্রীষ্মাবকাশের সময় আমার যথেষ্ট অবসর ছিল, কেবলমাত্র সপ্তাহে চারিদিন বেলা ২টার সময় তারাপদকে পড়াইতে সার্পেনটাইন লেনে যাইতাম। অখণ্ড অবসরকালে আমি সকালে ও বিকালে উঠানে মাদুর পাতিয়া বসিতাম, নাতি, নাতিনীরা চতুর্দ্দিকে কোলাহল করিয়া খেলা করিত। ছাত্র পড়াইয়া বিকালে বাড়ী ফিরিলে সমু ও অমু আনন্দে চীৎকার

করিয়া আমাকে অভ্যর্থনা করিত। কেহ বা হাত হইতে ছাতা লইত, কেহ বা গলার চাদর লইত, বিশেষ করিয়া অমু আমার পায়ের জুতা খুলিয়া চটীজুতা পরাইয়া দিত। কোন কোন দিন সমুও এক পায়ের জুতা খুলিত, অন্যটি অমু খুলিত। অরুণার শান্তস্বভাবা মেয়েগুলি এই ডাকাত দুইটীর কাছে ঘেঁষিতে পারিত না, দূর হইতে তাকাইয়া তাহাদের কার্য্যাবলী লক্ষ্য করিত। পরক্ষণেই শঙ্কর, উমা, ও রণুর ছয়খানি হাত আমার দিকে প্রসারিত হইত, এক এক করিয়া তিনজনকে কোলে লইয়া পরে চেয়ারে বসিয়া ফ্যান খুলিয়া দিয়া বিশ্রাম করিবার পর মুখহাত ধুইতে যাইতাম। ক্লান্ত ঘর্ম্মাক্ত শরীরে খোকাখুকীদের কোলে লইয়া বেড়াইবার সময় মনে মনে ভাবিতাম, মহামায়ার আদেশে আশ মিটাইয়া সংসার করিতেছি, তাঁহার দয়ায় ও ইচ্ছায় এই কর্ম্মের দ্বারাই আমার কর্ম্মফল কাটিয়া যাউক, আমি জীবনের সন্ধ্যাবেলা যেন সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া বিশ্বজননীর শ্রীচরণে বসিয়া তাঁহার চিন্তায় দিনগুলি অতিবাহিত করিতে পারি।

বরাবরই আমি লক্ষ্য করিতেছি এবং এবারেও লক্ষ্য করিলাম, বয়সের অনুপাতে সমুর বুদ্ধি অনেক বেশী। সাধারণ বালকের মত সমু অত্যধিক চঞ্চল নয়, মুখের কথার শাসন অধিকাংশ সময় মানিয়া চলে, তাহার স্থিরবুদ্ধির পরিচয় অনেকবার নানাবিধ ভাবে পাইয়াছি। কাজ সুশৃঙ্খলভাবে করিবাব তাহার একটা স্পৃহা সর্ব্বদাই পরিলক্ষিত হয়। আমি বাহিরের ঘরে বসিয়া কাজ করিতেছি, আমার একজোড়া জুতা দেওয়ালের ধারে রাখা আছে, ছেলেমেয়েদের পা লাগিয়া জুতা দুইটি দুইদিকে চলিয়া গেল, একটি সোজাই রহিল অপরটি বাঁকিয়া থাকিল। অন্যান্য ছেলে-মেয়েদের সে দিকে লক্ষ্য নাই। কিয়ৎক্ষণ পরে সমু ঘরে ঢুকিয়া খেলায় যোগ দিল। খেলিতে খেলিতে হঠাৎ তাহার দৃষ্টি জুতার দিকে পড়িল,

আমি লক্ষ্য করিলাম, সে খেলিতে খেলিতে মুহূর্ত্তের জন্য আসিয়া জুতা দুইটি যথাস্থানে কাছাকাছি রাখিয়া পুনরায় খেলা আরম্ভ করিল। ডাক্তারবাবুর বাড়ীর বারান্দায় দুইখানি মাদুর পাতিয়া আমি, অপূর্ব্ববাবু ও ডাক্তারবাবু গল্প করিতেছি, ছেলেমেয়েরা বারান্দার উভয়পার্শ্বে খেলা করিতেছে। কচি, সমু ও নমু মাদুরের প্রান্তভাগ ধীরে ধীরে উঠাইয়া ও পুনরায় প্রসারিত করিয়া খেলা করিতেছিল। হঠাৎ সকলের খেয়াল হইল ডাক্তারবাবুর বাড়ীর ভিতর হাঁস দেখিতে যাইবে। মানা, মুকু, নমু, সমু, কচি সকলেই ভিতরের দিকে দৌড়াইল। সমু দৌড়াইবার উপক্রম করিয়াই মাদুরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া পিছাইয়া আসিল এবং গুটান মাদুর দুইটির প্রান্তভাগ প্রসারিত করিয়া তবে হাঁস দেখিতে গেল। ততক্ষণে অন্যান্য সকলে হাঁস দেখিতে চলিয়া গিয়াছে কিন্তু সমু মাদুরটি ভাল করিয়া ছড়াইয়া দিয়া তবে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। আমি গল্প করিতে করিতে সমস্তই লক্ষ্য করিলাম। শৃঙ্খলার সহিত সুন্দরভাবে কাজ করিবার বুদ্ধি এখনও এই চারিবৎসর বয়স্ক বালকের হয় নাই অথচ পূর্ব্বজন্মের বলবান্ সংস্কারবশতঃ এইরূপ প্রবৃত্তি শৈশব হইতেই অঙ্কুরিত হইয়াছে। তাহার বুদ্ধির নানারূপ বিকাশ দেখিয়া আমার মনে হয় ভগবানের দয়ায় সুপথে চালিত হইলে এই বালক ভবিষ্যতে উন্নতি করিতে পারিবে। কচির স্বাস্থ্য সমুর অপেক্ষা অনেক ভাল। কচি অত্যন্ত দুরন্ত এবং সর্ব্বদাই বুভুক্ষু। প্রথম প্রথম কচি আমাকে 'দাদু' বলিত না, আমার সম্বন্ধে তাহার মাকে কিছু বলিতে হইলে "তোমাদের ঐ যে লোক" বলিয়া আমার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিত। ক্রমশঃ সে আমার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল, সমস্ত নাতিনাতিনীদিগের মধ্যে সেই আমার নিকট বেশীক্ষণ থাকিত ও আমার কাছে একাকী খেলা করিত। আমি বাহিরের ঘরে চেয়ারে বসিয়া কাজ করিতেছি, অথবা কাহারও

সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছি, কচি ঠিক আমার কাছে কাছেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছে অথবা আমার চেয়ারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। কচির সর্ব্বদাই ক্ষুধা এবং কিছু খাইতে হইলে আমার কাছে আসিয়া আব্দার করিত। তাহার মা'র কাছে বক্‌নি খাইলে সে আমার নিকট পলাইয়া আসিত, তাহার কুঞ্চিত ক্ষুদ্র ভ্রূযুগল দেখিলেই আমি তাহা অনুমান করিতে পারিতাম। আমি সান্ত্বনা দিলে প্রসন্নমুখে মধুরকণ্ঠে আমাকে বলিত "দাদুগো, আমার ক্ষিদে পেয়েছে যে" এবং আমি আমার বাহিরের ঘরে আলমারিতে রক্ষিত বিস্কুট অথবা লজেন্স দিলে আনন্দে তারকণ্ঠে গান আরম্ভ করিত। অনেকদিন তাহার গানের অর্থ সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু সেক্ষপীয়র, মিলটন, রবীন্দ্রনাথের কবিতা-ভেদিনী অধ্যাপকের বুদ্ধি লজ্জিত ও পরাজিত হইয়া কচির গানস্রোতের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। অরুণা হাসিয়া বলিত, "কচির সমস্ত সময় হয় ভ্রূকুটি আর না হয় গান—এই দুইটির মধ্য দিয়াই অতিবাহিত হয়, কচির তৃতীয় অবস্থা আর কিছুই নাই।" রণুকে আমি সময় সময় "ছোটকচি" বলিয়া ডাকিতাম। রণুকে প্রথম প্রথম আমি আদর করিতাম না, অপরিচিত এই নূতন অতিথি উঠানে মাদুরের উপর নীরবে পড়িয়া থাকিত, আদরের কোন দাবী করিতে সাহস করিত না। ক্রমশঃ রণ কোলে উঠিতে আরম্ভ করিল এবং কিছু দিনের পর হইতেই সকলের সহিত সমান আদরের অংশ দাবী করিতে লাগিল। ৩।৪টি ছোট ছোট দাঁত উঠিল, "ত্যা" "ত্যা" শব্দে বাড়ী মুখরিত হইতে লাগিল, আমাকে দেখিলেই ক্ষুদ্র বাহু দুইটি উচ্চদিকে প্রসারিত করিতে আরম্ভ করিল, আমার কোলে উঠিয়া ধীরে ধীরে আমার পিঠ থাবড়াইয়া তাহার আত্ম-প্রসাদ জ্ঞাপন করিতে লাগিল। রাত্রি তিনটার সময় উঠিয়া শুনিলাম, সম্মুখের নিস্তব্ধ অন্ধকার কক্ষ হইতে 'ত্যা', 'ত্যা' শব্দ উত্থিত হইয়া

বাড়ীর চারিদিকে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। করুণা গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত, অনেক ডাকিয়া তাহাকে তুলিলাম, রণু আমার ঘরে আসিল, নিদ্রাজনিত তাহার কোমল ও শিথিল অঙ্গযষ্ঠি আমি ক্রোড়ে তুলিয়া লইলাম, প্রসন্ন দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া অস্ফুট শব্দ করিতে লাগিল। অরুণার বড় মেয়ে মানা পড়াশুনা করিতে না হইলেই ভাল থাকে। তাহার মা তাহাকে মধ্যে মধ্যে বই পড়িতে বসাইত কিন্তু আমি দেখিতে পাইলেই মানাকে ছুটী দিতাম। মানার প্রধান কার্য্য ছিল তাহার ছোট দুরন্ত ভাইটিকে ঘরে আটকাইয়া রাখা অথবা ক্রোড়ে লইয়া বহন করা। দুইটি কাজই পরিশ্রমসাধ্য ব্যাপার, কারণ শঙ্কর যথেষ্ট স্থূলকায় ও দুরন্ত। উপরন্তু চীৎকার করিবার শক্তি শঙ্করের অসাধারণ। কোন অপরিচিত ব্যক্তিও তাহার গলার তীব্রতা ও প্রসারতা লক্ষ্য করিলে তাহাকে অধ্যাপকের দৌহিত্র বলিয়া সহজেই চিনিতে পারিবে। শঙ্কর চীৎকার করিলেই তাহার মা গল্প করিতে করিতে নীচের ঘর হইতেই মানাকে অকারণে তাড়না করিত—শঙ্কর সর্ব্বদাই নিরীহ, সুশীল, 'গো-বেচারী ছেলে এবং মানা সর্ব্বদাই তাহাকে অবহেলা করিয়া খেলা করিতেছে, ইহাই অরুণার ধারণা। এই সময়ে অরুণার বাল্যকালের একটা কথা আমার মনে পড়িত। অরুণার বয়স তখন প্রায় ৬।৭ বৎসর। তাহার মা মধ্যে মধ্যে কৌতুক করিয়া অরুণার সাক্ষাতে অপর কাহারও সহিত গল্প করিতে করিতে যেন অরুণা শুনিতে না পায় এইরূপ ভাণ করিয়া বলিত, "মাস্তুর (অরুণা) মা অনেকদিন আগে মরে গেছে, আমি মাস্তুর সৎমা। মাস্তু তা জানেনা, ও আমাকেই ওর আসল মা মনে করে।" অরুণা নিজের মা মরিয়া গিয়াছে শুনিয়া এবং বোধ হয় কতকটা সৎমা-ভীতির জন্য অজস্র রোদন করিত। মধ্যে মধ্যে একই অভিনয় হইত এবং অরুণার রোদনেরও বিরাম ছিল না। আমি মানাকে সময়

সময় বলিতাম যে, অরুণা হয়ত তাহার সৎমা নতুবা তাহার ঘাড়ের উপর শঙ্করের বোঝাটি সদাসর্ব্বদা এইরূপে চাপাইয়া দিতে পারিত না। মানা আমার কৌতুকটা গ্রহণ করিতে পারিত না কিন্তু জোরে জোরে মাথা নাড়িয়া দৃঢ়কণ্ঠে আমার কথার প্রতিবাদ করিত। আমি দেখিতাম বাল্যকালেই মাতার অপেক্ষা কন্যার বুদ্ধি ঢের বেশী পরিপক্ক। মানা মধ্যে মধ্যে বাহিরের ঘরে একলা বসিয়া দ্বিপ্রহরের সময় আমার গায়ে হাত বুলাইত অথবা পা টিপিয়া দিত, সেই সময় তাহার যতকিছু প্রয়োজনীয় কথা আমার সহিত হইত। মাছের মুড়া খাইতে তাহার অত্যন্ত ভাল লাগে, একটা বড় ডাবের সম্পূর্ণ জল ও শাঁস খাইবার ইচ্ছা তাহার অনেকদিন হইতে অপূর্ণ রহিয়াছে, রাত্রিতে ভাত অপেক্ষা লুচি তাহার অধিকতর রুচিকর,—এই সমস্ত মর্ম্মবাণী সে স্থান, কাল, পাত্র বিবেচনা করিয়া দ্বিপ্রহরের পর বাহিরের ঘরে আমার বিশ্রাম করিবার সময় আমাকে শুনাইত। করুণা তাহার ছেলেদের জন্য আমার ক্রয়-করা প্রচুর বিস্কুট, টফি, ও লেবেঞ্চুস্ বাক্সজাত করিয়াছে, মানা একদিন আমাকে বারংবার সেইকথা শুনাইল। আমি বহুক্ষণ চক্ষু মুদিয়া কথাগুলি না শুনিবার ভাণ করিলাম কিন্তু মানার অধ্যবসায়ের নিকট পরাজিত হইয়া অবশেষে মনঃসংযোগ করিতে হইল। মানাকে বলিলাম, "মেজমাসী আমার কাছে বিস্কুট টিস্কুট চায়, তাই আমি তাকে দিয়েছি। তোমার মা চায়না কেন ? তোমার মা চাইলেই তোমাদের জন্য বিস্কুট কিনে দিতে পারি।" মানা ধীরে ধীরে উত্তর করিল "আমার মা তো চাইবে না, আমার মার চাইতে লজ্জা করে। আমি চাইছি, এইবার আপনি দেবেন।" এক একদিন শঙ্কর-ভার-মুক্তা মানা উপরের বারান্দায় মন ও গলা খুলিয়া তান ধরিত—"চলো দিল্লী ফুকারকে।" শ্যামাঙ্গী ঝর্ণাসুন্দরী বাহিরে বড়ই ভালমানুষ কিন্তু প্রয়োজনের সময় অসাধারণ

বাক্‌নৈপুণ্য ও চাতুর্য্য প্রকাশ করিয়া থাকে। সুকু এইবার জ্বর ও সর্দ্দিতে বড়ই ভুগিয়াছে, অন্যসকলে আম, জাম, মাছ, সন্দেশ ইচ্ছামত খাইয়াছে, সুকু মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু খাইলেও যথেষ্ট পরিমাণে খাইতে পায় নাই। সমস্ত নাতিনাতিনীদিগের মধ্যে একমাত্র সুকু অত্যন্ত দুর্ব্বল শরীর লইয়াই কালীঘাটে ফিরিয়া যাইল। অরুণার সমস্ত মেয়েগুলির মধ্যে সুকুই পড়াশুনায় ভাল, পড়িবার আগ্রহও তাহার আছে। "কাণামাছি" বলিয়া একখানা ছড়ার বই সে আমার নিকট চাহিয়া লইয়াছিল এবং একদিনের মধ্যে সমস্ত বইখানি পড়িয়া ফেলিয়াছিল। চুরি করিয়া মাছ খাইবার অপরাধে এক বিড়ালকে গলায় দড়ি বাঁধিয়া গৃহস্থ টানিয়া লইয়া যাইতেছে, দূর হইতে কুকুর বিদ্রূপ করিয়া বলিতেছে "কাল যে বড় শুনেছিলাম চ্যাটাং চ্যাটাং কথা, আজ বিচুলির দড়ি গলায় দিয়ে যাওয়া হচ্ছে কোথা"। বিড়াল ঠকিবার পাত্র নহে সে উত্তর দিল, "তুলসীর মালা গলায় দিয়ে যাচ্ছি বৃন্দাবন।" এই ছড়াটি সুকুর বড়ই ভাল লাগিল এবং সেইটি বারংবার পড়িল এবং অপরকে শুনাইল। সুকুর আমাদের এখানে থাকিবার বড়ই ইচ্ছা কিন্তু তাহার অসুস্থ শরীরের জন্য আমি সাহস করিলাম না। নমু এবার আমার প্রতি পূর্ব্বের অপেক্ষা অধিকতর আকৃষ্ট হইয়াছিল। তাহার চোখ দুইটি বড়ই উজ্জ্বল এবং প্রতিভাব্যঞ্জক, মুখ যেন সুগঠিত ও তেজোদীপ্ত ছেলেদের মত। তাহার আধআধ কথাগুলি শুনিতে সকলেই ভালবাসে। নিজের ছোট ভাইকে "শঙ্কু" বলিতে পারে না "থঙ্কু" বলিয়া ডাকে, আরতিকে "থোত মাসিমা", সমুকে "থমু" বলে। একদিন উঠানে মাদুরের উপর সকলে বসিয়া খেলা করিতেছে, আমি বাহিরের ঘরে কাজ করিতেছি এবং উহাদিগকে লক্ষ্য করিতেছি। হঠাৎ নমু দ্বিতলের ঘরের দিকে তাকাইয়া তীব্রকণ্ঠে তাহার মাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল, "মা, থমু তোমার

খোকাকে ফেলে দিয়েছে।” তাহার মা সে কথায় কর্ণপাত না করায় বারংবার চীৎকার করিয়া তাহার মা’র দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিল এবং অবশেষে মাতৃক্রোধ উদ্দীপিত করিতে অক্ষম হইয়া সমুকে নানাবিধ ভাষায় তিরস্কার করিতে লাগিল। আমি বাহিরের ঘর হইতে দেখিলাম সমু তুচ্ছ একটা বালিকার চীৎকারের উত্তর দেওয়া পুরুষোচিত নহে ভাবিয়া নির্ব্বিকারমুখে মাদুরের উপর চীৎ হইয়া শুইয়া আছে। নমু থামিবার পাত্র নহে, অনর্গল স্পষ্ট ও অস্পষ্ট ভাষায় বিরক্তি প্রকাশ করিয়া নিজ ভ্রাতৃপ্রীতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে লাগিল। অবশেষে দেখিলাম সমু মাদুরের উপর উঠিয়া বসিল এবং দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, “আমায় তুমি চেন না? আমার কত বড় “হাঁ” দেখেছ?” এবং ক্ষুব্ধ বানরের মত যথাসাধ্য মুখব্যাদান করিয়া তাহার “দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি” নমুকে দর্শন করাইল। আমি বিস্ময়ের সহিত দেখিলাম যে, এই শুভ্র-দন্তপংক্তি-পরিশোভিত গোলাকার ক্ষুদ্র মুখখানি দেখিয়া ভীতদৃষ্টি নমু একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া গেল, তাহার স্ত্রীসুলভ কলহপ্রবৃত্তি মুহূর্ত্তের মধ্যেই কোথায় অন্তর্হিত হইল। এই দন্তরুচি কৌমুদীর একটা ইতিহাস আছে। যখন সমুর বয়স প্রায় দুই বৎসর তখন সে সুবিধা পাইলেই বড়ছোট নির্ব্বিশেষে সকলকেই হঠাৎ কামড়াইয়া দিত। আরতি নিজে একবার সমুর তীব্র দন্তাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া বহুক্ষণ রোদন করিয়াছিল। প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে সমু নমুকে কপালে অত্যন্ত জোরে কামড়াইয়া দিয়াছিল এবং সেই দন্তাঘাতের যন্ত্রণায় নমু ভীত ও অস্থির হইয়া তাহার মাতার ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। সেই তীব্র দন্তের স্মৃতি নমুর মনে তখনও বিদ্যমান সুতরাং “আমায় তুমি চেন না” বলিবামাত্রই হয়ত নমুর হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হইয়াছিল। তাহার উপর যখন “আমার কত বড় হাঁ দেখেছ?” বলিয়া হাঙ্গরের তীক্ষ্নধার সুসজ্জিত

দন্তপংক্তির মত ১৬।১৮টি ক্ষুদ্র অথচ ধারাল দন্তগুলির শক্তিমাহাত্ম্যের প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রদান করিতে প্রস্তুত হইল তখন নমুর মনের অবস্থা কি হইয়াছিল তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। অথচ নমু, সমু, কচির মধ্যে সাধারণতঃ প্রীতির বন্ধন পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ইহারা তিন-জনেই প্রায়ই একত্র হইয়া "গাড়ী গাড়ী" প্রভৃতি খেলা করে এবং সমু অথবা কচি নমুকে নাম ধরিয়া ডাকিলে তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে শাসন করিয়া "ছোটদিদি" বলিতে নমু শিক্ষা দেয়। সন্ধ্যাবেলা আমি চেয়ারে বসিয়া কাজ আরম্ভ করিলে নমু টেবিলের তলায় নিঃশব্দে প্রবেশ করিত এবং ধীরে ধীরে আমার পা টিপিতে আরম্ভ করিত। পা টেপা শেষ হইলে নমু আমার কাছে পয়সা দাবী করিত এবং দাদামহাশয়কে ভক্তিপ্রদর্শনের এইরূপ সাক্ষাৎ ফললাভ দেখিয়া সমুও মশার কামড় অগ্রাহ্য করিয়া টেবিলের তলায় ঢুকিয়া পড়িত। ভক্তির মূল্য প্রথম প্রথম চার পয়সাই ভক্তগণ যথেষ্ট বিবেচনা করিত কিন্তু ক্রমশঃ দর বাড়িতে আরম্ভ করিল এবং টাকা না পাইলে ভক্তগণ প্রকাশ্যভাবে বিরক্তি প্রকাশ কবিতে লাগিল। এই দুর্ম্মূল্য উৎকট ভক্তিব হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য কোন কোন দিন আমি সন্ধ্যাবেলায় চেয়ারে বসা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইতাম। শঙ্করনাথ গৌরবর্ণ ও প্রিয়দর্শন এবং তাহার চক্ষের চাহনি বড়ই উদার ও সুন্দর। তাহার মা'র বহু সাধ্যসাধনায় অনেকগুলি মেয়ের পর শঙ্কর আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে সুতরাং তাহার আদরের সীমা নাই। তাহার দীর্ঘজীবনের জন্য অবলম্বিত নানাবিধ উপায় ও বিধানের মধ্যে একটি তাহার মানৎকরা সুদীর্ঘ কেশরাশি। এই দারুণ গ্রীষ্মকালে সুদীর্ঘ কেশ-গুচ্ছের দ্বারা প্রাণ রাখিতে তাহার প্রাণান্তকর যন্ত্রণা আমি সময় সময় লক্ষ্য করিতাম। ঘর্ম্মাক্তকলেবর শিশুর স্কন্ধদেশ ঘামাচির প্রকোপে

সর্ব্বদাই রক্তবর্ণ। সুতরাং সময় সময় তাহার চুলগুলি ঝুঁটী বাঁধিয়া দেওয়া হইত বলিয়া তাহাকে পশ্চিমদেশীয় বালকের মত দেখাইত। তাহার ঘর্ম্মনিবারণের জন্য একখানি ইলেক্ট্রিক পাখা তাহার বাবা তাহার শয্যাকক্ষে পাঠাইয়া দিয়াছে তথাপি দেবতার নামে উৎসৃষ্ট-চুলগুলির একটিও কমাইবার উপায় নাই। আমি মনে মনে ভাবি যোগ, ভক্তি, জ্ঞান, ভগবানের প্রীতিলাভের উপায় বলিয়া শাস্ত্র নির্দ্দেশ করে, কিন্তু সুদীর্ঘ কেশ রাখিয়া ভগবানের দয়া পাইবার মত সুলভ পথ বাংলাদেশের মায়েরা আবিষ্কার করিয়া ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় কত সহজ ও সরল করিয়া দিয়াছে! শঙ্কর প্রথম প্রথম তাহার দাদামহাশয়কে উপেক্ষা করিয়া চলিত কিন্তু ক্রমশঃ সে 'দাদু' 'দাদু' শব্দ করিতে শিখিল এবং আমাকে দেখিলেই বিকালবেলা হস্ত প্রসারিত করিয়া বাহিরে বেড়াইতে যাইবার জন্য ইঙ্গিত করিত। পূর্ণিমার খুকী উমা আমাশয়ের পর রুগ্ন অবস্থায় আমাদের এখানে আসিয়াছিল এবং এখানে প্রায় একমাস থাকিয়া সুস্থ হইয়া তাহাদের বাড়ী ফিরিয়া যায়। উমার ক্ষুদ্র পৃথিবীতে তাহার মা, দাদামহাশয় ও সমু এই তিনজন ব্যতীত আর কেহই ছিল না। সময়ে অসময়ে আমার কোলে বসিতে পাইলেই উমা বড় খুসি হইত। সমুর সহিত উমার খুব ভাব, সমুই তাহার খেলা করিবার একমাত্র সাথী ছিল। আম খাইতে উমার বড়ই প্রীতি; এবং একখানি আমের ফালি হাতে দিলে উমা সংসারের সব দুঃখকষ্ট ভুলিয়া যাইত। সকালবেলা উমা, রণু ও শঙ্করের হাতে এক এক টুকরা আম দিয়া উঠানে বসাইয়া দেওয়া হইত এবং তিনজনে নিবিষ্টমনে অনাস্বাদিতপূর্ব্ব এই ফল অশেষ-যত্নসহকারে ভক্ষণ করিত। কেবল মধ্যে মধ্যে শঙ্কর নিজের আম্রখণ্ড শেষ করিয়া দুর্ব্বল উমা ও দুর্ব্বলতর রণুর দিকে ধাবিত হইত এবং কাড়িয়া খাইবার উপক্রম করিত। উমার

কাছে বিশেষ ঘেঁষিতে পারিত না, দূর হইতেই উমা তাহার দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া তীব্রকণ্ঠে চীৎকার করিলেই শঙ্করের বিজয় অভিযান স্থগিত হইত, কিন্তু স্থূলকায় 'ত্যা-ত্যা'-শব্দকারী রণু আম্রখণ্ডবঞ্চিত হইয়া তাহার সুবৃহৎ গোলাকার চক্ষু দুইটি শঙ্করের মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া নীরবে তাকাইয়া থাকিত। আমটি অপর একজন কাড়িয়া লইয়াছে এবং রণু তাহা আর খাইতে পাইবে না,—ইহা ধারণা করিতে স্থূলকায় ও স্থূলবুদ্ধি রণুর অনেক সময় কাটিয়া যাইত। মানা প্রভৃতি খোকাখুকীরা সকলেই তাহাদের দাদামহাশয়ের কাছে পয়সা দাবী করিবার জন্য সর্ব্বদাই সচেষ্ট থাকিত। তাহাদের চলিয়া যাইবার আগের দিন শনিবারে এক কৌতুককর ব্যাপার হইল। একটি নূতন ধামার ধারগুলিতে করুণা সুন্দররূপে দড়ি বাঁধিয়া ধামাটিকে মজবুত করিয়া দিয়াছিল। আরতি বিকালবেলা আমাকে সেই ধামাটি দেখাইলে আমি করুণার কর্ম্মকৌশলের প্রশংসা করিয়া তাহাকে একটাকা পুরস্কার দিলাম। কিছুদিন পূর্ব্বে শঙ্কর, অরুণা ও সুকুর গলার ভিতর তুলা দিয়া ঔষধ লাগাইবার জন্য করুণা টাকা পাইয়াছিল। এইরূপে করুণার পুনঃ পুনঃ অর্থপ্রাপ্তিযোগ দেখিয়া মানা ও সুকু চঞ্চল হইয়া উঠিল এবং দাদামহাশয়কে কায়দায় ফেলিয়া কিছু আদায় করিবার জন্য ভীষণভাবে মস্তিষ্ক পরিচালনা করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইয়াছে, আমি উঠানে মাদুর পাতিয়া বসিয়া আছি, হঠাৎ নমু আসিয়া বলিল "সুকু কেমন ব্যাগ বুনেছে দেখুন"। আমি তাকাইয়া দেখিলাম সুকু সিঁড়ির উপর বসিয়া উৎসুক নয়নে আমার দিকে লক্ষ্য করিতেছে এবং নমুর অভিযানের ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। একটি জীর্ণবস্ত্রখণ্ড জীর্ণতর সুতা দিয়া বাঁধা দেখিয়া তাহাকেই আমি ভাল ব্যাগ বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইলাম এবং সুকুকে একটাকা

পুরস্কার দিবার জন্য আরতিকে আদেশ করিলাম। মানা নীরবে আমার নিকট বসিয়াছিল, সে স্তুকুর পুরস্কারপ্রাপ্তি দেখিয়া হঠাৎ উঠিয়া দ্বিতলে চলিয়া গেল। মানার এই ঊর্দ্ধগতি গুরুতর সন্দেহজনক বলিয়া মনে হইল এবং পুরস্কার দিতে দিতে অবশেষে দেউলিয়া হইবার আশঙ্কায় আমার হৃদ্‌স্পন্দন উপস্থিত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিলাম একখানি-টুক্‌রা কাগজ হাতে লইয়া ঝর্ণাস্বন্দরী অপেক্ষাকৃত দ্রুতগতিতে নামিয়া আসিতেছে। কাগজ দেখিয়া আপনাকে নিরাপদ ভাবিতেছি এমন সময় মানা কাগজখানি দিয়া বলিল, "একটা আতা এঁকেছি"। একটি গোলাকার-সদৃশ অদ্ভুত রেখাকে সুন্দর আতা বলিয়া স্বীকার করার মত এতবড় মিথ্যা কথা বলিতে বিবেকবুদ্ধিতে আঘাত লাগিলেও অবস্থা-বৈগুণ্যে তাহাও আমাকে মানিয়া লইতে হইল এবং পুনরায় একটাকা পুরস্কার ঘোষণা করিতে বাধ্য হইলাম। এদিকে নমু স্তুকুর জন্য দালালী করিয়াও "কমিশন" কিছু না পাইয়া ধীরে ধীরে দ্বিতলে চলিয়া গেল এবং একখানি জীর্ণ খবরের কাগজের প্রান্তে পেন্সিলে দুইটি ক্ষীণ আঁচড় কাটিয়া আমাকে আসিয়া বলিল "দাদু, আপনাকে চিঠি লিখেছি"। চিঠির কাগজের, পেন্সিলের এবং হাতের লেখার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া, একটি টাকা নমুকে পুরস্কার দিলাম। এইরূপে আমার বাক্সর সব কয়টি টাকা নিঃশেষিত হইতে দেখিয়া আমি সমু ও অমুর কোন কারুকার্য্য দেখিতে হইবার ভয়ে চটিজুতা-জোড়াটি পরিয়া বাড়ীর সীমানা কাটাইয়া একেবারে ডাক্তারবাবুর বারান্দায় যাইয়া উপস্থিত হইলাম। এইরূপে মানা, স্তুকু ও নমু দাদামহাশয়ের নিকট হইতে পয়সা আদায় করিয়া খুসী হইল, বোধ হয় অরুণাও তাহার মেয়েদের বুদ্ধিপ্রাখর্য্যে কম খুসি হয় নাই। করুণা হয়ত তাহার ছেলেদের উদাসীনতা দেখিয়া তাহাদের বুদ্ধিহীনতার কথা

বারংবার মনে মনে আলোচনা করিতেছিল কিন্তু আমি আর বাড়ীর ভিতর থাকিতে ভরসা না করিয়া বাহিরে যাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিলাম। এই সমস্ত নানাবর্ণের, নানাআকৃতির, নানাস্বভাবের শিশু-বৃন্দকে, অরুণা, করুণা, পূর্ণিমা, ও আরতি যখন আদর করিত অথবা বিব্রত হইয়া তিরস্কার করিত তখন আমার যৌবনের কথা মনে পড়িত, সুখ-দুঃখ-রোগ-শোকের ভিতর দিয়া মেয়েগুলিকে কি করিয়া মানুষ করিতে হইয়াছিল তাহার চিত্র সুস্পষ্টরূপে আমার মনের সম্মুখে উপস্থিত হইত। আমি সংসার-ধর্ম্ম শেষ করিয়াছি, মেয়েরা সংসার করিতেছে, আবার ইহারাও সংসারের কাজ শেষ করিয়া আমার মত বৃদ্ধ বয়সে আজিকার বালকবালিকাগুলিব সংসার করা দূর হইতে লক্ষ্য করিবে। সময়স্রোতে মানুষ এইরূপেই দূর হইতে দূরে উপনীত হইতেছে, একস্থানে দাঁড়াইয়া থাকিবার শক্তি কাহারও নাই, দুর্ব্বার সংসারস্রোত তাহাকে অবিরত ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছে। এই সমস্ত মনে রাখিয়া এই দেড়মাস আমি অশেষ উদ্যম ও উৎসাহ সহকারে সংসার করিয়াছি, কোলাহলের মধ্যে বাস করিয়াছি, রোগের ঔষধ আনাইয়াছি, প্রয়োজনাতিবিক্ত মাছ, দুধ, সন্দেশ, প্রভৃতি কিনিয়া কিছুদিন তাহাদের তৃপ্তি ও বিশ্রামের জন্য চেষ্টা করিয়া মহামায়ার ইচ্ছা ও আদেশে আমার সংসাব-জীবনের কর্ত্তব্য শেষ করিবার আশা করিয়াছি এবং প্রতিদিন প্রার্থনা করিয়াছি যে, পরজন্মে যেন আর সংসারী হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে না হয়।

(১০)

১০ই জুন বিকালে কাজকর্ম্ম সারিয়া বাহিরের ঘরে বসিয়া আছি, আরতি তাহার খাবার লইয়া ধীরে ধীরে বাহিরের ঘরে প্রবেশ করিল

এবং মেজেয় বসিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। পূর্ব্বদিন অন্যান্য মেয়েরা শ্বশুর বাড়ী চলিয়া যাওয়ায় বাড়ী নিস্তব্ধ। আরতির জলখাবারের দিকে তাকাইলাম—একবাটি দুধ, চারটি সন্দেশ, আনারসের কতকগুলি টুকরা এবং দুইটি মর্ত্তমান কলা। প্রত্যহই এইরূপ খাবারের জোগাড় হয় না কিন্তু আরতির মন খারাপ থাকিলে আহার্য্যদ্রব্যের পরিমাণ অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, ইহা আমাদের সর্ব্বজনবিদিত। আরতি খাইতে খাইতে গল্প আরম্ভ করিল। বড় ডাক্তারবাবুর ছোট মেয়ে অমলা পুরাতন বেনারসী লইতে না চাওয়ায় তাহার বাবা নূতন বেনারসী কিনিয়া দিয়াছিলেন এবং বিবাহের পর অমলা যতবার পিত্রালয়ে আসিত ততবারই বড় ডাক্তারবাবু তাহাকে একছড়া করিয়া হার দিতেন। আমি পুরাতন বেনারসীর কথা শুনিয়া একবার ভাবিয়া দেখিলাম, আমাদের বাড়ীতে পুরাতন বেনারসী নাই, সুতরাং বড় ডাক্তারবাবুর এই কার্য্যের সর্ব্বতোভাবে অনুমোদন করিলাম কিন্তু প্রত্যেক বারেই একছড়া করিয়া হার দেওয়ার কথায় ভীত হইয়া সম্পূর্ণ তূষ্ণীভাব অবলম্বন করাই যুক্তিযুক্ত মনে করিলাম। আরতি অনেকক্ষণ ধরিয়া আহার করিল এবং দিদিদের ছেলেমেয়েদের কথা আলোচনা করিয়া ভিতর বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল, আমি ডাক্তার বাবুদের বারান্দায় গল্প কবিতে যাইলাম।

(১১)

১লা জুলাই বেলা প্রায় ১১॥০টার সময় উঠানে বসিয়া আছি এমন সময় ঠাকুর আসিয়া সংবাদ দিল, টেলিগ্রাম লইয়া পিওন বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে। আমি তাড়াতাড়ি বাহিরে যাইয়া টেলিগ্রাম লইলাম। বিনয় টেলিগ্রাম করিয়াছে "Mother expired taking Halisahar

Ghat" (মা মারা গিয়াছেন, মৃতদেহ হালিসহর ঘাটে লইয়া যাইতেছি)।

বহুদিন হইতেই মা ভুগিতেছিলেন, তথাপি এই সংবাদে হঠাৎ মুহ্যমান হইয়া পড়িলাম। বিনয় কাঁচড়াপাড়া হইতে ৩০শে জুন টেলিগ্রাম করিয়াছিল এবং আমি পরদিন বেলা ১১৷৷০টায় পাওয়ায় হালিসহর শ্মশানে সময়মত যাইতে পারিলাম না। আজকাল টেলিগ্রাম অত্যন্ত দেরীতে আসে, কোন কোন টেলিগ্রাম চিঠির অপেক্ষাও দেরীতে বিলি হয়। বিনয় যদি টেলিগ্রাম না করিয়া কাঁচড়াপাড়া হইতে কোন লোক দিয়া আমাকে সংবাদ দিত তাহা হইলে হালিসহর শ্মশানে মৃতদেহ পৌছিবার পূর্ব্বেই আমি ট্রেনে করিয়া তথায় উপস্থিত হইতাম। বিনয়ের ১লা জুলাই লিখিত পত্র আমি ২রা জুলাই বিকালে পাইলাম, এবং তাহাতে সমস্ত ব্যাপারটি বিশদভাবে বুঝিতে পারিলাম। বিনয় লিখিয়াছিল, "দাদা, গত ১৪ই আষাঢ় ২৯শে জুন শনিবার রাত্রি ১২.৪৫ মিনিটের সময় (Standard time) গত ৭।৮ মাস দারুণ রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া মা সমস্ত যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। দেহত্যাগের ২।৩ মিনিট পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বেশ জ্ঞান ছিল। রাত্রি ১০-৩০ মিনিটের সময় থেকে হাত-পা ঠাণ্ডা হইতে থাকে এবং নাড়ির অবস্থা খারাপ হইয়া যায়। তখন মাকে ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ করিতে বলি। জিজ্ঞাসা করায় বলেন, নাম করিতেছেন। সেই সময় মুখ শুকাইতে থাকে, মধ্যে মধ্যে দুধ ও গঙ্গাজল দিতে থাকি এবং মধ্যে মধ্যে তারক-ব্রহ্ম নাম শুনাইতে থাকি। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি আশীর্ব্বাদ করিয়া গিয়াছেন।............।"

আমি এই পত্রের উত্তর বিনয়কে পরদিন দিলাম এবং লিখিলাম যে, টেলিগ্রাম না করিয়া লোক পাঠাইলে আমি সময়মত হালিসহর শ্মশানে উপস্থিত হইয়া মুখাগ্নি প্রভৃতি অন্যান্য কার্য্য করিতে পারিতাম।

যাহা হউক মা বহুদিন সংসার করিয়াছিলেন সুতরাং সংসারের প্রতি মার বিতৃষ্ণা হওয়াই স্বাভাবিক। ইহার পর ইষ্ট মন্ত্র স্মরণ করিতে করিতে তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন। সংসারে বিতৃষ্ণা এবং মৃত্যুকালে ইষ্টমন্ত্র স্মরণ—ইহার যে কোনটি হইলেই জীবের আর পুনর্জন্ম হয় না সুতরাং মা মুক্তিলাভ করিয়াছেন জানিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি। আমার এই পত্রের উত্তরে ১৫।৭ তারিখে বিনয় লিখিয়াছিল, "......আমার ধারণা ছিল না যে, কাঁচড়াপাড়া হইতে Telegram চিঠির চেয়েও দেরী হয়।.........মুখাগ্নি আপনার দ্বারাই সম্পন্ন হওয়া উচিত ছিল, সেইজন্য আপনার মনে দুঃখ হইতে পারে। আমার বুঝিবার ভুল এবং অজ্ঞাত ত্রুটীর জন্য আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন।........."

আমি কলিকাতায় শ্রাদ্ধাদিকর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলাম। মৃত্যুকালে মার বয়স ৭২ বৎসর ১১ মাস হইয়াছিল। আমাকে স্নেহ করিবার যে একমাত্র লোক পৃথিবীতে অবশিষ্ট ছিলেন, মার মৃত্যুতে সে স্নেহের উৎস ইহজীবনের মত শুকাইয়া গেল।

২রা জুলাই গ্রীষ্মাবকাশের পর কলেজ খুলিল, আমি অশৌচ বলিয়া কলেজ হইতে দশদিনের ছুটী লইলাম।

৮ই জুলাই তারিখের এক নূতন অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিতেছি। সেদিন মার মৃত্যুর দশম দিবস, গঙ্গাতীরে মস্তক মুণ্ডন করিয়া স্নান-সমাপনান্তে বেলা ১২টার সময় বাড়ী ফিরিয়া বাহিরের ঘরে চেয়ারে বসিয়া আছি—আরতি ভাঁড়ার ঘরে আমার হবিষ্যান্ন প্রস্তুত করিতেছে। রাস্তায় জনৈক স্ত্রীলোক আমাকে "বাবু" বলিয়া ডাকায় সেইদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম তিনজন মধ্যপ্রদেশীয় 'ঘাগ্‌রাপরা' স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া আছে। তাহাদের মধ্যে একজন বলিল যে, তাহারা মধু বিক্রয় করিয়া অনেক রেজকী পাইয়াছে, টাকা মনিঅর্ডার করিবার জন্য পোষ্টাফিসে

যাইবে, খুচরা পয়সা লইয়া যাতায়াত করা এবং মনিঅর্ডার করা অসুবিধা সুতরাং যদি আমি কিছু রেজকী লইয়া তাহার পরিবর্ত্তে দশটাকার নোট দিই তাহা হইলে তাহাদিগের বড়ই উপকার হয়। দ্বিপ্রহরে স্ত্রীলোকগুলির পরিশ্রান্ত দেহ, শুষ্ক মুখ ও মলিন বসন দেখিয়া আমার মনে দয়ার উদয় হইল এবং রেজকীর প্রয়োজন না থাকিলেও তাহাদের অনুরোধ রক্ষা করিবার জন্য আরতিকে নোট আনিতে বলিলাম। আরতি তখন হবিষ্যান্ন প্রস্তুত করিতেছিল, সে আমার কথায় বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিল যে, যথেষ্ট রেজকী বাড়ীতে আছে, আর প্রয়োজন নাই। আমি আরতিকে তিরস্কার করিয়া বলিলাম, "বাড়ীতে রেজকী আছে জানি কিন্তু এই পথশ্রান্ত স্ত্রীলোকগুলির একটু উপকার করা হইবে বলিয়াই রেজকী লইতেছি। এই সামান্য উপকার করিতে বিরক্তি প্রকাশ করা উচিত নহে।" আরতি দ্বিতলে নোট আনিতে চলিয়া গেল, আমি ইতিমধ্যে রাস্তার দরজা খুলিয়া স্ত্রীলোকগুলিকে বাহিরের ঘরের ভিতর আসিতে বলিলাম। ঘরের ঠিক প্রবেশ দরজায় একটি ২৫।২৬ বয়স্কা স্ত্রীলোক বসিল, ভিতরে মেজের উপর আমার সম্মুখে দুইজন ৩৫।৩৬ বয়স্কা স্ত্রীলোক পাশাপাশি দুই হস্তের ব্যবধানে বসিল। আমি ইহাদের নিকটে মেজের উপর পরিষ্কৃত স্থানে বসিয়া তাহাদের প্রদত্ত রেজকী গুণিয়া এক এক টাকা করিয়া সাজাইতে লাগিলাম। ত্রিশ টাকার রেজকী সাবধানে নিজহস্তে গুণিয়া সাজাইয়া রাখিবার পর আমার সম্মুখে বামদিকে উপবিষ্ট স্ত্রীলোকটি "বাবু, আরও কিছু রেজকী নাও" বলিয়া হঠাৎ অকারণে তাহার একটি অঙ্গুলির দ্বারা আমার কপালের মধ্যস্থল স্পর্শ করিল। এইরূপে আমাকে স্পর্শ করায় আমি বিরক্তি প্রকাশ করিলাম। পার্শ্বস্থিত স্ত্রীলোকটি তখন এক এক থাক সাজান রেজকী হাতে করিয়া টানিয়া মেজের উপর এক দুই করিয়া গুণিয়া স্তূপীকৃত

করিতে লাগিল। আমি বলিলাম, "আমি গুণিয়াছি, ত্রিশটাকা ঠিক রহিয়াছে, পুনরায় এক দুই করিয়া গুণিয়া গাদা করিবার প্রয়োজন নাই।" পরে সমস্ত রেজকীগুলি আমি নিজ হস্তে একটি টীনের কৌটায় তুলিয়া লইলাম এবং স্ত্রীলোকটির সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে ঠিক একভাবেই গুণিয়া ও সাজাইয়া আরও ১৭৲ টাকার রেজকী লইলাম। ঠিক পূর্ব্বের ত্রিশ টাকার মত এই ১৭৲ টাকার সাজান রেজকীগুলিকে স্ত্রীলোকটি পুনর্ব্বার এক দুই করিয়া গুণিয়া একজায়গায় গাদা করিয়া রাখিল এবং আমি নিজহস্তে সেগুলিকে একটি টীনের কৌটায় পুরিলাম। মোট ৪৭৲ টাকার রেজকী লওয়া হইল। পাছে হস্তকৌশলের দ্বারা তাহারা দুই-চার আনা পয়সা সরাইয়া ফেলে ইহা সন্দেহ করিয়া আমি সমস্ত সময়ই তাহাদের উপর ঈগলের মত সতর্ক দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম, এক মুহূর্ত্তের জন্যও আমার সতর্ক চক্ষু রেজকীর দিক হইতে সরাইয়া লই নাই, বাহিরে দাঁড়াইয়া আরতিও রেজকী গোণা লক্ষ্য করিতেছিল। পরে ইহারা খাবার চাহিল কিন্তু বাড়ীতে খাবার না থাকায় আমি দিতে পারিলাম না। স্ত্রীলোকগুলি যেন অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে চলিয়া যাইল। ইহারা চলিয়া যাইলে বাহিরের দরজা বন্ধ করিতে করিতে ঈষৎ হাসিয়া আরতি আমাকে বলিল, "এদের চেহারা ডাইনীর মত, আমার ভয় কর্চ্ছিল।' অপরাহ্নকালে অবসরমত টীনের রেজকী গুণিতে যাইয়া আরতি দেখিল যে ৪৭৲ টাকার স্থলে মাত্র ২৩৲ টাকা রহিয়াছে অর্থাৎ ২৪৲ টাকার রেজকী কম।

আমি এই অদ্ভুত ঘটনায় বিস্মিত হইয়া ঘটনাপরম্পরাগুলি চিন্তা করিয়া দেখিতে লাগিলাম। আমি মূর্খের মত তাহাদের সম্মুখে অসাবধান হইয়া বসিয়া থাকি নাই, আমি আমার সমস্ত মন ও ইন্দ্রিয় নিয়োগ করিয়া তাহাদের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছিলাম। অপরে কেহ এইভাবে ঠকিলে

আমি তাহাকে বোকা এবং অসাবধান বলিতাম। আমি গঙ্গাস্নান সমাপনান্তে অতি শুদ্ধ মন হইয়া চেয়ারে বসিয়াছিলাম, অথচ গঙ্গাস্নাত ব্রাহ্মণের শুদ্ধমনকে পরাজিত করিয়া তাহাদের অতীন্দ্রিয়শক্তি আমাকে অভিভূত করিল এবং ২৩৲ টাকা দিয়া তাহারা আমার চক্ষের সম্মুখে ৪৭৲ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া চলিয়া যাইল। এই সাধারণ পথচারিণী মলিনবেশা দরিদ্র স্ত্রীলোকগুলির কি অদ্ভুত শক্তি তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলাম। হবিষ্যান্ন খাইবার সময় শরীরের ভিতর যেন একটা অস্বচ্ছন্দতা অনুভব করিয়াছিলাম। অন্যদিন যেরূপ তৃপ্তির সহিত হবিষ্যান্ন গ্রহণ করি এইদিন তাহা হয় নাই অথচ তখনও জানিনা স্ত্রীলোকগুলি আমাকে ঠকাইয়া গিয়াছে। স্ত্রীলোকটির অশুচি-স্পর্শজনিত আমার শরীরে যে প্রতিক্রিয়ার উদয় হইয়াছিল তাহা প্রায় অপরাহ্নকাল পর্য্যন্ত উপস্থিত ছিল। সন্ধ্যাবেলা ছোট ডাক্তারবাবু, সান্ন্যালমহাশয় প্রভৃতি বন্ধুবান্ধবদিগের নিকট সমস্ত ঘটনা বলিলাম। তাঁহারা কেহ বলিলেন Hypnotism, কেহ বা বলিলেন সিদ্ধাই। সাধারণ মানুষে এইরূপ অদ্ভুত ক্ষমতা অর্জ্জন করিতে পারে আমার ধারণা ছিল না।

(১২)

২০শে জুলাই বি. এ. পরীক্ষার ফল বাহির হইল, I. A. ও I. Sc. পরীক্ষার ফল কিছুদিন পূর্ব্বেই বাহিব হইয়াছিল। এইবার যে কয়জন ছাত্র ও ছাত্রীকে প্রাইভেট পড়াইয়াছিলাম, তাহারা সকলে কৃতকার্য্য হওয়ায় বড়ই সুখী হইলাম। এমন অখণ্ড সফলতা আমাব জীবনে পূর্ব্বে আর কখনও হয় নাই। শ্রীমান বিশ্বনাথ দত্ত (৫২ নং সারপেনটাইন লেন) রিপণ কলেজ হইতে I. Sc. পরীক্ষা দিয়াছিল, তাহাকে সপ্তাহে তিন দিন বাড়ীতে যাইয়া পড়াইয়া আসিতাম। গতবৎসর বিশ্বনাথ পাশ করিতে পারে নাই, এই বৎসর প্রায় ৬ মাস আমার নিকট পড়িয়া সে দ্বিতীয় বিভাগে কৃতকার্য্য হইল। শ্রীমান শীতলপ্রসাদ মিত্র (৫নং সনাতন শীল লেন)

প্রেসীডেন্সী কলেজ হইতে পরীক্ষা দিয়াছিল, সে সপ্তাহে তিনদিন আমার বাড়ীতে আসিয়া পড়িয়া যাইত। গতবৎসর শীতল প্রসাদ অকৃতকার্য্য হইয়া এইবার পরীক্ষার মাত্র দেড়মাস পূর্ব্ব হইতে আমার নিকট পড়িয়াছিল। সে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইল। শীতল প্রসাদের পিতার নাম ডাক্তার S. C. Mitra, গ্রাম বিরটি, পোষ্ট হরিণখোলা, জেলা হুগলী। শ্রীমান গুণেন্দ্রকুমার দাশ (৯নং জাষ্টিস চন্দ্রমাধব রোড, ভবানীপুর) রিপণ কলেজ হইতে বি. এ. পরীক্ষা দিয়াছিল। তাহাকে সপ্তাহে তিনদিন ভবানীপুরে পড়াইতে যাইতাম। গতবৎসর অকৃতকার্য্য হইয়া গুণেন্দ্র পরীক্ষার প্রায় ৭ মাস পূর্ব্ব হইতে আমার নিকট পড়িতে-ছিল। গুণেন্দ্র পাশকোর্সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। শ্রীমান কুমারকৃষ্ণ সেন (৩নং ব্যাপটিষ্ট রোড, সালকিয়া) স্কটীশ চার্চ্চ কলেজ হইতে বি. এ. পরীক্ষা দিয়াছিল, সে সপ্তাহে তিনদিন আমার বাড়ীতে আসিয়া পড়িয়া যাইত। কুমার যখন I. A. পরীক্ষা দেয়, তখন কয়েক মাস আমার নিকট পড়িয়াছিল। এইবার কুমার পরীক্ষার পূর্ব্বে প্রায় ৭ মাস আমার নিকট পড়িয়া পাশকোর্সে কৃতকার্য্য হইল। শ্রীমান অশ্বিনী কুমার বোস (৫৫নং চক্রবেড়িয়া রোড, নর্থ, ভবানীপুর) স্কটীশ চার্চ্চ কলেজ হইতে বি. এ. পরীক্ষা দিয়াছিল। সে সপ্তাহে তিনদিন আসিয়া আমার নিকট পড়িয়া যাইত। কুমার ও অশ্বিনী একসঙ্গে আমার নিকট পড়িত। অশ্বিনী বি. এ. পাশকোর্সে পাশ করিল। পাশাং ডোমালা (৪০বি, বাদুড় বাগান ষ্ট্রীট) ভিক্টোরিয়া কলেজ হইতে বি. এ. পরীক্ষা দিয়াছিল, আমি সপ্তাহে তিনদিন তাহাদের বাড়ীতে যাইয়া পড়াইতাম। পাশাং খাসিয়া নেপালী মেয়ে কিন্তু পরিষ্কার বাংলা বলিতে পারিত। কখনও কখনও আমাদের বাড়ীতে আসিয়া পাশাং আরতির সঙ্গে বাংলায় গল্প করিত। পাশাংয়ের পিতা দার্জ্জিলিং-এ ব্যবসা করিতেন। মেয়েটি

বড়ই ধীর ও শান্তস্বভাবা ছিল। গত বৎসর পাশাং বি. এ. পাশ করিতে পারে নাই—এই বৎসর পরীক্ষার পূর্ব্বে তিনমাস আমার কাছে পড়িয়াছিল। সে পাশকোর্সে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। এই বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ে I. Sc. পরীক্ষায় শতকরা ৪৭ জন মাত্র এবং বি. এ. ৫২ জন মাত্র কৃতকার্য্য হয়। সুতরাং পরীক্ষা কঠিন হওয়া সত্ত্বেও আমার ছাত্রছাত্রীগুলি কৃতকার্য্য হওয়ায় আমি বড়ই প্রীতি লাভ করি। যে কয়দিন তাহাদের পরীক্ষা হইয়াছিল, প্রত্যহই আমি তাহাদের কল্যাণের জন্য বিশ্বজননীর চরণে আমার প্রার্থনা নিবেদন করিতাম। আমার পরম সৌভাগ্যবশতঃ সকল সময়েই আমি বিনীত ও ভদ্র ছাত্র-ছাত্রী পড়াইয়াছি। আমার দুঃখবহুল জীবনের এই একমাত্র সুখ আমার অধ্যাপক জীবনে চিরদিন অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। এই বৎসরের ছেলেরা সকলেই পরীক্ষার পর বারংবার হাসিমুখে আসিয়া আমার সহিত দেখা করিয়াছে। পরীক্ষার চিন্তাভারমুক্ত তাহাদের উজ্জ্বল মুখগুলি দেখিয়া মনে যে কত প্রীতি ও অহঙ্কারের উদয় হইয়াছে তাহা লিপিবদ্ধ করিতে পারিব না। একদিন আমি চলিয়া যাইব, তাহারা থাকিবে, যদি কখনও তাহারা এই লেখা পড়ে তবে তাহাদের মনে পড়িবে যে, তাহাদের সহিত কেবলমাত্র অর্থের আদানপ্রদানজনিত বিদ্যাদানের ব্যবসা আমি করি নাই, আমি তাহাদিগকে ভালবাসিতাম, তাহাদের পরীক্ষার দিন আমার স্নেহ-শঙ্কিত মনে মুহুর্মুহুঃ তাহাদের পরীক্ষার চিন্তা উদিত হইত। সেই সময় অবসর পাইলেই আমার চিরদিনের উপাস্যদেবী চণ্ডীমাতার নিকট যাইয়া দাঁড়াইতাম, মানসচক্ষুর সম্মুখে ছাত্রছাত্রীদিগের প্রত্যেকের মুখ উপস্থিত হইত, পরীক্ষার ঘরে টুলের উপর বসিয়া তাহারা প্রশ্নমালার উত্তর দিতেছে দেখিতে পাইতাম, আমি বিশ্বজননীকে সঙ্গে লইয়া তাহাদের পার্শ্বে দাঁড়াইতাম, বিশ্বজননীর মহাভয়বিনাশী অভয়হস্ত আমি ধারণ

করিয়া তাহাদের প্রত্যেকের শঙ্কিতবক্ষে বুলাইয়া দিতাম, আর দেখিতাম সেই পরীক্ষাতাপিতবক্ষ অভয়করস্পর্শে শীতল হইয়া যাইতেছে। আমার এই স্নেহের বেদনা ছাত্রেরা জানে না। সর্ব্বস্বার্থ ও মলিনতা-বর্জ্জিত চির-উজ্জ্বল সম্বন্ধ আমি আমার ছাত্রগণের সহিত ইহজীবনে স্থাপিত করিয়াছি।

(১৩)

১লা আগষ্ট, বৃহস্পতিবার, বেলা ১১টার সময়, কৃষ্ণপ্রসন্নের পিতা শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত মহাশয় সাঁইথিয়ায় হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন। কিছুদিন পূর্ব্বে কৃষ্ণ তাহাব ছেলে ও জামাইকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় বেড়াইতে আসিয়াছিল। ২৮শে জুলাই রাত্রি ৮টার সময় কৃষ্ণ ও তাহার ছেলেপীলেরা আমার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইতে আসিয়াছিল, ৩১শে জুলাই বুধবার রাত্রি ১১টার ট্রেনে সাঁইথিয়ায় ফিরিয়া যায়। রাত্রিতে বিভূতিবাবুর সহিত নানাবিধ কথা-বার্ত্তা কহিয়া কৃষ্ণ শয়ন করিল। পরদিন বিভূতিবাবু কৃষ্ণর সহিত অনেক বৈষয়িক কথাবার্ত্তা কহিলেন, স্নান-আহার সম্পন্ন করিয়া সুস্থচিত্তে নিজ শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। শয্যায় উপবেশন করিয়া জল খাইয়া হঠাৎ বেলা ১১টার সময় তিনি দেহত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর সময় যদি কৃষ্ণ কলিকাতায় থাকিত তাহা হইলে কৃষ্ণপ্রসন্নের অনুতাপের সীমা থাকিত না। বিভূতিবাবু আমাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন, তাঁহার মৃত্যু সংবাদে আমি মর্ম্মাহত হইলাম। সাঁইথিয়া ও বাংলাদেশ একজন আত্মীয়প্রতিপালক, দয়ালু, বিশালহৃদয় খাঁটি মানুষ হারাইল।

(১৪)

১৬ই আগষ্ট কলিকাতার ইতিহাসে এক মসীচিহ্নিত দিন। হিন্দু ও মুসলমান সহরবাসীর সংঘর্ষের ফলে ১৬ই আগষ্ট হইতে আরম্ভ করিয়া

২।৩ দিন ব্যাপী যে নররক্তের স্রোত এই নগরীর বক্ষের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহার তুলনা ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিরল। কয়েকদিনের মধ্যেই পাঁচসহস্রাধিক নরনারী পশুর মত নিহত হইল। কত হিন্দুসংসার নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে, শিশু ও নারী নিহত হইয়াছে, দোকানপত্র লুণ্ঠিত ও অগ্নিদগ্ধ হইয়াছে, তাহার নির্ণয় নাই। স্বর্ণরৌপ্য প্রভৃতিতে প্রায় ত্রিশকোটী টাকার সম্পত্তি লুণ্ঠিত ও বিনষ্ট হইয়াছে। স্থানে স্থানে রাস্তার উপর মৃতদেহ ৫।৬ দিন পড়িয়া ছিল, শকুনি নামিয়া সেই সমস্ত মৃতদেহ ভক্ষণ করিতেছিল, রাস্তার বড় বড় ড্রেনগুলি মৃতদেহপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। স্বাভাবিক ব্যাধির ফলে যে সমস্ত লোক মারা গিয়াছিল, তাহাদের মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া যাইতে পারা যায় নাই, বাড়ীর ভিতর ৪।৫ দিন পচিতেছিল। কিছুদিন পরে মিলিটারী Lorry আসিয়া রাস্তার ও বাড়ীর ভিতরের মৃতদেহ কুড়াইতে আরম্ভ করে এবং স্তূপীকৃত করিয়া পুড়াইবার অথবা গোর দিবার ব্যবস্থা করে। স্তূপের মধ্যে কত হিন্দু শবের গোর দেওয়া হইয়াছে, কত মুসলমানের মৃতদেহ পুড়াইয়া ফেলা হইয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। কয়েকদিন গলিত শবের দুর্গন্ধে কলিকাতার বায়ু দূষিত হইয়া মানুষের বাসের অযোগ্য হইয়া উঠিয়াছিল। কলিকাতার স্থানে স্থানে অগ্নিদগ্ধ দোকান-পাট ও বাড়ী যেন শ্মশানের চিত্র আঁকিয়া এখনও দাঁড়াইয়া আছে। সশস্ত্র মুসলমান জনতার অতর্কিত আক্রমণে হিন্দুরা অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে—হিন্দুজীবন ও সম্পত্তি বিশেষভাবে বিনষ্ট হইয়াছে। চিরদিনই হিন্দুজাতি শত্রুর এইরূপ অতর্কিত আক্রমণে বিপদগ্রস্ত হইয়াছে, প্রাণ হারাইয়াছে, রাজ্য হারাইয়াছে অথচ সময় হইতে সাবধান এবং প্রস্তুত হইবার বুদ্ধি এই জাতির মধ্যে এখনও প্রবুদ্ধ হইল না। আজ ২৩শে সেপ্টেম্বর আমার এই স্মৃতি লিপিবদ্ধ করিতেছি, এখনও সহরে

শান্তি পুনঃস্থাপিত হয় নাই, গতকল্য রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটের নিকট বেলা তিনটার সময় একদল মুসলমান একটি হিন্দুবাড়ীতে প্রবেশ করিয়া তিনজন ভদ্রলোককে ছুরিকাঘাত করিয়াছে। শান্তিপ্রিয় হিন্দু কলিকাতা-বাসীগণের মনে আতঙ্কের সীমা নাই।

সেদিন বাংলার গভর্ণর Sir Frederic Burrows, প্রধান মন্ত্রী Mr. H. S. Shurawaddy, পুলীশ কমিশনার Mr. D. J. Hardwick। আজ কয়েকমাস ধরিয়া যে মন্ত্রীসভা বাংলাদেশ শাসন করিতেছে তাহাদের সাতজন মুসলমান, একজন হরিজন হিন্দু। বর্ণহিন্দুদিগের একজনও এই মন্ত্রীসভায় নাই। ভারতবর্ষের মুসলিম লীগসভা ১৬ই আগষ্ট 'Direct Action Day' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল। বাংলার অনেক মুসলমান নেতৃবৃন্দ ইহার পূর্ব্বে বিভিন্নস্থানে বক্তৃতা দিবার সময় বলিয়াছিলেন যে, মুসলমানেরা অহিংসনীতিতে বিশ্বাস করে না, তাহারা রক্তের দ্বারা প্রতিশোধ লইবে, হিন্দুকে বিনাশ করিয়া দেশে "পাকিস্থান" স্থাপন করিবে। ১৫ই আগষ্ট কলেজ যাইবার পথে বেলা আন্দাজ ১॥০ টার সময় মির্জ্জাপুর ও হ্যারিসন রোডের মোড়ে দেখিলাম, একজন মুসলমান যুবক একটি সুবৃহৎ চোঙ্ লইয়া উচ্চকণ্ঠে রাস্তার লোকদিগকে বলিতেছে যে, রক্তপাতের দ্বারা মুসলমানগণ হিন্দুর অত্যাচার বন্ধ করিবে। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র পুলীশ সাবধানতা অবলম্বন করায় এক কলিকাতা ব্যতীত আর কোথাও গোলমাল হয় নাই। ১৬ই আগষ্ট সকাল হইতেই সহরের বিভিন্ন-স্থানে মুসলমান জনতাকে দলবদ্ধ হইয়া ছুরি ও লাঠি লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা গেল, জোর করিয়া দোকানপাট বন্ধ করানই তাহাদের তখনকার উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হইল। পূর্ব্ব হইতেই এই লীগ গভর্ণমেণ্ট হিন্দুদিগের প্রতিবাদ সত্ত্বেও ১৬ই আগষ্টকে গভর্ণমেণ্টের ছুটির দিন বলিয়া ঘোষণা

করিয়াছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সশস্ত্র জনতা হিন্দুদের দোকানপাট লুঠ করিতে আরম্ভ করিল, লুণ্ঠিত দোকানে পেট্রোল দিয়া আগুণ লাগাইতে লাগিল, হিন্দু দোকানদার অথবা গৃহবাসী প্রতিবাদ করিলে অথবা বাধা দিলে তাহাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিল, অসংখ্য নরনারীকে পুড়াইয়া মারিল। Lorry করিয়া দলে দলে সশস্ত্র মুসলমান সহরের বিভিন্নস্থানে যাতায়াত করিয়া সমস্ত সহরে হত্যা, অগ্নিপ্রদান ও লুণ্ঠনের বিভীষিকা সৃষ্টি করিল। এই নরঘাতীগণ কোথায় এত Lorry পাইল, এত পেট্রোল কোথা হইতে যোগাড় করিল, এত ছোরা লাঠি কোথা হইতে আসিল তাহা এখনও জানা যায় নাই। কোন কোন স্থানে প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, মুসলমান মন্ত্রীগণ নিজেদের শাসনশক্তির অপব্যবহার করিয়া পূর্ব্ব হইতেই এই অশিক্ষিত মুসলমান জনতাকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন, পেট্রোল দিয়াছিলেন এবং পুলীশ সরাইয়া রাখিয়া হিন্দুনির্য্যাতনে সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৬ই আগষ্ট অপরাহ্নকালে Ochterloney Monument-এর নীচেয় মুসলমানদের সভা হইয়াছিল, কলিকাতা ও নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে দলে দলে মুসলমান আসিয়া সেই সভায় যোগ দিয়াছিল এবং প্রধান মন্ত্রী সুরাবর্দ্দী সেই সভায় সভাপতির কার্য্য করিয়াছিলেন। সেইদিন সকাল হইতেই লুট এবং নরহত্যা আরম্ভ হইয়াছিল, অথচ অপরাহ্নকালে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত মুসলমান জনতার সভা বন্ধ না করিয়া বরং তাহাদিগকে একত্র হইবার সুযোগ দেওয়া হইল। সভাভঙ্গের পর সেই সহস্র সহস্র মুসলমান অস্ত্রশস্ত্র লইয়া চতুর্দ্দিকে আরও ব্যাপকভাবে লুণ্ঠন ও নরহত্যা আরম্ভ করিল। Muslim League পূর্ব্ব হইতেই অনেক গুণ্ডা বিভিন্ন প্রদেশ হইতে কলিকাতায় আনাইয়া রাখিয়াছিল। ১৬ই ও ১৭ই লুণ্ঠন ও হত্যা সমভাবে চলিতে লাগিল, অবশেষে হিন্দুরা মরিয়া হইয়া মুসলমানগণকে বাধা দিল, মুসলমানের

হতাহত সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তখন মুসলমান গভর্ণমেণ্টের চেতনা হইল। কিন্তু এই দুইদিন সহরে কোন গভর্ণমেণ্ট ছিল না, চতুর্দ্দিকে অরাজকতা, পুলীশ সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। পুলীশের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলে তাহারা বলিল, "হুকুম নাই, নিজেরা নিজেদের রক্ষা কর।" আমার ছাত্র শ্রীমান বেচারাম দে ১৬ই বিকালে আসিয়া আমাকে সংবাদ দিল যে, মুসলমানগণ তাহাদের তিনটি বাসনের দোকান লুণ্ঠন করিয়াছে, ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ২॥০ লক্ষ টাকা। বেচারাম থানা, ডেপুটী পুলীশ কমিশনার ও পুলীশ কমিশনারের আপিসে যাইয়া বারংবার পুলীশের সাহায্য প্রার্থনা করিলেও কোন সাহায্যই তাহাকে দেওয়া হয় নাই। পুলীশের সম্মুখেই খুন ও লুঠতরাজ অনেক স্থানে হইল, পুলীশ দূরে দাঁড়াইয়া দেখিল, নিবারণ করিবার চেষ্টা করিল না। যে সমস্ত মুসলমানপ্রধান পল্লীতে হিন্দু ভদ্রগৃহস্থ ২০।৩০ বৎসর বাস করিতেছিলেন সেই সমস্ত হিন্দুদিগের অধিকাংশ লোক নিহত হইল। স্ত্রীর চক্ষের সম্মুখে স্বামী হত হইল, শিশু, বালিকা ও বৃদ্ধ সকলকেই মুসলমান জনতা ছুরি ও লাঠির আঘাতে হত্যা করিল। আমাদের রিপণ কলেজের ছাত্রাবাসের ছাত্রগণ ১৬ই তারিখ রাত্রিতে কলেজের ছাতের উপর দাঁড়াইয়া মুসলমানদিগের আক্রমণ হইতে কলেজ ও হোষ্টেল রক্ষা করিতেছিল, রাত্রি প্রায় দেড় ঘটিকার সময় নিকটস্থ এক মুসলমান বাড়ীর ছাত হইতে আততায়ী বন্দুক ছুড়িয়া দুইজন ছাত্রকে নিহত করিল এবং কয়েকজন আহত হইল। এই হতভাগ্য ছাত্রদের নাম—শ্রীমান্ ক্ষিতিভূষণ গুপ্ত ও শ্রীমান্ পরিমল কুমার দত্ত। রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটস্থ পোষ্টগ্রাজুয়েট ছাত্রাবাস ও সংস্কৃত কলেজের ছাত্রাবাসের ভিতর কয়েকজন ছাত্র মুসলমান জনতা কর্ত্তৃক অতি নৃশংসভাবে হত হইল। ১৭ই আগষ্ট শনিবার সকালে ৯৯, সার্কুলার

রোডের শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সান্ন্যালের চিঠি পাইয়া সেখানে তাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম, এবং তাহার পর পূর্ণিমার সহিত রামমোহন রোডে দেখা করিয়া ফিরিবার পথে বেলা আন্দাজ ৯টার সময় রাজাবাজারের সম্মুখে সার্কুলার রোডের উপর এক মুসলমান জনতা দেখিতে পাইলাম। ধীরে ধীরে বিদ্যাসাগর ষ্ট্রীটের দিকে অগ্রসর হইতেছি এমন সময়ে দেখিলাম ৪।৫টি লোককে কোথা হইতে ধরিয়া আনিয়া এই মুসলমান জনতা চীৎকার করিতে করিতে প্রকাশ্য রাজপথে লোকচক্ষুর সম্মুখে তাহাদের গলা কাটিয়া মৃতদেহগুলি সার্কুলার রোডের মধ্যস্থলে লম্বমান করিয়া পাশাপাশি রাখিয়া দিল। এই বীভৎস দৃশ্য দুর হইতে দেখিয়া কম্পিত বক্ষে আমি বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। পরে সার্কুলার রোড ও বিদ্যাসাগর ষ্ট্রীটের মোড়স্থ বাটীর শ্রীযুক্ত সদানন্দ পালিত মহাশয়ের নিকট শুনিলাম যে, ঐ হতভাগ্যগুলি নিকটস্থ একটি বস্তীর মুচি, কয়েক মিনিটের মধ্যেই ছয়টি মুচিকে ঐরূপে গলা কাটিয়া মুসলমানগণ রাস্তার মধ্যস্থলে রাখিয়া দিয়াছিল। এইরূপ কত ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা সমস্ত লিপিবদ্ধ করা সম্ভবপর নহে।

১৬ই, ১৭ই ও ১৮ই আগষ্ট সমস্ত রাত্রি আমাদের এই পল্লীর কেহ ঘুমাইতে পারে নাই। আমাদের এই পল্লীটি রাজাবাজার মুসলমান বস্তি হইতে ৫।৬ মিনিটের পথ মাত্র। রাত্রিতে বিভিন্ন সময়ে মুসলমান জনতা পার্শীবাগান লেনের ভিতর দিয়া পল্লীর ভিতর প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল এবং এই পল্লীর হিন্দু যুবকগণ অসীম সাহস সহকারে এই জনতাকে বারংবার রোধ করিয়া দূরে তাড়াইয়া দিয়াছিল। রাত্রি ১০টা, ১২টা, ৩টা, প্রভৃতি যে কোন সময়ে এই আক্রমণ তিনরাত্রি সমভাবে চলিয়াছিল। আমার বাড়ীর চতুর্দ্দিকের যুবকগণ সমস্ত রাত্রি জাগিয়া পল্লীকে রক্ষা করিতেছিল। আমি চক্ষের সম্মুখে দেখিলাম

মাত্র ৭ জন সাহসী হিন্দু যুবক প্রায় ৩০।৩৫ জন মুসলমান আক্রমণকারীকে আঘাতে জর্জ্জরিত করিয়া দূরে তাড়াইয়া দিয়া আসিল,—এমন বীরত্বের অভিব্যক্তি পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই, ইতিহাসে পড়ি নাই। অথচ এই প্রসুপ্ত সাহস এবং মনের অসামান্য দৃঢ়তা লইয়াই সঙ্ঘবদ্ধ হইবার অভাবে শত্রুর অতর্কিত আক্রমণে প্রথম দুইদিন হিন্দুগণ দলে দলে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। সর্ব্বক্ষেত্রে সর্ব্বসময়ে যুদ্ধ অথবা খণ্ডযুদ্ধের প্রথম নিয়ম এই যে, শত্রুকে সাবধান হইবার সময় এবং সুযোগ না দিয়া কঠোর হস্তে আঘাত হানিতে হইবে, পুনঃ পুনঃ আঘাত হানিতে হইবে। সংঘর্ষের এই আদি এবং চিরন্তন নিয়ম হিন্দুরা জানেনা। হিন্দুরা অনাগত-বিধাতা নহে,—আঘাত খাইয়া তবে আঘাত হানিবার জন্য ইহারা প্রস্তুত হয়। ১৭ই তারিখে অপরাহ্নকালে Military-র হাতে সহরের রক্ষাভার অর্পিত হইয়াছিল কিন্তু তথাপি সহরের ভিতর বিভিন্নস্থানে লুণ্ঠন ও নরহত্যা চলিতেছিল। এইরূপ অরাজকতা ভারতবর্ষের ইতিহাসে আর কখনও দেখা যায় নাই। আমি ১৬ই আগষ্ট হইতে তিনরাত্রি নিদ্রা যাই নাই, যখনই উন্মত্ত চীৎকার পল্লীর দিকে অগ্রসর হইতেছিল তখনই আমি বিশ্বজননীর নিকট প্রার্থনা করিতেছিলাম, হিন্দুযুবকগণকে শক্তি দিবার ও রক্ষা করিবার জন্য কাতর প্রার্থনা বিশ্বজননীর চরণে জানাইতেছিলাম। কী নরকযন্ত্রণা এই কয়দিন ভোগ করিয়াছি তাহা লিপিবদ্ধ করা অসম্ভব। ২০শে আগষ্ট হইতে সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণ কমিয়া যাইল, কিন্তু ইতস্ততঃ ছোরার আঘাতে ৫।৭ জন করিয়া প্রত্যহই হতাহত হইতেছিল। সর্ব্বসমেত কত লোক মরিল এবং আহত হইল তাহার হিসাব নাই, হিন্দু অথবা মুসলমান কাহারা বেশী মরিল তাহাও কেহ জানে না। তবে বিনষ্ট সম্পত্তির অধিকাংশই যে হিন্দুর সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কয়েকদিন বাজারহাটে ক্রয়বিক্রয়

ছিল না, স্কুল কলেজ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। ইংরাজদের মুখপত্র "The Statesman" সাধারণতঃ হিন্দুদিগের পক্ষে লিখে না কিন্তু এই নরহত্যায় ইংরাজ সংবাদপত্রও বিচলিত হইয়াছিল। ২০শে আগষ্ট "Disgrace abounding" শীর্ষক দিয়া "Statesman" লিখিল :

".........the origin of the appalling carnage and loss in the Capital of a great province, we believe the worst communal rioting in India's history, was a political demonstration by the Muslim League......... the bloody shambles to which this country's largest city has been reduced is an abounding disgrace........."

ঐ তারিখেই "The Calcutta Scene."—শীর্ষক প্রবন্ধে "Statesman" লিখিল :

"At the latest estimate the dead are about 3000 and they have lain thick about the streets ; the injured many thousands, no one will risk saying how many.........This is not a riot. It needs a word found in mediaeval history.

...There must have been some deliberation or organisation to set this fury on its way. The horde who ran about battering and killing with 8 ft. lathis may have found them lying about or bought them out of their own pockets, but that is hard to believe.........It is not mere supposition that men were imported into Calcutta to help in making an

impression..........On all sides are death, injuries, destruction. Houses have been destroyed with the men, women and children in them. Men have returned home in the evening to find neither home nor wife nor children.........thousands are brutally burnt.........."

"Statesman" এই বীভৎস নরহত্যাকে "The Great Calcutta Killing" নামে অভিহিত করিয়াছে এবং আজকাল অনেকেই সেই ভাষা ব্যবহার করিতেছেন।

এতবড় হত্যাকাণ্ড কলিকাতার বক্ষের উপর দিনের পর দিন সংঘটিত হইল কিন্তু বাংলার গভর্ণর Sir Frederic Burrows তাঁহার মাসিক দশসহস্র মুদ্রার লোভ সংবরণ করিতে পারিলেন না, নিজের ত্রুটি ও অক্ষমতা স্বীকার করিয়া গবর্ণরের পদ পরিত্যাগ করিলেন না। প্রধান মন্ত্রী সুরাবর্দ্দী লজ্জিত হইলেন না, উচ্চশির লইয়া সমাজে বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, এতবড় হত্যাকাণ্ড তাঁহার বিবেকবুদ্ধিতে কোন আঘাত করিল না। পুলীশ কমিশনার D. J. Hardwick একজন ইংরাজ—মাসিক ৩০০০৲ টাকা বেতন পাইয়া থাকেন। পুলীশ সময়মত ব্যবস্থা করিলে একজনও হত হইত না, একটি সামান্য দোকানও লুণ্ঠিত হইত না। ১৬ই লুঠতরাজ আরম্ভ হইবার পরও যদি অপরাহ্নে মনুমেণ্টের নীচে ক্ষিপ্ত মুসলমান জনতার সভা পুলীশ না হইতে দিত তাহা হইলে সহস্র সহস্র লোক একত্র হইয়া ব্যাপকভাবে লুণ্ঠন ও নরহত্যা করিবার সুযোগ পাইত না। পরদিন সকালেও পুলীশ কোন ব্যবস্থা অবলম্বন না করায় হত্যা ও লুণ্ঠনকারী মুসলমানগণের মনে ধারণা জন্মিয়াছিল যে, দেশের শাসন

কার্য্য মুসলমান মন্ত্রীগণের হাতে নিহিত সুতরাং তাঁহাদের অধীনস্থ ইংরাজ পুলীশ কমিশনার হত্যাকারী মুসলমানগণকে গুলি করিতে অথবা অন্য শাস্তি প্রদান করিতে সাহস করিবেন না। এই ঘটনার সর্ব্বাপেক্ষা লক্ষণীয় বিষয় এই যে, ইংরাজ গভর্ণর Burrows, প্রধান মন্ত্রী সুরাবর্দ্দী, পুলীশ কমিশনার Hardwick কেহই এই নরহত্যার জন্য সাক্ষাৎ অথবা পরোক্ষভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন না, এখনও ইঁহারা নিজ নিজ উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত,—যেন এতবড় নৃশংস নরহত্যা ও সম্পত্তিলুণ্ঠনের জন্য এ পৃথিবীর কেহই দায়ী নহেন।

আমার চক্ষের সম্মুখে এতবড় কুৎসিত নরহত্যা হইয়া গেল, বসিয়া বসিয়া দেখিলাম, শুনিলাম, দলে দলে নরমাংসক্ষুধিত শকুনি আসিয়া কলিকাতার আকাশকে ছাইয়া ফেলিল তাহাও লক্ষ্য করিলাম। কত চিন্তা মনে উদিত হইয়াছে তাহা শৃঙ্খলা করিয়া লিপিবদ্ধ করা অসম্ভব। সাধু, বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ, নারী, বৃদ্ধ ও শিশুর রক্তে আজ কলিকাতার মাটি কলুষিত ও অভিশপ্ত। শাস্ত্রে বলে ব্রহ্মহত্যা, নারী-হত্যা মহাপাপ, এই পাপে যখনই পৃথিবী ভারগ্রস্ত হইয়াছে তখনই দণ্ডপাণি ভগবান আবির্ভূত হইয়া ভূভার হরণ করিয়াছেন। কলিকাতার উপর কত ধর্ম্মপ্রাণ ব্রাহ্মণবৈষ্ণব, কত অসহায় নারী ও শিশু নিষ্ঠুরভাবে নিহত হইল তাহার নির্ণয় নাই। কিন্তু আজিও 'পরিত্রাণায় সাধূনাং, বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং' তাঁহার আবির্ভাব হইল না। যে-সব শিক্ষিত রাজশক্তিধারী মুসলমান ভদ্রলোক পশুপ্রকৃতি অসুরগণকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করিয়া সহায়-সম্বল দিয়া অসহায় হিন্দু নরনারীর ভিতর হত্যার বিভীষিকা সৃষ্টি করিতে প্রণোদিত করিলেন তাঁহারা আজিও সুস্থ, সুখী ও সমাজে উচ্চশির। ইঁহাদের কাহারও মুহূর্ত্তের জন্য নিদ্রার ব্যাঘাত হয় নাই, আহারে অরুচি হয় নাই, মনে অনুতাপ

হয় নাই। ইংরাজ কবি Coleridge লিখিয়াছেন যে, Ancient Mariner দুইশত নাবিকের অভিশাপবর্ষী মৃতচক্ষুর দৃষ্টি সহ্য করিতে পারেন নাই। Coleridge এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন:

"An orphan's curse would drag to Hell
A spirit from on high;
But Oh! More horrible than that
Is a curse in a dead man's eye"!

কিন্তু ইংরাজ গভর্নর, প্রধানমন্ত্রী, পুলীশ কমিশনার, প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীগণ পাঁচসহস্রাধিক মৃত নরনারীর অভিশাপ ও উষ্ণ নিশ্বাস সহ্য করিলেন, এক মুহূর্ত্তের জন্য অনুশোচনা প্রকাশ করিলেন না, লজ্জিত হইলেন না, ভগবানের দিকে তাকাইয়া দণ্ডভয়ে ভীত হইলেন না। আমি ভাবিতেছি ভগবান কি এই অভিশপ্ত হিন্দুজাতিকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, এই দেশের মাটীতে তাঁহার কত লীলা হইয়াছে আজ কি তিনি তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার যে চক্র যুগে যুগে দুষ্টদলন করিয়া আশ্রিতকে অভয়প্রদান করিয়াছে সে চক্র কি আজ শক্তিহীন? ঘনায়মান সন্দেহের অন্ধকারে আজ আমার মন অন্ধ, আমি কোথাও তাঁহার চিরজ্যোতির ক্ষীণ রশ্মিরেখাও দেখিতে পাইতেছি না।

(১৫)

৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে বলাইদাদা যুদ্ধের ডাক্তারী চাকুরী শেষ করিয়া কলিকাতায় আমায় বাসায় আসিল। প্রায় পাঁচ বৎসর কর্ম্মোপলক্ষে সে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে এবং বর্ম্মা, মালয় প্রভৃতি স্থানে ছিল। বলাইদাদা এখন Major হইয়াছে। বলাইদাদার সহিত একই সঙ্গে চাকুরী শেষ করিয়া আসিলেন, আসামী ভদ্রলোক Captain Ghana-

shyam Das, গৌহাটী হইতে ১২ মাইল দূরে ইহার নিবাস। ঘনশ্যামবাবু তাঁহার বন্ধুর বাড়ী চলিয়া যাইলেন, বলাইদাদা আমার বাড়ীতেই এখনও আছে। ঘনশ্যামবাবু কয়েকদিন আমার এখানে আসিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া বড়ই প্রীতিলাভ করিলাম।

(১৬)

১৬ই সেপ্টেম্বর কলিকাতা নগরী অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাতের ফলে জলমগ্ন হইয়া যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ সমষ্টির মত প্রতীয়মান হইল। পূর্ব্বরাত্রি হইতে বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল, সকালবেলা দেখিলাম বাড়ীর সম্মুখে প্রায় এক হাঁটু জল জমিয়াছে এবং তখনও বৃষ্টি হইতেছে। বেলা প্রায় ৮টার সময় মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল এবং এক ঘণ্টার মধ্যে রাস্তার জল বাড়িয়া প্রায় একগলা দাঁড়াইল, বাড়ীর ভিতরের উঠান, রান্নাঘর, বাহিরের ঘর জলপ্লাবিত হইয়া গেল। আমি এই বাড়ীতে প্রায় এগার বৎসর আছি, প্রতি বর্ষাতেই রাস্তায় জল দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু আমাদের রান্নাঘরে অথবা বাহিরের ঘরে পূর্ব্বে কখনও জল প্রবেশ করে নাই। পরদিন সংবাদপত্রসমূহে পড়িলাম যে, এরূপ বৃষ্টি কলিকাতায় গত ২৪ বৎসরের মধ্যে হয় নাই। আরতি সকালে তাড়াতাড়ি ভাতেভাত রাঁধিয়া লইল, ক্রমশঃ উনান ডুবিয়া যাইতেছিল, বিবৃদ্ধমান জলস্রোতের সহিত সংগ্রাম করিয়া কোনরূপে চারিটি অন্ন সিদ্ধ করিয়া লওয়া হইল। ভাতও রান্না হইল, উনানটিও জলে ডুবিয়া ভাঙ্গিয়া গেল। কলিকাতার নানাস্থানে এবং আমাদের পাড়ায় অনেক গৃহস্থবাড়ীতে সেদিন রান্না হইল না। সমস্ত দিন দ্বিতলের কক্ষে কাটাইলাম, নীচেয় নামিতে পারিলাম না। সন্ধ্যার পর আরতি দ্বিতলের বারান্দায় কিছু লুচি ও তরকারী তৈয়ার করিয়াছিল। সমস্ত দিন ও

রাত্রি জল রহিল, পরদিন প্রভাতে জল কমিতে কমিতে বেলা প্রায় ১১টার সময় রাস্তা দেখা যাইল। ১৬ই আগষ্টের রক্তপাতে কলুষিত নগরী ১৬ই সেপ্টেম্বরের বৃষ্টিপাতে বিধৌত হইয়া শুচি হইল কিন্তু মানুষের মনের ভিতরের হিংস্র প্রকৃতিগুলি এখনও সমভাবেই জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে।

(১৭)

১৬ই সেপ্টেম্বর আমাদের পিছনের বাড়ীর প্রতিবাসী শ্রীযুক্ত সুধীর চন্দ্র সরকারের শ্বশুর মহাশয় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ ঘোষ তাঁহার শ্যামবাজারের ভাড়াবাড়ীতে প্রায় ৮ দিন জ্বরভোগ করিবার পর বেলা ১৷৷০টার সময় ৫৪ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। সেইদিন তাঁহার বড় ছেলেটিও Typhoid জ্বরে শয্যাশায়ী। এই ভদ্রলোক মধ্যে মধ্যে তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যাকে দেখিতে আসিতেন এবং সেইজন্য আমি তাঁহাকে চিনিতাম। ভদ্রলোকের তিনটি ছেলে ও পাঁচটি মেয়ে—বড় ছেলেটির ও দুইটি মেয়ের বিবাহ দিয়াছিলেন। বড় ছেলেটি চাকুরী করেন, অন্য ছেলে দুইটির বয়স অপেক্ষাকৃত অল্প। খগেন্দ্রবাবু যুদ্ধের পূর্ব্বে কোন জাপানী আপিসে ভাল চাকুরী করিতেন কিন্তু সেই চাকুরী যাওয়ায় অন্য আপিসে সামান্য চাকুরীগ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়া অনটনের মধ্যে কোনরূপে সংসার প্রতিপালন করিতেছিলেন। মেয়েদের বিবাহ দিতে পারিতেছিলেন না বলিয়া সময় সময় চিন্তা প্রকাশ করিতেন। ঘোরতর বর্ষার দিনে, তদপেক্ষা আরও ঘোরতর দুশ্চিন্তার ভার লইয়া, বেলা প্রায় ১৷৷০টার সময় ভদ্রলোক ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া অনন্তযাত্রা করিলেন। আমি এই মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করিয়া সংসারী বদ্ধজীবকে জীবনে-মরণে যে অশান্তি ভোগ করিতে হয় তাহা চিন্তা করিয়া নিজের জন্য শঙ্কিত

হইলাম। অনেক ক্ষেত্রে দেখিতেছি সংসারী জীবের ইহকাল অথবা পরকাল কিছুই নাই। আমি এই পরলোকগত অশান্ত আত্মার কল্যাণের জন্য ভগবৎ চরণে প্রার্থনা জানাইলাম।

(১৮)

আজ ২৪শে সেপ্টেম্বর। সকালের সংবাদপত্রসমূহে দেখিলাম যে, গতকল্য এই সহরে আততায়ীর আক্রমণে ৯ জন হত ও ৫৪ জন আহত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু। ১৬ই আগষ্ট নরহত্যা আরম্ভ হইয়াছিল, মাসাধিক অতীত হইয়াছে, তথাপি গভর্ণমেণ্ট এই অরাজকতা বন্ধ করিতে পারিল না। ঢাকা সহরেও এইভাবে লুণ্ঠন ও নরহত্যা কিছুদিন যাবৎ চলিয়াছে। মধ্যে মধ্যে মুসলমানগণ প্রকাশ্য দিবালোকে হঠাৎ অতর্কিতভাবে হিন্দুপথচারীগণকে হত্যা করিয়া পলাইয়া যাইতেছে, ট্রাম ও বাসের ভিতর ঢুকিয়াও ছুরি মারিতেছে। এই দুঃসাহসিক হত্যাকার্য্যের বিরুদ্ধে এই League Govt. কোন প্রতীকার এখনও করে নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, ইংরাজ গভর্ণর ও পুলীশ কমিশনার এ বিষয়ে মূক ও উদাসীন। হিন্দুরা খবরের কাগজে লিখিতেছে, গভর্ণমেণ্টের সাহায্য আশা করিতেছে, ভগবানের দিকে তাকাইয়া আছে এবং মরিতেছে। নিজেদের মধ্যে সংগঠন ও শক্তিবৃদ্ধি না করিলে বাঙ্গালী হিন্দুজাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়।

২৫শে সেপ্টেম্বর, মহালয়া। বাড়ীতে বাবা ও মার তৃপ্তির জন্য তর্পণ করিলাম। মা এতদিন সংসারে ছিলেন কিন্তু এই বৎসর হইতে মার জন্যও তর্পণ আরম্ভ হইল। আরতি তর্পণের সমস্ত বন্দোবস্ত সুচারুরূপে করিয়া দিয়াছিল।

২রা অক্টোবর দুর্গাপূজা আরম্ভ হইয়া ৫ই অক্টোবর পূজা শেষ হইল। কলিকাতায় এই বৎসর ভয় ও নিরানন্দের পূজা। পুলীশ ও সৈন্যগণের

বিশেষ বন্দোবস্ত থাকায় পূজা উপলক্ষে কলিকাতায় কোন গোলমাল হয় নাই। রাস্তাঘাটে ইতস্ততঃ খুনজখম পূর্ব্বের মতই কিছু কিছু হইয়াছিল।

(১৯)

৫ই অক্টোবর বিজয়াদশমীর দিন আমার বড় বৈবাহিক শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সকাল ৮টা ৪৫ মিনিটের সময় কালীঘাটের বাড়ীতে দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুর সময় তাঁহার বয়স ৭২ বৎসরের কিছু অধিক হইয়াছিল। বহুদিন হইতে নানাবিধ শারীরিক অসুস্থতায় তিনি কষ্ট পাইতেছিলেন—কয়েক মাস পূর্ব্বে ভাগলপুর হইতে তিনি কালীঘাটে আসিয়াছিলেন। বৈবাহিক মহাশয় আমার অপেক্ষা বয়সে অনেক বড় ছিলেন এবং সর্ব্বদাই আমাকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন, সাংসারিক অনেক সুখ-দুঃখের কথা মন খুলিয়া আমার সহিত আলোচনা করিতেন। এরূপ বিচক্ষণ ও সদাশয় ব্যক্তি আমি জীবনে অধিকসংখ্যক দেখি নাই। সংসারে সুখ ভগবান কাহাকেও দেন না, বৈবাহিক মহাশয়ও শেষ জীবনে নানাকারণে সুখী হইতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যুতে আমি একজন অকৃত্রিম বন্ধু ও স্নেহশীল আত্মীয় হারাইলাম। তাঁহার শ্রাদ্ধকাল পর্য্যন্ত কয়েকদিন তাঁহার আত্মার শান্তি ও কল্যাণের জন্য প্রত্যহ আমি ভগবৎ চরণে নিবেদন করিয়াছিলাম।

(২০)

৮ই অক্টোবর হইতে চালদাবাগান বৈষ্ণবসম্মিলনীতে শ্রীভাগবত পাঠ আরম্ভ হইয়াছে। কলিকাতায় নরহত্যা ও রাস্তাঘাটে চলাচলের অসুবিধার জন্য বহুদিন সম্মিলনীর ধর্ম্মপ্রচারকার্য্য বন্ধ ছিল। আজকাল অপরাহ্ন ৬টার সময় পাঠ আরম্ভ হইয়া সন্ধ্যা ৭॥০টার মধ্যে শেষ হয়

এবং ভক্তগণ শ্রীরাধাকৃষ্ণের আরতি দেখিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ট্রাম ও বাস সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বন্ধ হইয়া যায়, রাস্তাঘাটে অতর্কিত আক্রমণে পথিক এখনও প্রত্যহ হতাহত হইতেছে। এই সমস্ত কারণে আজকাল সম্মিলনীতে ২৫।৩০ জন লোকের অধিক সমবেত হইতে পারেন না, দূর দূরান্তর হইতে যে সমস্ত ভক্ত পূর্ব্বে পাঠ ও কীর্ত্তন শুনিতে আসিতেন তাঁহারা কেহই আসিতে পারেন না। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় অতি মধুর কণ্ঠে ভক্তিসংকারে পাঠ করেন, আমি প্রত্যহ সেইখানে যাইয়া নিবিষ্ট মনে তাঁহার পাঠ শ্রবণ করি। কার্ত্তিক মাস বলিয়া প্রথমেই গোস্বামী মহাশয় শ্রীদামোদরাষ্টক পাঠ করেন এবং পরে শ্রীভাগবত পাঠ করেন। গোস্বামী মহাশয়ের বয়স প্রায় ৭৫ বৎসর, অথচ তাঁহার কণ্ঠ বলিষ্ঠ ও শুদ্ধ। পাণ্ডিত্যের পরাকাষ্ঠাও তাঁহার পাঠ হইতে সময় সময় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। শ্রীভাগবতের দশম স্কন্ধে অষ্টম ও নবম অধ্যায়ে শ্রীযশোদা কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণমুখাভ্যন্তরে বিশ্বরূপদর্শন এবং দামবন্ধনলীলা পঠিত হইতেছে। সমস্তদিন বাড়ীতে কর্ম্মহীন জড়ের মত বসিয়া থাকিয়া সন্ধ্যাবেলা এই সময়টুকু ধর্ম্মকথা শ্রবণে অতিবাহিত করিতে আমার বড়ই মধুর লাগে। ১৬ই আগষ্ট কলেজ বন্ধ হইয়াছে এখনও খুলে নাই, প্রাইভেট ছাত্রও কেহ কলিকাতায় উপস্থিত নাই, সুতরাং সমস্তদিনই বাড়ীতে বসিয়া আছি।

(২১)

১৫ই অক্টোবর সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত হইল যে, ১০ই অক্টোবর হইতে নোয়াখালী জেলার কোন কোন স্থানে মুসলমান জনতা কর্ত্তৃক সংখ্যালঘু হিন্দুগণ আক্রান্ত হইয়াছে। হিন্দুদের ঘরবাড়ী পুড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, স্ত্রীলোক অপহরণ সম্পত্তি লুট চলিতেছে, নরনারী হত্যা করা

হইতেছে, এবং বলপূর্ব্বক হিন্দুদিগকে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে মুসলমানগণ বাধ্য করিতেছে। কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুক্ত কৃপালনী ও শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র বসু এরোপ্লেনযোগে নোয়াখালী গিয়াছিলেন, তাঁহারা নরপশুদের এই বীভৎস তাণ্ডবলীলা দেখিয়া তাহার প্রতিকারের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছেন। প্রত্যহ সহস্র সহস্র হিন্দু নরনারী নোয়াখালীর বিভিন্ন স্থানগুলি হইতে রেলযোগে কলিকাতায় চলিয়া আসিতেছে। সপ্তাহের অধিককাল অতীত হইল এখনও গৃহদাহ, নরহত্যা ও অন্যান্য অত্যাচারের সংবাদ আসিতেছে। গভর্ণমেণ্ট বলিতে সেই কলিকাতার গভর্ণর Sir Frederick Burrows, সেই প্রধান মন্ত্রী H. S. Shurawaddy! কলিকাতায় সর্ব্বত্র হিন্দুগণের মুখে সর্ব্বদাই নোয়াখালীর আলোচনা—প্রতিকারহীন স্ফীত অত্যাচার আজ সমাজের বক্ষে অধর্ম্ম ও মৃত্যুর তাণ্ডবলীলা আনয়ন করিয়াছে। এদিকে প্রত্যহ কলিকাতায় স্থানে স্থানে নরহত্যা চলিতেছে। আমি ভাবিতেছি এখনও কি হিন্দুজাতির পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই?

(২২)

১৬ই অক্টোবর বুধবার জার্ম্মানীর অন্তর্গত Nuremberg সহরে রাত্রি ১টা ১১ মিনিটের সময় অর্থাৎ আমাদের সকাল প্রায় ৬–৩০ মিনিটের সময় কাইটেল, রিবেনট্রপ, রোজেনবার্গ, কালটেনব্রানার, হান্সফ্রাঙ্ক, ফ্রিক, ষ্ট্রাইখার, সোকেল, জোড্‌ল সেস, ইনকোয়ার্ট—এই দশজন জার্ম্মান নেতাগণকে ইংরাজ প্রভৃতি যুদ্ধবিজয়ী জাতিগণ ফাঁসি দিয়া হত্যা করিয়াছে। গোয়েরিং-এর ফাঁসি হইবার কথা ছিল কিন্তু তিনি মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে বিষপান করিয়া আত্মহত্যা করেন। সকাল ৬–৩০ মিনিটের সময় ফাঁসি দেওয়া আরম্ভ হয় এবং ৭–৪৫ মিনিটের সময় শেষ হয়।

কয়েকমাস হইতে ইহাদের বিচার চলিতেছিল। ইংরাজ, আমেরিকান, রুষ ও ফরাসী বিচারকগণ এই সমস্ত নেতার যুদ্ধাপরাধের বিচার করিয়া তাঁহাদিগের ফাঁসিকাষ্ঠে মৃত্যুর আদেশ দেন। মৃত্যুর পূর্ব্বদিন ১৫ই তারিখে Reuter-এর বিশেষ সংবাদদাতা লিখিলেন—

"The eleven doomed Nazi war-leaders were to-day counting their last 24 hours in the condemned cells of the Nuremberg jail. In their last hours, some of the condemned men are seeking inward peace by reading the Bible in their cells and are receiving ministrations from the prison chaplains.

Hermann Goering told his doctor this morning of his faith in religion, adding "I have no fear and will show dignity to the end."

Ribbentrop said "I did not sleep too well. To-day I have a head-ache."

ফাঁসির পূর্ব্বে সংবাদপত্রের ৮ জন প্রতিনিধিকে ফাঁসি দেখিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল, তাঁহাদিগকে বিশেষ একখানি মোটরযোগে আনা হয়। Nuremberg-এ রাত্রি তখন প্রায় ১টা। কারাগারের অভ্যন্তরে একটি একতলা ইমারতের ব্যায়ামাগারের বিপরীতদিকস্থ একটি গৃহ হইতে সাংবাদিকগণ ফাঁসি পর্য্যবেক্ষণ করেন। ইলেকট্রিক আলোতে উদ্ভাসিত ব্যায়ামাগারে ফাঁসিমঞ্চ প্রস্তুত ছিল। হঠাৎ প্রায় ১০ সৈন্যকে প্রাঙ্গন পার হইয়া ব্যায়ামাগারের দিকে যাইতে দেখা যায়। Reuter-এর বিশেষ সংবাদদাতাও এই হত্যাকাণ্ড দর্শন করেন। পরদিন সংবাদপত্রে তিনি লিখিয়াছেন:

Nuremberg, October 16. Ribbentrop died first—at 1-11 A. M. (Local time). Lastly, Seyss—Inquart,

shouting "I believe in Germany" dropped through the trap at 2-45 A. M. All died bravely—but not as martyrs.

As the result of Goering's suicide, the other condemned men, who were to have been allowed to walk freely to the place of execution were manacled to guards immediately. There was little objection on the part of men, Streicher and Sanckel, however, were exceptions. Sanckel refused to dress and screamed at the top of his voice as the guard clamped the handcuff over his wrist.

.........At 1 A. M. Ribbentrop was marched from his cell through the great prison hall to the nearby gymnasium. Here stood three scaffolds on a pitch marked out for basketball. Ten fierce electric lights blazed down on the scene. But no glimmer of light penetrated into the night air.

As the former Nazi Foreign Minister walked, handcuffed to his guards, beside a chaplain, light wind ruffled his uncombed grey hair.

Three sharp knocks sounded on the door. A colonel, standing immediately inside, heeled sharply round. The door opened. Blinking in the sudden bright light, Ribbentrop held his head high. His handcuff was removed. His hands were tied behind his back. Then preceded by a colonel of the executing party and supported on either side by U. S. soldiers, he walked firmly to the foot of the scaffold.

Here a U. S. officer asked : "State your name." This was translated into German. Ribbentrop made no answer. It was repeated and then in a firm voice he answered, "Joachim von Ribbentrop." Now the American officer slowly mounted the thirteen steps of the scaffold, at whose top hung the noosed rope and, after him, between two guards, Ribbentrop stepped up. He looked neither to the right nor to the left.

"Have you any last words you wish to say ?" asked the officer of the escorting party, while the grey-haired Protestant chaplain, the Rev. H. F. Gerecke, stood on one side. Ribbentrop did not look at the questioner, but kept his eyes fixed on the top of the improvised black-out that covered the windows and in a ringing voice, which echoed through the building, said, "God protect Germany !"

Keitel mounted as boldly and as steadily as Ribbentrop had done. "Wilhelm Keitel," asked the officer by his side "have you any last words you wish to say ?" Keitel looked ahead and speaking clearly, as though he was addressing some important Staff Conference and wished everything to be heard, he declared : "I call on the Almighty that He may have mercy on the German people. Over 2,000,000 went to their death before me. I now follow my sons." His voice then rose in a dramatic emphasis : "All for Germany." At 1-11 A. M. the trap door opened again and at 1-33 A. M. the doctor certified Keitel dead.

Now there was a lull. The American colonel in charge of the night's operations ordered that those present could smoke. Cigarettes were produced...... At 1-30 A. M. orders were given that cigarettes be put out.

At 1-38 A. M. there came the giant Gestappo, Ernst Kaltenbrunner.........As he stumbled blinking into the light, he looked like a man who had just been awakened. He seemed to have dressed hurriedly and had not put on a tie.........At 1-50 A. M. Kaltenbrunner was certified dead.

Alfred Rosenberg entered the execution chamber at 1-46 A. M. Rosenberg kept his eyes fixed to the floor as he entered. Alone among all the condemned men, he answered "no" when asked if he had any last words to say. Three minutes after he entered the chamber of death, it was all over.

Hans Frank entered actually smiling. He gave his name smiling and got up each of the thirteen rungs with a deliberate tread. His voice, however, was weak as he made his last statement : "I pray God take my soul. May the Lord receive me mercifully !"

Julius Streicher shouted, "Heil Hitler !" as he mounted the steps, and a split second before he fell his muffled voice through the black hood cried, "Adele, my darling wife !"

Keitel and Jodl, Hitler's former generals, died as Prussian officers to the last—stiff-lipped, chin up, and arrogant—Jodl crying, "I salute you, my Germany !"

Seyss-Inquart-এর সর্ব্বশেষে রাত্রি ২-৪৫ মিনিটের সময় ফাঁসি হয়। তিনি মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন—"I believe in Germany." Frick এবং Sanckel কি বলিয়াছিলেন তাহা Reuter সংবাদ দেয় নাই।

An official Communique issued by the Quadripartite Commission for detention of majcr war criminals states : "The sentences of death passed by the International Military Tribunal at Nuremberg on Oct. 1, 1946, on the undermentioned war criminals were carried out this day in our presence : Ribbentrop (53), Keitel (63), Rosenberg (53), Kaltenbrunner (43), Hans Frank (46), Wilhelm Frick (69), Julius Streicher (60), Fritz Sanckel (52), Alfred Jodl (54), and Arthur Seyss—Inquart (54)" এইভাবে এই সমস্ত জার্ম্মান বীরপুরুষগণের ইহলীলার অবসান হয়। মৃত্যুর পর ইংরাজ প্রভৃতি চতুঃশক্তির গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মৃতদেহগুলির ফটোগ্রাফ লওয়া হয় এবং দেহগুলিকে ভস্মীভূত করিয়া চিতাভস্ম বিনষ্ট করিয়া ফেলা হয়।

জার্ম্মান বীরগণের এইরূপ নির্ম্মম হত্যাকাহিনী পাঠ করিয়া আমি অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলাম না। কতবার কাঁদিলাম, কতবার চক্ষু মুছিলাম তাহার নির্ণয় নাই,—কতবার মহাবীর ভাই বলিয়া তাহাদিগকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলাম। ইতিহাসের ভিতর দিয়া জার্ম্মান জাতিকে জানিবার ও বুঝিবার পর হইতে নানামনুষ্যোচিত সদ্‌গুণে বিভূষিত এই জাতির প্রতি আমার একটা আন্তরিক শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ হইয়াছিল। বর্ত্তমান যুগে শিল্প, চিত্রবিদ্যা, সঙ্গীত, সাহিত্য, বাণিজ্য ও বীরোচিত চরিত্রের উৎকর্ষে এই জাতি জগতের অলঙ্কার স্বরূপ,

উন্নতির চরম শিখরে আরূঢ় এই জাতি জগতের ঈর্ষা ও প্রশংসা সমভাবেই উদ্রেক করিত। হঠাৎ এই বিশ্বব্যাপী যুদ্ধে ভগবান এই জাতিকে ধ্বংস করিয়া দিলেন, ইহার প্রাণস্বরূপ বীরশ্রেষ্ঠগণ বিজয়ী শক্তির নিকট রজ্জুবদ্ধ পশুর মত অবমানিত ও নিহত হইল। আজ সমগ্র জার্ম্মানী শক্তিচতুষ্টয়ের পদানত, তাহারা দেশটিকে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া শাসন করিতেছে, অর্দ্ধভুক্ত, অর্দ্ধনগ্ন একটা মহাজাতি আজ দুর্নীতির ঘোরান্ধকারে নিমগ্ন। জার্ম্মান স্ত্রীলোকেরা নিজ সম্মান রক্ষা করিতে পারিতেছে না, বিদেশী সৈনিকের নিকট ইহাদের মান-মর্য্যাদা সমস্তই প্রতিমুহূর্ত্তে বিনষ্ট হইতেছে। আর কি এই জাতির পুনরুত্থান হইবে? যদি হয় তখন বীরগণের এই মর্ম্মন্তুদ মৃত্যুকাহিনী তাহাদের মনের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিবে? কি যুগে আমাদের জন্ম হইয়াছিল তাহাই বসিয়া বসিয়া ভাবি। আমাদের দেশে নোয়াখালি, কলিকাতা, ঢাকা, প্রভৃতি স্থানে পশুশক্তির তাণ্ডবলীলা চলিতেছে, বিদেশে জার্ম্মানী, জাপান, প্রভৃতি স্থানে বিচারের নামে বীরগণকে ফাঁসি দেওয়া হইতেছে, বিজিত জাতিগুলির অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, স্ত্রীলোকদিগকে বিজয়-মদোন্মত্ত সৈন্যদের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার শক্তি নাই। জার্ম্মানী, জাপান, প্রভৃতি দেশগুলির উপর যে অত্যাচার হইতেছে সংবাদপত্রে তাহার কাহিনী বাহির হয় না, যাহা ইংরাজ অথবা আমেরিকানদের নিকট হইতে সময় সময় সাপ্তাহিক অথবা মাসিক পত্রসমূহে বাহির হইতেছে তাহা হইতেই এই অপরিসীম অত্যাচার কিছু কিছু উপলব্ধি করিতে পারা যায়। আজ যে ইংরাজ ও আমেরিকান জাতি ভদ্র ও সভ্য বলিয়া আপনাদিগকে জগতে প্রচার করিতেছে তাহারা 'Atom bomb'-এর প্রয়োগে জাপানের লক্ষ লক্ষ নরনারী ও শিশু হত্যা করিয়া যুদ্ধে বিজয়ী হইয়াছে। আজ তাহারাই জার্ম্মান ও জাপানী-

দিগের অত্যাচারের জন্য বিচার করিতেছে ও ফাঁসি দিতেছে! যুদ্ধ এক বৎসরের অধিক হইল শেষ হইয়াছে, তথাপি লক্ষ লক্ষ জার্ম্মান যুদ্ধবন্দীকে ইংলণ্ডে আটকাইয়া রাখা হইয়াছে. তাহাদিগকে জোর করিয়া ক্ষেত্রকর্ষণ প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছে এবং প্রতিঘণ্টা কঠোর পরিশ্রমের জন্য 1½ পেনী অর্থাৎ /১০ বেতন দেওয়া হইতেছে। জার্ম্মান যুদ্ধ-বন্দীগণ ইংলণ্ডের স্থানে স্থানে খড়ি দিয়া লিখিয়াছে "Christians, send home your slaves"। কি কঠিন বিদ্রূপ, কি মর্ম্মব্যথা এই লিখনের প্রতি অক্ষরে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে তাহা অন্তর্যামী ভগবান ব্যতীত কেহই উপলব্ধি করিতে পারিবে না। জনৈক ইংরাজ লেখক ৩১।৮।৪৬ তারিখের Illustrated London News-এ এই সমস্ত বিষয় লিখিয়াছেন। বিখ্যাত আমেরিকান লেখক Louis Fisher সম্প্রতি লিখিয়াছেন: "শীতের আসন্ন সমাগম জার্ম্মানগণকে উপর্য্যুপরি দুঃস্বপ্নের ন্যায় নিপীড়িত করিতেছে। কয়লা ও অন্যান্য ইন্ধন অপ্রচুর হইবে। সহরবাসী অধিকাংশ জার্ম্মান যে সমস্ত গৃহে বাস করে সেই-গুলির দেওয়াল ফাটা, ছাদ ছিদ্রযুক্ত এবং জানালায় পেষ্টবোর্ড বসান। বার্লিনের ব্যাপারসমূহের তত্ত্বাবধানকারী আমেরিকান অফিসার Col. Frank Howlie আমাকে বলিয়াছিলেন যে, একমাত্র বার্লিনের রাস্তা-গুলিতে রাজযক্ষ্মা রোগগ্রস্ত ৩২ হাজার নরনারী চলাফেরা করে। এইবার শীতকালে জার্ম্মানীতে ব্যাপকভাবে ক্ষয়রোগের প্রাদুর্ভাব হইতে পারে। আত্মহত্যার সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতেছে।······জার্ম্মান যুবতীদের মধ্যে পতিতাবৃত্তি খুব প্রচলিত হইতেছে। তাহাদের অনেকে একখণ্ড চকোলেট কিংবা ৩।৪টি সিগারেট দ্বারা প্রলুব্ধ হইবে।" আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এতবড় পৃথিবীতে কোন নিরপেক্ষ জাতি অথবা কোন ইংরাজ ও আমেরিকান আজ সাহস করিয়া Nuremberg-এ জার্ম্মান বীরগণের

হত্যা, Atom bomb-এর অপব্যবহার, জার্ম্মান যুদ্ধবন্দীদের প্রতি নিষ্ঠুরতা, জাপানী ও জার্ম্মানী স্ত্রীলোকদিগের অবমাননা,—এই সমস্ত কিছুরই প্রতিবাদ করিতেছেন না। জগতের স্থানে স্থানে এই অবরুদ্ধ অত্যাচার গুমরিয়া উঠিতেছে, মহাকাল সিংহাসনে সমাসীন বিচারক কান পাতিয়া ইহা শুনিতেছেন, আপাতঃদৃষ্টিতে প্রতিকারবিহীন পশুশক্তি ভগবানের সৃষ্টির সৌন্দর্য্য ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতেছে। পরাজিত জাতিগুলির তো বিচার হইয়া গেল, এখনও হইতেছে, কিন্তু বিজয়ী জাতিগুলির বিচারের দিন আর কতদূর? সময় সময় ভাবিতে ভাবিতে যেন ভগবানের উপর বিশ্বাস হারাইয়া যায়, আবার সবলে আঁকড়াইয়া ধরি, তিনি যদি হারাইয়া যান, কি সম্বল লইয়া ইহজীবন ও পরজীবন অতিবাহিত করিব!

(২৩)

২৫শে অক্টোবর। আজ চালদাবাগান শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীতে অন্নকূট মহোৎসব। এই দিনে শ্রীকৃষ্ণ গিরি গোবর্দ্ধনের পূজা ব্রজধামে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন এবং ইন্দ্রের কোপ হইতে ব্রজবাসীগণকে রক্ষা করিবার জন্য গোবর্দ্ধন পর্ব্বত বামহস্তে উত্তোলন করিয়া তাহার গুহায় ব্রজবাসীগণকে সাতদিন রক্ষা করিয়াছিলেন। আজ সম্মিলনীতে বেলা ১টার সময় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় শ্রীভাগবত হইতে গোবর্দ্ধন-লীলার দুইটি অধ্যায় পাঠ করিলেন এবং তাহার মর্ম্মার্থ সকলকে বুঝাইয়া দিলেন। আমি বেলা প্রায় তিনটার সময় বাড়ী ফিরিলাম। পুনরায় সন্ধ্যা ৭টার সময় ভোগ গ্রহণ করিবার জন্য সম্মিলনীতে যাইলাম। তখনও প্রসাদ বিতরণ হইতেছিল। শুনিলাম এই দুর্দ্দিনেও প্রায় দেড় সহস্র নরনারী তৃপ্তি পূর্ব্বক অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করিয়াছে,

ইহাদের মধ্যে নোয়াখালী হইতে আগত নরনারীর সংখ্যাই অধিক। সর্ব্বশেষে আমি, রায় বাহাদুর নগেন্দ্রবাবু, প্রভৃতি প্রায় কুড়িজন লোক রাত্রি ৮টার সময় ভোগ গ্রহণ করিতে বসিলাম। চতুর্দ্দিকে ঘনায়মান দুঃখরাশির মধ্যেও সমস্ত বিস্মৃত হইয়া সে কি আনন্দ উপভোগ করিলাম তাহা অবর্ণনীয়। আমি ভোগ গ্রহণ করিতেছি এমন সময় আচার্য্য শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় ধীরে ধীরে আমার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং আমার পাত্রে আরও অধিক করিয়া মোচার তরকারী দিতে বলিলেন। আমার প্রতি তাঁহার এই স্নেহের নিদর্শন দেখিয়া আমি কৃতার্থ হইলাম। যতক্ষণ ভোজ্যদ্রব্য গ্রহণ করিতেছিলাম, তিনি আমার নিকটেই দাঁড়াইয়া আমার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন। তাঁহার এই অপ্রত্যাশিত অনুগ্রহ দর্শন করিয়া আমার মনে হইল শ্রীকৃষ্ণ আজ তাঁহার প্রতিভূস্বরূপ এই বৃদ্ধ বৈষ্ণবকে পাঠাইয়া আমার প্রতি তাঁহার অসীম, অহেতুকী কৃপার পরিচয় দিতেছেন। এই আচার্য্য মহাশয়কে আমি মনে মনে বড়ই ভক্তি করি, কিন্তু কোন দিন তাঁহার সহিত আমার কথাবার্ত্তা হয় নাই, এমনকি আমি এই শুদ্ধদেহ বৈষ্ণবের পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতেও কোনদিন সাহসী হই নাই। কিন্তু আমার আহারাদি শেষ হইলে হঠাৎ গোস্বামী মহাশয় আমার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "প্রফেসরবাবুর বাড়ী কতদূর?" আমি বিস্মিত হইয়া উত্তর দিলাম যে, এই সম্মিলনী হইতে আমার বাড়ী বেশী দূর নহে। গোস্বামী মহাশয় যে, আমাকে চিনেন তাহা আমি জানিতাম না,—প্রফেসার বলিয়া জানা তো আরও দূরের কথা। তাঁহার এই মিষ্ট ও স্নেহপূর্ণ জিজ্ঞাসাবাচক কথাগুলি শুনিয়া আমি যত বিস্মিত হইলাম, ততই আপনাকে ধন্য ও কৃতার্থ জ্ঞান করিলাম— রাজামহারাজার সহিত পরিচয় হইলেও এত আনন্দ আমার হইত না।

মধ্যে মধ্যে গোস্বামী মহাশয়ের এই স্নেহ-নিদর্শনের কথাগুলি মনে পড়িতে লাগিল।

(২৪)

২৬শে অক্টোবর। আরতি কিছুদিন হইল মটরসুঁটির ধোঁকা রাঁধিতে শিখিয়াছে—রান্না খুব ভালই হয়। ছোট ডাক্তারবাবুর জনৈক আত্মীয় শ্রীযুক্ত প্রফুল্লবাবু লক্ষ্ণৌ সহরে বাস করেন, কয়েকদিন হইল কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতায় ডাক্তারবাবুর বাসায় আসিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে ডাক্তারবাবুকে আরতির রান্না তরকারী দেওয়া হয়, ডাক্তারবাবুর বাড়ীর সকলেই আরতির রান্নার খুব সুখ্যাতি করেন। পূর্ব্বদিন চিংড়িমাছের কাটলেট দেওয়া হইয়াছিল, সকলেই খাইয়া প্রীত হইয়াছিলেন। আজ ডাক্তারবাবুর মেয়ে রমা আরতিকে ডাকিয়া মটরসুঁটির ধোঁকা করিয়া দিতে বলিল, তাহারা সকলেই খাইবে, বিশেষ করিয়া প্রফুল্লবাবুকে খাইতে দেওয়া হইবে। ডাক্তারবাবুর নিজের বাড়ীতে মটরসুঁটির ধোঁকা করিবার কয়েকবার চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহারা অকৃতকার্য্য হন, ধোঁকাগুলি আস্ত থাকে না, ভাঙ্গিয়া যায়। আজ ধোঁকা রাঁধিয়া রাত্রিতে ডাক্তারবাবুকে দেওয়া হইল, আমিও খাইয়া দেখিলাম। রান্না বড়ই সুস্বাদু হইয়াছিল। পরদিন ডাক্তারবাবুর পুত্রবধূ রেখার মা আরতিকে ডাকিয়া বলিলেন "তোমার রান্না খুবই ভাল হইয়াছিল, সকলেই খুব তৃপ্তি করিয়া খাইয়াছে। তুমি আমাদিগকে ঢের খাইতে দাও, আমরা কিছু দিতে পারি না। তোমার যদি উলের জামা বুনিয়া দিতে হয় বলিও, আমি বুনিয়া দিব।" ডাক্তারবাবুর বাড়ী হইতে রান্না তরকারী আমরা প্রায়ই পাইয়া থাকি অথচ রেখার মার এই মধুর ব্যবহার ও বিনয়সূচক কথায় বড়ই আনন্দিত হইলাম। আরতি

রেখার মাকে বলিল, "আপনারা সর্ব্বদাই কাজে ব্যস্ত থাকেন, আপনাকে জামা বুনিয়া দিতে হইবে না। তা ছাড়া আপনারা তো প্রায়ই তরকারী দেন, আমি কদিনই বা দিই।" রাত্রিতে এই সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সময় আরতি তাহার আনন্দদীপ্ত চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া আমাকে বলিল, "দিদিরা কেউ এমন ধোঁকা করতে জানে না।" আমি মনে মনে হাসিলাম, কারণ দিদিদের সকলের কাছেই রান্না বিষয়ে আরতির হাতেখড়ি হইয়াছিল, অথচ গৌরবের সময় আরতি আজ তাহা ভুলিয়া যাইতেছে। তবে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, আরতির রান্না আজকাল খুবই ভাল হইতেছে, অনেক বয়স্কা গৃহিনীর রান্নাকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছে।

২৮শে অক্টোবর, সোমবার কলেজ খুলিবার কথা ছিল, কিন্তু সহরে এখনও স্থানে স্থানে অশান্তি ও অরাজকতা বর্ত্তমান সুতরাং কলেজ খুলিল না। ট্রাম ও বাস নিয়মিতভাবে চলাচল করিতেছে না, কোন কোন রাস্তায় যানবাহন একেবারেই বন্ধ। ১১ই নভেম্বর কলেজ খুলিবার কথা আছে।

(২৫)

২৯শে অক্টোবর, মঙ্গলবার। আজ কিছুদিন হইল পূর্ণিমার শ্বশুর-শাশুড়ি ও অন্যান্য সকলে পুরী বেড়াইতে গিয়াছেন, তাঁহাদের রামমোহন রায় রোডের বাড়িতে পূর্ণিমা, সুকুমার, উমা ও সুকুমারের কৃষ্ণকাকা আছেন। সকালে বাড়ীতে বসিয়া থাকিতে ভাল লাগিল না, নিজেই বাজার করিতে যাইলাম। মাছ, মাংস, কপি প্রভৃতি নানাবিধ তরীতরকারী কিনিয়া লইয়া আসিলাম। আরতি তাহার জ্যাঠাইমার (ডাক্তারবাবুর স্ত্রী) জন্য ঘি-ভাত ও মাছের চপ তৈয়ারী করিতেছে। আজ আরতি রান্না-কার্য্যে খুব ব্যস্ত। ঠাকুর নাই, উনান ধরান, মসলা বাটা, তরকারী

কোটা, বাজারের তরকারী ওজনকরা, মাছকাটা প্রভৃতি কার্য্য আরতি একাই করিতেছে। আজ আবার বাড়ীতেও মাছ কিনিলাম—প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাছ কেনা আমার এক ব্যাধি। দুইবার আরতিকে মাছ কুটিতে হইল। পরিষ্কারভাবে অথচ তৎপরতার সহিত কার্য্য করিবার শক্তি সকলের থাকে না, আরতি কিন্তু খুব ক্ষিপ্রতার সহিত কার্য্য করিবার শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে অর্জ্জন করিয়াছে। আমি আরতিকে রান্নাকার্য্যে ব্যাপৃত দেখিয়া কিছু মাছ ও তরকারী লইয়া পূর্ণিমার বাড়ী যাইলাম, আমার সঙ্গে নিমাই ও বলাই। বেলা তখন প্রায় ৯টা। পূর্ণিমা মাছ, মাংস, কপি, আলু প্রভৃতি দেখিয়া খুব আনন্দিত হইল। উমা আমার কোলে আসিল। ঠাকুমা চলিয়া যাওয়ায় উমার মন অত্যন্ত খারাপ, পূর্ণিমা বলিল, উমার হাসি নাই, খেলা নাই, খাওয়ার পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে, সর্ব্বদাই বিরক্তি-ভাব। আমি বাড়ী আসিবার উপক্রম করিতেই উমা কান্না আরম্ভ করিল—সে আমার সহিত আসিতে চায়। এত ছোট মেয়ে তাহার মাকে ছাড়িয়া আমাদের বাড়ীতে থাকিতে পারিবে না ভাবিয়া আমি ইতস্ততঃ করিতেছি দেখিয়া পূর্ণিমা বারংবার আমাকে শুনাইতে লাগিল, "ও গিয়ে থাকতে পারে।" অগত্যা উমাকে লইয়া আসিলাম। উমা আসিয়া অত্যন্ত আনন্দিত, বিশ্বনাথ, নিমাই ও বলাইয়ের সহিত ছুটাছুটি করিয়া খুব খেলা করিল, আরতির নিকট ভাত খাইল, দ্বিপ্রহরে খানিকক্ষণ অভ্যাসমত ঘুমাইল, এবং দুধ খাইয়া বিকালে অনেকক্ষণ বাড়ীর বাহিরে ও রাস্তায় আমার সহিত বেড়াইয়া প্রায় ৪৷৷৹টার সময় তাহাদের বাড়ীতে ফিরিয়া যাইল। সমস্ত দিনের মধ্যে একবারও তাহার মার খোঁজ করে নাই। আমার কাছে থাকিতে উমা খুব ভালবাসে, বেশ শান্তশিষ্ট বলিয়া তাহাকে কাছে রাখিতে কোন অসুবিধা হয় না।

৫ই নভেম্বর মুসলমানদের ইদুজ্জোহা উৎসব উপলক্ষে সহরের সর্ব্বত্র একটা আশঙ্কার ছায়াপাত হইয়াছে। এখনও ধূমায়মান হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা পুনরায় ভীষণাকার ধারণ করিতে পারে ইহাই সকলে আশঙ্কা করিতেছে। ৩রা নভেম্বর, রবিবার পূর্ণিমা ও উমা এখানে আসিল এবং ইদ্‌পর্ব্ব নিরুপদ্রবে শেষ হইবার পর ৬ই নভেম্বর বুধবার বিকাল বেলা তাহারা নিজবাটিতে ফিরিয়া যাইল। সুকুমারদের বাড়ীতে সম্প্রতি রাঁধিবার কোন লোক নাই তাই সুকুমার ও তাহার কৃষ্ণকাকা এই-খানেই কয়েকদিন দ্বিপ্রহরে আহার করিয়াছিলেন এবং সান্ধ্য-আইন জারি থাকায় রাত্রির খাবার সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সুকুমার আসিয়া লইয়া যাইত। বুধবার অপরাহ্ণে বাটিতে যাইয়া রাত্রির খাবারদাবার রাঁধিবার অসুবিধা হইতে পারে মনে করিয়া পূর্ণিমার সঙ্গে তাহাদের সকলের লুচি, মাছের তরকারী ইত্যাদি দেওয়া হইয়াছিল। উমা কয়েকদিন আমাদের বাড়ীতে থাকিয়া খুব খুসি, সর্ব্বদাই আমার কাছে কাছে থাকিত এবং বাহিরে বেড়াইতে যাইবার জন্য ইঙ্গিত করিত। উমা এখনও বেশী কথা কহিতে পারে না।

(২৬)

১০ই নভেম্বর রবিবার। আমরা সাধারণতঃ রবিবারে মাছ খাই না তাই রবিবারে আমরা মাছ কিনি না। কিন্তু হঠাৎ কোথাও হইতে মাছ আসিয়া পড়িলে অথবা ছোট ডাক্তারবাবুর স্ত্রী রান্না মাছ পাঠাইলে আমি নিয়ম রক্ষা করি কিন্তু আরতি অথবা অন্যান্য মেয়ে যাহারা উপস্থিত থাকে তাহারা মাছ খায়। আরতি এই নিয়মভঙ্গের ঘোর বিরোধী তথাপি রবিবারে মাছ আসিয়া পড়িলে বাধ্য হইয়া আরতিকে মাছ খাইতে হয়। আজ সকালবেলা ছোট ডাক্তারবাবুর বাড়ীতে একটি

বড় রুই মাছ আসিয়াছিল এবং তাহার সুবৃহৎ সাতখানি কাঁচা টুকরা ডাক্তারবাবুর স্ত্রী আমাদের বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন। গত রবিবারেও ডাক্তারবাবু মাছ দিয়াছিলেন এবং আরতি অনিচ্ছাসত্ত্বেও খাইয়াছিল। এইবার আরতি দৃঢ়কণ্ঠে আমাকে বলিল যে, প্রতিবারই রবিবারে তাহার নিয়মভঙ্গ হইতেছে, কোন একটি নিয়ম আরম্ভ করিলে তাহা সযত্নে রক্ষা করা উচিত, সুতরাং সে আজ মাছ খাইবে না, এবং ভবিষ্যতেও নিয়ম দৃঢ়ভাবে রক্ষা করিবে। আমি তাহার মনের সবলতা ও নির্লোভতা দেখিয়া আনন্দিত হইলাম, মাছ খাইবার জন্য আর কোন জেদ করিলাম না। সুতরাং মাছগুলি ভাজিয়া পরদিনের জন্য রাখিয়া দেওয়া হইয়াছিল। আমি মনে মনে আরতির দৃঢ়তার প্রশংসা করিলাম। আমার নিজের মন বড়ই দুর্ব্বল, কোন নিয়ম কঠোরভাবে পালন করিবার শক্তি আমার মনের নাই। যে কাজ করিব না স্থির করিয়াছি, হয়ত অবস্থা-বৈচিত্র্যে তাহাই অনেকবার করিতে বাধ্য হইয়াছি। আমার নিজ দুর্ব্বলচিত্ততার সহিত আরতির এই দৃঢ়তার তুলনা করিয়া মনে মনে বড়ই সুখী হইলাম। রবি গ্রহরাজ, শাস্ত্রে বলে রবিবারে আমিষ ভক্ষণ করিলে সপ্তজন্ম রোগ ভোগ করিতে হয়। এই গ্রহরাজ প্রসন্ন থাকিলে মানব অনেক বিপদ-আপদ হইতে রক্ষা পাইতে পারে। সুতরাং রবিবারে আমিষ ভক্ষণ করিবার লালসা এইভাবে দৃঢ়তার সহিত দমন করিতে দেখিয়া আমি মনে মনে আরতিকে আশীর্ব্বাদ করিলাম এবং গ্রহরাজ দিবাকরের নিকট প্রার্থনা করিলাম যেন আরতি নীরোগ হইয়া সুখী হয়।

(২৭)

১১ই নভেম্বর কলেজ খুলিল। ১৫ই আগষ্ট কলেজ হইয়া বন্ধ হইয়াছিল এবং ১৬ই আগষ্ট কলিকাতায় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার জন্য

যে অরাজকতার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা মধ্যে মধ্যে চলিতেছিল বলিয়া কলিকাতার স্কুল কলেজগুলি এতদিন খুলে নাই। আজকাল কলেজে উপস্থিত ছাত্রসংখ্যা খুব কম তবে নিয়মিত কলেজ হইতেছে।

পুর্ণিমার শ্বশুরশাশুড়ি পুরী হইতে ১৪ই ডিসেম্বর কলিকাতায় ফিরিয়াছেন। তাঁহারা দেড়মাসের অধিক কাল কলিকাতায় ছিলেন না—এই দেড়মাসকাল পুর্ণিমাকে প্রত্যহ মাছ ও তরীতরকারী আমি নিজে বাজার করিয়া দিয়া আসিতাম। উমা আমাকে দেখিলেই কোলে চড়িয়া এখানে আসিবার জন্য আবদার করিত এবং প্রায়ই সকালের দিকে এখানে আসিয়া ভাত খাইয়া বিকালে বাড়ী ফিরিত। আমার সহিত রাস্তায় অথবা পার্কে বেড়াইতে উমার অসীম উৎসাহ। অত্যন্ত শান্তস্বভাবা বলিয়া তাহাকে কাছে রাখিতে কোন অসুবিধা হয় না। বিকালবেলা বাড়ীতে ফিরিয়া উমা তাহার মার কোলে যাইতে চাহে না, পুনবায় আমার সহিত আমাদের বাড়ীতে আসিবার জন্য রোদন করিতে থাকে। ইদানীং উমার শরীর খুব ভাল হইয়াছিল, গৌরবর্ণ অথচ বেশ হৃষ্টপুষ্ট অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। উমার মুখের গড়নটি বেশ ভাল। উমার ঠাকুমা ও ঠাকুরদাদার সহিত দেখা করিলাম। পুরীতে যাইয়া অবধি নানাবিধ অসুখ ও অসুবিধার মধ্যে তাঁহাদিগকে বাস করিতে হইয়াছিল, স্থান পরিবর্ত্তনের কোন সুখই তাঁহারা পান নাই। বহুদিন পরে উমা তাহার ঠাকুরমাকে পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত।

(২৮)

১৫ই ডিসেম্বর সন্ধ্যাবেলা বৈষ্ণব সম্মিলনীর প্রশস্ত হলঘরে শ্রীললিতা সখীর তিরোধান উপলক্ষে শোকসভা হইয়াছিল। ২১শে নভেম্বর বৃহস্পতিবার রাত্রি ৭–৩৫ মিনিটের সময় তিনি শ্রীনবদ্বীপধামে তাঁহার

আশ্রম সমাজবাড়ীতে দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স প্রায় ৭৫ বৎসর হইয়াছিল। নবদ্বীপের সাধকচূড়ামণি এই বৈষ্ণব মহাশয়ের কথা পূর্ব্বে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। তাঁহার গুরুদেব শ্রীচরণদাস বাবাজীর নিকট এই বৈষ্ণব শ্রীললিতাসখীর ভাবে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া স্ত্রীলোকের বেশভূষা পরিধানপূর্ব্বক সখীভাবে বহুদিন সাধনভজন করিয়াছিলেন। তাঁহার সাধনস্থল নবদ্বীপে "সমাজবাড়ী" নামে পরিচিত এবং এই স্থানেই তিনি বাস করিতেন, নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া কোথাও যাইতেন না। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে ২৭শে অক্টোবর আমি যখন ছাত্র শ্রীমান গুণেন্দ্রের সহিত নবদ্বীপে যাই তখন সৌভাগ্যক্রমে এই বৈষ্ণবের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি আমাকে স্নেহসহকারে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যে হৃদয়স্পর্শী উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা যথাস্থানে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। ১৫ই ডিসেম্বর সন্ধ্যাবেলা সভায় শ্রীললিতাসখীর জীবনযাত্রা প্রণালী আলোচিত হইয়া শোক প্রকাশ করা হইল। বৈষ্ণব শ্রীযুক্ত দ্বিজপদ গোস্বামী মহাশয় ১০২।৩ বকুলবাগান রোড, ভবানীপুর হইতে এই সভায় পৌরোহিত্য করিবার জন্য আগমন করিয়াছিলেন এবং শ্রীললিতাসখীর তিরোধান উপলক্ষ্যে তাঁহার স্বরচিত কবিতাবলী সুললিত স্বরে কীর্ত্তন করিয়া উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীকে কৃতার্থ করেন। এই সুদীর্ঘ কবিতামালা হইতে কয়েকটি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

শ্রীগুরুচরণাশ্রিতা জয় জয় শ্রীললিতা,
গুরুনিষ্ঠা সেবার মূরতি।
শ্রীরাধারমণ যাঁর সর্ব্বারাধ্য সেব্য সার,
সাধ্য তাঁর শ্রীচরণে রতি॥

নীলাচলে লীলাকালে রাধারমণ কুঞ্জে মিলে,
জয় গোপালে গোপীভাব দিলা।
সখীসাজে সাজাইয়া স্বরূপ স্বভাব জাগাইয়া,
শ্রীললিতাদাসী প্রকটিলা॥

....

মধুর নবদ্বীপ ধামে 'রাধারমণ বাগ' নামে,
শ্রীগুরু আশ্রমে নিত্যস্থিতি।
ত্যজিয়া আশ্রম চত্বরে নাহি গতি স্থানান্তরে,
অলঙ্ঘ্য নিয়ম নিষ্ঠাবতী॥

....

ভাবাবেশে একদিনে কৃষ্ণকথা আলাপনে,
কৃষ্ণ প্রকাশ প্রত্যক্ষ দেখায়।
আসন ছিল সম্মুখে বিস্ময়ে সকলে দেখে,
যুগল পদচিহ্ন পড়ে তায়॥

....

শ্রীদ্বিজপদ গোস্বামী মহাশয় এই চালদা বাগান বৈষ্ণব সম্মিলনীতে সময় সময় কীর্ত্তন ও ভাগবত পাঠ করিয়া থাকেন—ইঁহার কথা পূর্ব্বে অন্যান্য স্থানে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। অতি মধুরকণ্ঠ এই বৈষ্ণবের নিকট শ্রীললিতাসখীর জীবন বৃত্তান্ত ও কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া রাত্রি প্রায় ৯টার সময় বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

(২৯)

২২শে ডিশেম্বর তারিখে রবিবার দিন সমু ও অমু তাহাদের পিতার সহিত বেলা ২॥০টার সময় আমাদের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

আমি পূর্ব্বেই করুণাকে লিখিয়াছিলাম যে, যদি খোকারা তাহাদের মাকে ছাড়িয়া এখানে এক সপ্তাহকাল আসিয়া থাকিতে পারে তাহা হইলে যেন খোকাদের পাঠাইয়া দেওয়া হয়। আমার পত্রমত বড়দিনের ছুটির মধ্যে সমু ও অমু আসিয়া উপস্থিত হইল, জীবন তাহাদিগকে পৌঁছাইয়া দিয়া চলিয়া যাইল। দুই ভাই বেশ আনন্দে সময় কাটাইতেছিল এবং মধ্যে মধ্যে আমাকে বলিতেছিল, "দাদু, মাকে ছেড়ে থাকতে পারি না?" আমি উত্তর করিলাম "পার বৈ কি।", তখন খুব আনন্দিত চিত্তে চতুর্দ্দিকে খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল। আমি প্রত্যহ করুণাকে চিঠি দিতেছিলাম, পাছে তাহার ছেলেদের জন্য মন কেমন করে। কিন্তু আমার চিঠিগুলি পাইবার পূর্ব্বেই ২৪শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার দিন করুণা ও জীবন দ্বিপ্রহরে আসিয়া উপস্থিত হইল। করুণার অপর দুইটি খোকাকে তাহাদের ঠাকুমার কাছে রাখিয়া আসিয়াছিল। আমি করুণাকে পরদিন আসিয়া দিনকতক থাকিবার জন্য বলিলাম এবং আমার কথা অনুসারে করুণা সেইদিন বিকালে বালী ফিরিয়া পরদিন অর্থাৎ ২৫শে ডিসেম্বর, বুধবার তাহার অপর দুইটি খোকাকে লইয়া জীবনের সহিত আমাদের এখানে আসিল। জীবন ইহাদের পৌঁছাইয়া দিয়া বালী ফিরিয়া যাইল। করুণা ও তাহার চারিটি খোকা কয়েকদিন এখানে থাকিয়া ৩০শে ডিসেম্বর জীবনের সহিত বালী ফিরিয়া যায়। সমু ও অমু দাদামহাশয়ের নিকট কাঠের খেলানা, কিসমিস, লেবেঞ্চুস, বেলুন, সন্দেশ প্রভৃতি জিনিষপত্র আদায় করিয়া মহা আনন্দে বালী প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

৩০শে ডিসেম্বর, ১৪ই পৌষ। ১৪ই পৌষ আমার জন্মদিন। গত ২।৩ দিন হইতে জ্বর হইয়া কষ্ট পাইতেছি। অত্যন্ত সর্দ্দি ও জ্বর—Influenza জ্বর বলিয়া মনে হয়। জ্বর সামান্য হইলেও অত্যন্ত দুর্ব্বল

করিয়াছে। সাধারণতঃ আমার জ্বর হয় না কিন্তু শরীর একবার অসুস্থ হইলে অত্যন্ত দুর্ব্বল ও অসহায় হইয়া পড়ি। শরীর ক্রমশঃ যেন অপটু হইতেছে বুঝিতে পারিতেছি। এইবার অসুখের সময় কেবলই ভাবিয়াছি যে, এইরূপ অপটু ও অসহিষ্ণু শরীর লইয়া বৃদ্ধবয়সে তীর্থ-স্থানে কি করিয়া একাকী বাস করিব।

চতুর্থ অধ্যায়

(১)

১৯৪৪ সাল। গত বৎসরের তুলনায় এইবার প্রাইভেট ছাত্রসংখ্যা অনেক কম। জ্বর হইয়াছিল, এখন সারিয়াছে কিন্তু জ্বরের পর পেটের অসুখ হইয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি। যুদ্ধ শেষ হইয়াছে কিন্তু জিনিষ পত্র অত্যন্ত মহার্ঘ্য। আমার নিজের পরিবার জন্য সাধারণ তাঁতের ধুতি প্রায় কুড়ি টাকা দিয়া একজোড়া কিনিয়া আনিয়াছি—মিলের ধুতি তিনমাস অন্তর কন্‌ট্রোলের দোকানে একখানি করিয়া পাওয়া যায়, তাহাও সব সময় দোকানে থাকে না বলিয়া গত দুইবার আমি কাপড় কিনিতে পাই নাই। সরিষার তৈল মাথাপিছু মাসে একপোয়া কন্‌ট্রোলের দোকানে দিবার নিয়ম, কিন্তু গত মাসে কোন দোকানেই তেল ছিল না। কলিকাতার লোকে বাদাম তৈল অথবা দালদা জাতীয় জিনিষ ২৲টাকা সের কিনিতেছে, অথবা ৩৲ টাকা সের দিয়া বাদামতৈলমিশ্রিত সরিষার তৈল Black Market-এ কিনিয়া ব্যবহার করিতেছে। পেটের গোলমাল, জ্বর, সর্দ্দি প্রভৃতি প্রায় বাড়ী বাড়ী লাগিয়া আছে। ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলাদেশেই দুর্দ্দশা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এখানকার গভর্ণমেণ্ট অপদার্থ ও স্বার্থসেবী অথচ নীরবে সকলকেই এই গভর্ণমেণ্টের

অন্যায় ও অবিচার সহ্য করিতে হইতেছে। যুদ্ধ শেষ হইয়াছে কিন্তু দেশবাসীর অবস্থার কোন উন্নতি নাই।

(২)

৫ই জানুয়ারী, রাত্রি প্রায় ৮টার সময় বাহিরের ঘরে বসিয়া শ্রীভাগবত পাঠ করিতেছিলাম। তৃতীয় স্কন্ধে কশ্যপ তাঁহার স্ত্রী দিতিকে বলিতেছেন যে, সন্ধ্যাবেলা সমস্ত সাংসারিক কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ভগবৎ স্মরণ, মনন ও চিন্তন করিতে হয়। সন্ধ্যা সময়ে শ্রীমহাদেব ভূতপিশাচগণে পরিবৃত হইয়া বৃষভপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে তাঁহার তিনটি চক্ষুর দ্বারা বিশ্বসংসার পরিদর্শন করিয়া থাকেন। এই সমস্ত বর্ণনা পড়িতে পড়িতে নীচের শ্লোকটি আমার বিশেষ করিয়া দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

শ্মশানচ ক্রানিলধূলিধূম্র-
বিকীর্ণ-বিদ্যোত জটাকলাপঃ,
ভস্মাবগুণ্ঠামলরুক্মদেহঃ
দেব স্ত্রিভিঃ পশ্যতি দেবরস্তে।

কশ্যপ দিতিকে বলিতেছেন যে, সন্ধ্যাসময়ে শ্মশানধূলিধূম্র উজ্জ্বল জটাবিশিষ্ট, ভস্ম দ্বারা আচ্ছন্ন জ্যোতির্ম্ময়দেহ মহাদেব তিনটি চক্ষুর দ্বারা তোমাকে এবং বিশ্ব সংসারকে দেখিয়া থাকেন।

এই গম্ভীর শ্লোকটি পড়িয়া আরতিকে শুনাইলাম এবং সন্ধ্যাবেলা সমস্ত সাংসারিক কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্রকারগণ কেন ভগবৎ ভজন করিতে বলিয়াছেন তাহা বুঝাইয়া দিলাম। আরতি একবার মাত্র এই শ্লোকটি শুনিয়া ও বুঝিয়া লইয়া তৎক্ষণাৎ মুখস্থ করিয়া ফেলিল এবং পরক্ষণেই

সমস্ত শ্লোকটি আমার নিকট আবৃত্তি করিল। আমি আরতির তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইলাম।

১৪ জানুয়ারী, পৌষ সংক্রান্তি। আজ চালদাবাগান বৈষ্ণব সম্মিলনী-গৃহে সন্ধ্যাবেলা পাঠ শুনিতে গিয়াছিলাম। কিছুদিন হইতে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় শ্রীজীব গোস্বামীর 'ভক্তিরসামৃত সিন্ধু' পাঠ করিতেছিলেন। অদ্য এই গ্রন্থের পঞ্চমভাগ "ভক্তিসন্দর্ভ" শেষ হইল। এই কঠিন ধর্ম্ম-গ্রন্থখানি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মহাশয় অতি যত্নের সহিত ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন—তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও উপলব্ধিমূলক ব্যাখ্যার প্রভাবে শ্রোতৃবর্গ এই দুষ্প্রবেশ্য ভক্তিগ্রন্থের ভিতর সহজে হইতে রসগ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন। প্রায় রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত পাঠ ও ব্যাখ্যা চলিল এবং তৎপরে গোস্বামী মহাশয় বলিলেন যে, অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এইবারেও তাঁহাকে সম্পূর্ণ মাঘমাস জয়নগরে এক ভক্তের গৃহে শ্রীভাগবত পাঠ করিতে হইবে, তজ্জন্য তিনি একমাস এখানে অনুপস্থিত থাকিবেন। এই আচার্য্য মহাশয়ের ব্যাখ্যা করিবার শক্তি অপূর্ব্ব এবং তিনি নিজে ধর্ম্মনিষ্ঠ এবং ভক্তিপরায়ণ বৈষ্ণব বলিয়া সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। মাসাধিককাল তাঁহাকে পাওয়া যাইবে না শুনিয়া সকলেই দুঃখিত হইলেন। অবশেষে প্রতিদিনের প্রথামত অনেকেই তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিবার পর কীর্ত্তন আরম্ভ হইল এবং আমি একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া কীর্ত্তন শুনিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে গোস্বামী মহাশয় ধীরে ধীরে আমার নিকট আসিলেন এবং স্নেহ ও মধুর কণ্ঠে বলিলেন যে, একমাস আমাকে দেখিতে পাইবেন না বলিয়া তিনি দুঃখিত। বিশেষতঃ আমি "নীরব ও মনোযোগী" শ্রোতা বলিয়া তিনি শাস্ত্রব্যাখ্যার সময় বড়ই প্রীতিলাভ করিয়া থাকেন। আমি জোড়হস্তে তাঁহার এই স্নেহের নিদর্শন-সূচক কথাগুলি শ্রবণ করিলাম, তাঁহার মত বৈষ্ণব আমার

প্রতি এরূপ স্নেহশীল ভাবিয়া আনন্দে মন পূর্ণ হইয়া উঠিল, আমি তাঁহার কথার কোন উত্তর দিতে পারিলাম না। এই গোস্বামী মহাশয় আমাকে স্নেহ করেন আমি বুঝিতে পারি। মধ্যে **Influenza** হইয়া পেটের অসুখে ভুগিয়া কয়েকদিবস সম্মিলনীগৃহে উপস্থিত হইতে পারি নাই। আচার্য্য মহাশয় সেই সময় রায় বাহাদুর নগেন্দ্রবাবু, শরৎবাবু প্রভৃতি ভক্তগণকে আমার অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিতেন এবং প্রত্যহ আমার শারীরিক সংবাদ লইতেন। এই সম্মিলনীগৃহে কত ভক্তের সমাগম হয়, আমি এই সভাকক্ষের নগণ্য ও শাস্ত্রবিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ শ্রোতা। তথাপি আমার প্রতি আচার্য্য মহাশয়ের এইরূপ অহেতুকী প্রীতির পরিচয় পাইয়া আমার মন আনন্দে ও অহঙ্কারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে এবং মনে হয় কদাচারী ও ভক্তিবিমুখ হইলেও আমার মত বদ্ধজীবের প্রতি এই ভক্ত বৈষ্ণবের স্নেহ আমার কম সৌভাগ্যের পরিচায়ক নহে।

(৩)

আমাদের বাড়ীর নিকটে একজন প্রতিবাসী থাকেন, ২৬শে জানুয়ারী তাঁহার বিবাহ হইল। ভদ্রলোকের বয়স চল্লিশের কাছাকাছি হইবে— এই স্ত্রী তাঁহার তৃতীয় পক্ষ। দ্বিতীয় স্ত্রীটি আজ প্রায় মাস দেড়েক হইল মারা গিয়াছেন। প্রথম স্ত্রীবিয়োগের দুই মাসের মধ্যেই এই মহিলাকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং বিবাহের কিঞ্চিদধিক এক বৎসরের মধ্যেই এই দ্বিতীয়া স্ত্রীর প্রাণবিয়োগ হয়। এই দ্বিতীয়া স্ত্রীকে আমরা দেখিয়াছি, ভদ্রমহিলা বড়ই শীর্ণকায়া ছিলেন। একখানি মাত্র প্রকোষ্ঠ ভাড়া লইয়া ভদ্রলোক বাস করেন, তাহারই ভিতর রান্না, শয়ন ইত্যাদি সমস্তই করিতে হয়। দ্বিতীয়া স্ত্রী সাধ্যমত রন্ধন, বাসন-মাজা প্রভৃতি সমস্ত সাংসারিক কর্ম্মই করিতেন কিন্তু তথাপি তাঁহার রুক্ষস্বভাব স্বামীর নিকট নিরন্তর তাড়না ও প্রহার সহ্য করিতে

হইত। শেষদিন এই মহিলা যখন স্বামীগৃহ ছাড়িয়া পিতার নিকট চলিয়া যান সেদিনও নির্দ্দয় প্রহার তাঁহাকে সহ্য করিতে হইয়াছিল। অথচ স্বভাবতঃ শীর্ণকায় এই নারী তখন অন্তঃসত্ত্বা এবং হস্তপদাদি ফুলিয়া যাওয়ায় অত্যন্ত দুর্ব্বল। ইহার কিছুদিন পরেই পিতৃগৃহে এই মহিলা প্রাণত্যাগ করেন। দুইমাস গত হইতে না হইতে এই ভদ্রলোক পুনরায় বিবাহ করিয়া আসিয়াছেন। ২৭শে জানুয়ারী সন্ধ্যাবেলা নূতন বধূ আসিল, বয়স খুব বেশী নয়, দেখিতে শ্যামবর্ণ, মুখশ্রী মন্দ নহে শুনিলাম। পিতা নাই, অভিভাবক ভ্রাতা দরিদ্র। এই বয়স্ক স্বামীর সহিত শারীরিক এবং মানসিক কোন বিষয়েই এই তরুণীর মিল আছে বলিয়া মনে হইল না। আমি ভাবিলাম বঙ্গদেশে বিবাহ জিনিষটি কত সুলভ, মানুষের বিবেকবুদ্ধিও কত সঙ্কীর্ণ! পশুপ্রকৃতি এই ভদ্রলোক স্ত্রীবিয়োগ হইতেই পুনরায় বিবাহ করিতেছেন, সামাজিক শিষ্টতাসূচক কিছুকাল অতীত হইতে দিতেও তিনি অক্ষম অথচ অবস্থা ভাল নয়, কোট প্যাণ্ট পরিয়া সিগারেট খাইতে খাইতে প্রত্যহ আমার বাহিরের ঘরের সম্মুখ দিয়া চাকুরী করিতে যান কিন্তু বিশেষ কিছু উপার্জ্জন করেন বলিয়া মনে হয় না। নিজের নির্দ্দয়তার জন্য অনুতাপ নাই, একজন নিরীহ তরুণীর দারিদ্র্যের সুবিধা গ্রহণ করিয়া তাহার ভবিষ্যৎ চিরঅন্ধকারময় করিতে বিবেকের কুণ্ঠা নাই, সংসারে দাসী-বৃত্তি করাইয়া আপনার ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করাই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। হিন্দু সমাজে এইরূপ ঘটনা নিত্য কত হইতেছে তাহার হিসাব কে রাখিতেছে!

(৪)

২৭শে জানুয়ারী ৺সরস্বতী পূজার দিন সমুর হাতেখড়ি হইল। পূর্ব্বদিন সমু ও অমু তাহাদের বাবার সহিত আমাদের এখানে

আসিয়াছিল। জীবন ইহাদিগকে পৌঁছাইয়া দিয়া পরের ট্রেনে বালী ফিরিয়া যাইল। দুই ভাই তাহাদের মা ও বাবাকে ছাড়িয়া এক সপ্তাহ খুব প্রফুল্লমনে আমাদের এখানে ছিল। সর্ব্বদাই সন্দেশ, পায়েস, কমলালেবু, মাছ প্রভৃতি ইচ্ছামত আহার, দ্বিপ্রহরে বিনিদ্রচক্ষে অনবরত একখানি কাগজে সুতা বাঁধিয়া ঘুড়ির মত উড়াইতে উড়াইতে "ভোঃ কাটা" বলিয়া তারকণ্ঠে চীৎকার, বিকালে আমার সহিত রাস্তায় অথবা পার্কে বেড়াইতে যাওয়া, সন্ধ্যাবেলা কলের গান শোনা—ইহাই তাহাদের সপ্তাহকালের নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম ছিল। অমু একটু অধিক চঞ্চল কিন্তু উভয়েই শাসন মানিয়া চলে এবং যাহা আদেশ করা হয় তাহা তৎক্ষণাৎ প্রতিপালন করে। পিতামাতাকে ছাড়িয়া এক সপ্তাহ এরূপ আনন্দে তাহারা থাকিতে পারিবে তাহা আমরা আশা করি নাই। আরতি সর্ব্বদাই তাহাদের পরিচর্য্যা করিত এবং অত্যন্ত স্নেহের সহিত তাহাদের আবদার সহ্য করিত। আমি কলেজে অথবা ছেলে পড়াইতে যাইলে দুইজনে আপন মনে খেলা করিত এবং আমি ফিরিয়া আসিলে আনন্দধ্বনি করিতে করিতে আমাকে দরজা খুলিয়া দিত। আমি ভাবিতাম ইহারা যাহাদের আদরের জিনিষ তাহারা বালীতে রহিয়াছে, করুণা কত উৎকণ্ঠার মধ্যে সময় কাটাইতেছে,—ইহা স্মরণ করিয়া আমি সর্ব্বদাই বালক দুইটিকে স্নেহবচনের দ্বারা প্রীত করিতে চেষ্টা করিতাম। ইহাদের উভয়ের আকর্ষণও আমার প্রতি প্রবল বলিয়া মনে হইত। ২রা ফেব্রুয়ারী বেলা ২টার ট্রেনে শিয়ালদহ দিয়া ইহারা জীবনের সহিত বালী ফিরিয়া যাইল। বাবাকে আসিতে দেখিয়া দুই জনের আনন্দ ধরে না, কিয়ৎক্ষণব্যাপী নৃত্য চলিতে লাগিল, তখন আমি বুঝিলাম যে, এই সপ্তাহকাল মাতাপিতাকে বিশেষ করিয়া সন্ধান না করিলেও ইহাদের মনের নিগূঢ় প্রদেশে মাতৃস্নেহলাভের যে আকাঙ্খা

প্রচ্ছন্ন ছিল তাহা সহস্র মিষ্টান্ন অথবা নিরবচ্ছিন্ন ঘুড়ি উড়ানও আর অধিককাল চাপা দিয়া রাখিতে পারিত না। বালী যাইবার সময় প্রচুর বড় বড় মাগুরমাছ, নারিকেল তৈল, নূতন কাপড়জামা, সাবান প্রভৃতি পুঁটলি বাঁধিয়া রিকসায় উঠিবার সময় উভয় বালকের যে মুখের ছবি দেখিয়াছিলাম তাহা আমি সহজে ভুলিতে পারিব না।

(৫)

২৮শে জানুয়ারী সকাল প্রায় ৭॥০টার সময় আমার বড় ভায়রা-ভাই শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় খিদিরপুর শ্বশুর বাড়ীতে দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় ৬২ বৎসর হইয়াছিল। প্রায় এক বৎসর উদরী হইয়া কষ্ট পাইতেছিলেন এবং কবিরাজী চিকিৎসা করাইয়া মধ্যে মধ্যে রোগের উপশম হইলেও অবশেষে পেটের জল অত্যন্ত বাড়িয়া হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি পূর্ব্বে জাপানী Yokohama Specie Bank-এ সেক্রেটারীর কার্য্য করিতেন, ব্যাঙ্ক-সম্বন্ধীয় ব্যাপারে তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান ছিল। নিরীহ ও কোমলপ্রকৃতি এই আত্মীয় আমাকে বড়ই স্নেহ করিতেন। তাঁহার মৃত্যুসংবাদে দুঃখিত হইলাম এবং তাঁহার আত্মার শান্তির জন্য শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলাম।

(৬)

আমাদের বাড়ীতে আমার শয়নকক্ষে, আরতির শয়নকক্ষে এবং বাহিরের ঘরে একখানি করিয়া শ্রীকালী মূর্ত্তির ছবি আছে। আমার শয়নকক্ষের ছবিটি কালীঘাটের কালীমূর্ত্তি, ছবিখানি প্রায় ১০।১২ বৎসর পূর্ব্বে অরুণা ও অন্যান্য মেয়েরা কালীঘাটে পূজা দিতে যাইয়া আমার জন্য আনিয়াছিল। বিশ্বজননীর এই মূর্ত্তিকে আমি প্রভাতে

বিছানা হইতে উঠিবার সময়, রাত্রিতে শয়ন করিবার সময় এবং কখনও কখনও অন্যান্য সময়েও প্রণাম করি। সময়ে সময়ে এই চিত্রের সম্মুখে যাইয়া আমি দাঁড়াই। এই জননী আমার জীবনের প্রতি লক্ষ্য রাখেন বলিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস। কর্ম্মক্ষেত্রে বাহির হইবার সময় এবং সম্পদে-বিপদে তাঁহাকে স্মরণ করি, তাঁহার দৃষ্টি যেন আমাকে রক্ষা করে ইহা প্রার্থনা করি। কিছুদিন হইতে আমি এই দেবীমূর্ত্তিতে অসীম স্নেহ ও করুণা লক্ষ্য করিতেছি। কালী সাধারণতঃ ঘোরদর্শনা, করালবদনা, মহাভয়ঙ্করী। কিন্তু এই বিশ্বজননীর চক্ষুতে সময় সময় যে করুণা আমি লক্ষ্য করিতেছি তাহাতে আমি বিস্মিত হইতেছি। এই বিশ্ব-সম্রাজ্ঞী আমার ছোট-ঘরে আমার ছোট-মা হইয়া বিরাজ করিতেছেন, বিশ্ব শাসন করিবার সময় যে ভীষণ মূর্ত্তিতে তিনি প্রকাশিত হইয়া থাকেন সে মূর্ত্তি আমার নিকট সংবরণ করিয়াছেন, যে দৃষ্টির সম্মুখে চন্দ্রসূর্য্য গ্রহগণ, ইন্দ্রবরুণ দেবতাগণ, শুম্ভনিশুম্ভ দৈত্যগণ ভীত ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, সে দৃষ্টি আমার নিকট অতি কোমল, অতি করুণ, অতি মধুর হইয়া সময় সময় প্রতিভাত হইতেছে। এই জীবন্ত চক্ষুদ্বয় দেখিয়া আমি মোহিত হইয়া পড়ি, ঘোর দুর্য্যোগে বুকে সাহস পাই, এই প্রদীপ্ত চক্ষু নিষ্ঠুর পৃথিবীর প্রতি একবার কোপকটাক্ষপাত করিলে আমার সমস্ত বিপদ-আপদ মুহূর্ত্তের মধ্যে তিরোহিত হইয়া যাইবে ইহা আমি নিবিড় ভাবে বিশ্বাস করি। আমার কত অজ্ঞাত বিপদ এই চক্ষুর দৃষ্টি অপহৃত করিতেছে তাহা আমি জানিতেও পারি না, কিন্তু আমাকে ঘিরিয়া এই স্নেহময় দৃষ্টি সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছে ইহা আমি জানি এবং অনুভব করি। বহু দেবদেবীর চিত্র দেখিয়াছি কিন্তু যে চক্ষের দৃষ্টি এই কালীমূর্ত্তিতে সময় সময় লক্ষ্য করিতেছি তাহা অপূর্ব্ব, তাহা জীবনে আর কখনও দেখি নাই।

(৭)

৯ই ফেব্রুয়ারী, রবিবার। আজ প্রায় ২৫দিন পরে চালদাবাগান বৈষ্ণব সম্মিলনীতে প্রভুপাদ শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের তিরোধান উপলক্ষ্যে বিরহকীর্ত্তন শুনিতে গিয়াছিলাম। এই গোস্বামী মহাশয় ১২৭৪ বঙ্গাব্দে ১০ই কার্ত্তিক জন্মগ্রহণ করেন এবং - - সালে ৮ই মাঘ সকাল প্রায় ৮॥০ টার সময় ইহলোক পরিত্যাগ করেন। এই বৈষ্ণব মহাশয়ের ভক্তি ও শাস্ত্রজ্ঞান অসাধারণ ছিল। চালদাবাগানে বৈষ্ণব সম্মিলনী প্রধানতঃ তাঁহাব চেষ্টা ও অধ্যবসায়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্যভাগবত প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ শ্রীঅতুলকৃষ্ণ সঙ্কলন করিয়াছিলেন, "ভক্তের জয়" নামক অপূর্ব্ব গ্রন্থ তাঁহারই রচিত। অদ্য বেলা ৪ ঘটিকার সময় তাঁহার শোকসভা আরম্ভ হইল—সভাপতি কাসিমবাজারের মহারাজা শ্রী শ্রীশচন্দ্র নন্দী। অনেক বৈষ্ণব ও পণ্ডিত শ্রীঅতুলকৃষ্ণের নানাবিধ গুণাবলী সম্বন্ধে কবিতাপাঠ ও বক্তৃতা করিলেন। প্রথমেই প্রায় চল্লিশ বৎসর বয়স্ক একজন গোস্বামী মহাশয় ওজস্বিনী ভাষায় ও ভঙ্গীতে বক্তৃতা করিলেন। প্রসঙ্গক্রমে যাহা বলিলেন তাহা হইতে বুঝিলাম তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষিত ভদ্রলোক। তাঁহার ওষ্ঠ দুইটি তাম্বুলরাগরঞ্জিত এবং দেহের বেশভূষার পারিপাট্যও বিশেষ লক্ষণীয়। অপরাপর বক্তাগণের মধ্যে কেহ কেহ মহারাজা শ্রী শ্রীশ-চন্দ্র নন্দী মহাশয়কে "রাজর্ষি" বলিয়া, কেহ বা "মহারাজাধিরাজ" বলিয়া বক্তৃতা প্রসঙ্গে অভিহিত করিতেছিলেন। এই সমস্ত বৈষ্ণবগণের ঐশ্বর্য্যবান লোকের প্রতি অসাধারণ সম্মান প্রদর্শন ও মহারাজার উপস্থিতি সম্বন্ধে সীমাবিহীন সচেতনতা লক্ষ্য করিয়া, শ্রীচৈতন্যের পথাবলম্বী ভক্তগণও হৃদয়ের এই সাধারণ দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই দেখিয়া যুগপৎ

বিস্মিত ও দুঃখিত হইলাম। ইঁহাদের মধ্যে কোন কোন বক্তা মহারাজার গুণাবলী ব্যাখ্যা করিতেছেন, অথবা নিজের পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিতেছেন অথবা শোকসভায় শ্রীঅতুলকৃষ্ণের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিতেছেন তাহা নির্ণয় করা সময় সময় কঠিন হইয়া উঠিতেছিল। ভক্ত ও জ্ঞানী বৈষ্ণবও দেখিলাম, নিজের কথা নাই, ধনীর প্রশংসা নাই, ভক্ত শ্রীঅতুলকৃষ্ণের গুণাবলীর মধ্যে আপনাকে সম্যক্‌ভাবে নিমজ্জিত করিয়া অতি স্থির ও গম্ভীরভাবে শাস্ত্রের অমোঘ সত্যগুলিকে বিশ্লেষণ করিতেছিলেন। নগেন্দ্র বাবুর নিকট শুনিলাম এই বৈষ্ণবের নাম শ্রীগৌরাঙ্গদাস বাবাজী। সভার কার্য্য কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর বিখ্যাত রেডিও ও গ্রামোফোন গায়ক শ্রীযুক্ত পঙ্কজ কুমার মল্লিক পর পর দুইটি গান করিলেন। পঙ্কজবাবু কলিকাতার ভদ্রসমাজে বিশেষ সমাদৃত ও পরিচিত। তাঁহার প্রথম গানের

"ভোলা তোর মন-যমুনা উছলে যদি
তবে তুই একূল ওকূল ভাসিয়ে দিয়ে চলরে ভোলা।"

ইত্যাদি ছত্রগুলি হারমোনিয়াম সংযোগে গীত হইয়া সকলের প্রশংসা অর্জ্জন করিল। দ্বিতীয় গানটিও শ্রুতিমধুর হইল। কিন্তু বৈষ্ণব মহাজনের তিরোধান সভার উপযোগী হইবার মত ভক্তি ও বিশুদ্ধতা এই কণ্ঠের মধ্যে ছিল না, বিষয়ীর ভোগবিলাসবিজড়িত স্বরধ্বনি এই বৈষ্ণব সম্মিলনীর বায়ু ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত একসূত্রতা রক্ষা করিতে পারে নাই। অবশেষে কীর্ত্তন করিলেন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব শ্রীরামদাস বাবাজী। ইঁহার উপস্থিতি ও নামকীর্ত্তনই এই সভায় আমার প্রধান আকর্ষণ ছিল। বৎসরাধিককাল পূর্ব্বে পানিহাটীতে এই সাধুকে প্রথম দর্শন করিয়াছিলাম এবং তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও নামকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম, তাহা যথাস্থানে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। এই বৃদ্ধ বৈষ্ণব

সভামধ্যে উপস্থিত হইয়া উপবেশন করিলেন, কাহারও দিকে দৃষ্টি নাই, মহারাজা সভাপতির আসনে উপবিষ্ট, সেদিকে এই বৈষ্ণব-চক্ষু একবারও নিবদ্ধ হইতে দেখিলাম না। অবনত মস্তকে বসিয়া আছেন, স্থির ধীর, অচঞ্চল, হরিনাম গ্রহণে মন একেবারে নিমগ্ন। মধুর কণ্ঠে কীর্ত্তন আরম্ভ হইল—

বল নিতাই গৌর রাধেশ্যাম,
জপ হরেকৃষ্ণ হরে রাম॥

বলিষ্ঠ, অতি মধুর, যুবকের অপেক্ষাও কোমল অথচ তীব্র, বার্দ্ধক্যের সর্ব্ববিধ জড়তা ও দুর্ব্বলতাবর্জ্জিত এই কণ্ঠস্বর ধীরে ধীরে সমস্ত হল ঘরটিকে পরিপূর্ণ করিল। বিস্তৃত কক্ষের সমস্ত বায়ু ও মানুষের মন অধিকার করিয়া হরিধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। এই বিশুদ্ধ প্রাণ ও ভক্তি-সমন্বিত কীর্ত্তনধ্বনির তুলনা আর কাহারও সহিত সম্ভবপর নহে। শ্রীঅতুলকৃষ্ণ একদিন শ্রীরামদাসকে যে গূঢ় কথা বলিয়াছিলেন তাহাও কীর্ত্তন প্রসঙ্গে বাবাজী মহাশয় প্রকাশিত করিলেন। বহুবর্ষ পূর্ব্বে শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থিতিকালে শ্রীরামদাস বাবাজী মহাশয়ের গুরুদেব শ্রীচরণদাস বাবাজী মহাশয় শ্রীঅতুলকৃষ্ণের নিকট শ্রীকৃষ্ণের নৌকাবিলাস কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া শ্রীঅতুলকৃষ্ণকে বক্ষে লইয়া যমুনায় প্রায় দুইঘণ্টা ভাসিয়া বেড়াইয়াছিলেন। তিরোধানের দুইদিন পূর্ব্বে শ্রীঅতুলকৃষ্ণ শ্রীরামদাস বাবাজীকে আহ্বান করিয়া কীর্ত্তন শ্রবণ করাইতে বলেন এবং বাবাজী মহাশয় সেইদিন বেলা ২টা হইতে সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন ভাবে শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করিয়া অশীতিবর্ষবয়স্ক, অনন্তপথযাত্রী, বৈষ্ণব শ্রীঅতুলকৃষ্ণের আনন্দবর্দ্ধন করেন। শ্রীরামদাস বাবাজী মহাশয়ের কীর্ত্তন শেষ হইলে রাত্রি প্রায় ৮ ঘটিকার সময় বাড়ীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। এই সর্ব্বত্যাগী

বৈষ্ণবের দর্শন ও তাঁহার কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া এই দিনটিকে শুভ ও আপনাকে ভাগ্যবান মনে করিলাম।

(৮)

১০ ফেব্রুয়ারী, সোমবার। অন্নব্যঞ্জন নষ্টকরা অথবা রাস্তায় ফেলিয়া দেওয়া আমি কিছুতেই সহ্য করিতে পারি না, মেয়েরাও আমারই মত খাদ্যদ্রব্য নষ্ট করার সম্পূর্ণ বিরোধী। আজ সকালে আমাদের অন্যান্য তরকারীর মধ্যে পলতার সুক্ত হইয়াছিল। দ্বিপ্রহরে ডাক্তারবাবুর বাড়ী হইতে মাছের তরকারী ও পলতার সুক্ত আমাকে খাইতে দিয়া গেল। আমি ও আরতি সুক্ত যথেষ্ট পরিমাণে খাইলাম কিন্তু পরিমাণ দ্বিগুণ হওয়ায় কিয়দংশ উদ্বৃত্ত হইল। আমি ভাবিলাম, এই সুক্ত নষ্ট হইবে কারণ রাত্রিতে তিক্ত সুক্ত খাওয়া অরুচিকর। বিকালবেলা দেখি আরতি জলখাবারের লুচি লইয়াছে এবং সুক্তের বাটিটি নিকটে রাখিয়াছে। কিছু না বলিয়া আমি লক্ষ্য করিতে লাগিলাম এবং বিস্মিত হইয়া দেখিলাম যে, আরতি দুইখানি লুচিই সেই তিক্ত সুক্ত দিয়া ভক্ষণ করিল। লুচি সুক্ত দিয়া খাওয়া কষ্টকর বলিয়া আমি মন্তব্য প্রকাশ করিলে আরতি বলিল, "জিনিষ ফেলে দোব? লুচি দিয়ে খেলাম, খারাপ লাগল না।" আমি মনে মনে আরতির প্রশংসা করিলাম এবং ভাবিলাম যে, যাহারা লক্ষ্মীকে এইরূপে সমাদর করিতে শিখিয়াছে শ্রীভগবানের দয়ায় নিশ্চয়ই তাহাদের কখনও অন্নকষ্ট হইবে না। বাঙ্গালী জাতি এখনও অন্নব্যঞ্জনের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে শিখে নাই, কতদিন কলিকাতার রাজপথে প্রস্ফুটিত কুসুমের মত অন্নরাশি নর্দ্দমার পার্শ্বে পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে দেখিয়াছি তাহার নির্ণয় নাই। শ্রীভগবান লক্ষ্মীর এই অসম্মানের জন্য বাঙ্গালীকে কতরূপে শাস্তি দিতেছেন, দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি দণ্ড বাঙ্গালী জাতিকে

অবিরত কশাঘাত করিতেছে, তাহাতেও এই বিবেকবুদ্ধিবিহীন জাতির চৈতন্য হইতেছে না। একমুষ্টি অন্নব্যঞ্জনের জন্য কত লোক মরিতেছে অথচ সেই অন্নব্যঞ্জন অনাদরে রাস্তায় ছড়ান রহিয়াছে কতদিন দেখিয়াছি। আমি মেয়েদিগকে অন্নব্যঞ্জনের সমাদর করিতে পুনঃ পুনঃ শিক্ষা প্রদান করিয়াছি, সেই শিক্ষা ফলবতী হইয়াছে আজ তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া মনে মনে আনন্দিত হইলাম।

(৯)

১৯শে ফেব্রুয়ারী, বুধবার, শ্রীশ্রীশিবরাত্রি দিবস, আরতি শিবরাত্রির উপবাস করিয়াছে। এই ব্রত পালন করা বড়ই কঠিন, সেইজন্য আমি কোনদিন তাহাকে উৎসাহ প্রদান করি নাই, বরং কখনও এই বিষয়ে অন্যান্য মেয়েদের সহিত কথাবার্ত্তা হইলে প্রকারান্তরে বারণ করিয়াছি। পূর্ব্বদিন আরতি নিরামিষ ভক্ষণ করিয়াছিল এবং শিবরাত্রি দিবসে সমস্ত দিবস উপবাসী থাকিয়া পূজার নানাবিধ দ্রব্যাদি যোগাড় এবং আয়োজন করিতে লাগিল। আজ তাহাকে রন্ধন করিতে দিই নাই, আমি দুইবেলাই ডাক্তারবাবুর বাড়ীতে আহার করিয়াছি। সমস্ত দিন আমার খুঁটিনাটি কার্য্যগুলিও সে করিল, সন্ধ্যার পূর্ব্বে হইতে তাহাকে সম্পূর্ণ ছুটি দিলাম। উপবাসে শুষ্কমুখ, রুক্ষ ইতঃস্ততঃ বিক্ষিপ্ত চূর্ণকুন্তল, লালপাড় মটকার সাড়ি-পরিহিত আরতিকে সুন্দর দেখিলাম, কালিদাসের কুমারসম্ভব গ্রন্থে পঞ্চম সর্গে বর্ণিত উমার কথা বারংবার মনে পড়িতে লাগিল।

মৃণালিকাপেলবমেবমাদিভিঃ
ব্রতৈঃ স্বমঙ্গং গ্লপয়ন্ত্যহর্নিশম্।
তপঃ শরীরৈঃ কঠিনৈরুপার্জ্জিতং
তপস্বিনাং দূরমধশ্চকার সা॥

গঙ্গা মৃত্তিকায় চারটি শিবমূর্ত্তি গড়িয়া বিকালেই আমাকে দেখাইয়াছিল এবং তখনই আরতি বলিয়াছিল যে, সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া প্রহরে প্রহরে চারিবার শিবপূজা করিবে। সন্ধ্যা ৭টার সময় বাহিরের ঘরে বসিয়া কাজ করিতেছি, দ্বিতলের কক্ষ হইতে মন্ত্রধ্বনি আমার কর্ণে প্রবেশ করিল, রাত্রি ১০টায় সেই মন্ত্রধ্বনি পুনরায় শ্রবণ করিলাম। রাত্রিতে আমার ভাল করিয়া ঘুম হয় নাই, আরতি জাগিয়া আছে এবং পূজা করিতেছে ইহাই হঠাৎ জাগ্রত হইয়া সময় সময় মনে পড়িতেছিল। রাত্রি ১টা এবং ৪টার সময় আরতি পূজা করিয়াছিল ইহা পরে শুনিলাম। আজ সমস্ত দিবস মেঘাচ্ছন্ন আকাশ হইতে রহিয়া রহিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল, রাত্রিতে ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছিল, ঘরের মধ্যে সমস্ত দেহ লেপে আবৃত করিয়াও শীতের প্রভাব অনুভব করিতেছিলাম। পরদিন বৃহস্পতিবার সকালবেলা আরতি স্নান সমাপন করিয়া আমাকে ফল সন্দেশ ও চারি আনা দক্ষিণা দিল, প্রণাম করিল এবং তাহার পর নিজে পূজার প্রসাদ গ্রহণ করিল। দক্ষিণা অন্ততঃ একটাকা পাইব আশা করিয়াছিলাম কিন্তু মাত্র চারি আনা পয়সা দেখিয়া ভাবিলাম, দুইবেলা প্রচুর অন্নব্যঞ্জন ও মৎস্যভোজী, সমস্ত রাত্রি সুকোমল শয্যা ও লেপের মধ্যে স্বচ্ছন্দ-শায়িত ব্রাহ্মণ-পিতাকে আরতি হয়ত চারি আনা পয়সার অধিক প্রদান করা অর্থের অপব্যবহার বলিয়া মনে করিয়াছিল। একপেট খাইয়া সমস্ত রাত্রি ঘুমাইয়া যে চারি আনা পাইলাম তাহাই যথেষ্ট লাভ মনে করিতে বাধ্য হইলাম। দ্বিপ্রহরে রন্ধনকার্য্য সম্পন্ন করিয়া, আমাকে খাওয়াইয়া, নিজে আহার করিয়া আরতি ঘুমাইল না, এদিক্-ওদিক্ ঘুরিয়া সংসারের কার্য্য করিতে লাগিল। আমি বিকালবেলা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম ঘুম পাইতেছে কিনা, তাহাতে উত্তর দিল 'ঘুম পায় নাই তবে চক্ষু দুইটি কর্‌কর্

করিতেছে।' আমি মনে মনে হাসিলাম। রাত্রির আহার্য্যদ্রব্য সন্ধ্যার পূর্ব্বেই রন্ধন করিল এবং আমার নির্দ্দেশমত রাত্রি ৭॥০টার সময় নিজে আহার করিয়া আমার খাবার পানজল প্রভৃতি সমস্ত জিনিষ যথাস্থানে রাখিয়া আরতি রাত্রি ৮টার পূর্ব্বেই শয়ন করিল। আজ ২০শে ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার, এখন রাত্রি ৮॥০টা। আমি "স্মৃতিকথা" লিখিতে লিখিতে এইমাত্র একবার ভিতরের উঠানে যাইয়া দেখিলাম আরতির ঘরের আলো নিভান হইয়াছে, কোন সাড়াশব্দ নাই, বুঝিলাম দুইদিনের কৃচ্ছ্রসাধনের পর আরতি এখন গভীর নিদ্রামগ্ন।

আমি সমস্তদিন অবসর হইলেই আরতির এই শিবপূজার কথা চিন্তা করিতেছিলাম। কোন বহ্বাড়ম্বর নাই, প্রতিবাসী কাহাকেও জানাইবার ইচ্ছা নাই, অতি সহজ ও সরলভাবে নীরবে আরতি পূজার যোগাড় করিল এবং ব্রত সমাপন করিল। আরতি আমাদের বাড়ীতে কাহাকেও এইরূপ কৃচ্ছ্রসাধন করিতে দেখে নাই অথচ নিজেই এই উপবাস ও রাত্রি জাগরণের কঠোরতা আনন্দের সহিত গ্রহণ করিয়াছিল। পূর্ব্বজন্মের সংস্কার ব্যতীত এই মনোভাবের অন্য কোন সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আমি নিজে এইরূপ কঠোর উপবাস ও রাত্রিজাগরণ করিতে অক্ষম, সুতরাং বিস্ময়ের সহিত আরতির এই ব্রত ও পূজা আমি সমস্তদিন লক্ষ্য করিয়াছি। কালিদাস বলিয়াছেন "ন ধর্ম্মবৃদ্ধেষু বয়ঃ সমীক্ষ্যতে" ইহা বর্ণে বর্ণে সত্য। শ্রীমহাদেব সহজেই প্রীত হন সুতরাং আরতির এই উপবাস যে সেই দেবাধিদেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। শ্রীভাগবতে কপিলদেব বলিয়াছেন—"অমোঘা ভগবৎসেবা নেতরেতি মতির্ম্মম।"

(১০)

২৬শে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যাবেলা বাহিরের ঘরে বসিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীযুক্ত অসিতামোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেছি, এমন সময় রাস্তার দিকে বারান্দায় জনৈক বর্ষিয়সী মহিলা আসিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিবার জন্য আমার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তিনি বলিলেন, পথশ্রান্তিতে তিনি ক্লান্ত ও অসুস্থ কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া চলিয়া যাইবেন। অসিতাবাবু চলিয়া যাইবার পর দেখিলাম, মহিলা একটি ছোট পুঁটলি মাথায় দিয়া নিদ্রা যাইতেছেন। ইতিমধ্যে আমি অসুস্থ ছোট ডাক্তারবাবুকে দেখিতে চলিয়া যাইলাম। প্রায় এক ঘণ্টা পরে মহিলাটির নিদ্রাভঙ্গ হইলে আরতির সহিত নানাবিধ কথাবার্ত্তা শেষ করিয়া মহিলাটি বসিয়া আছেন দেখিলাম। আরতি আমাকে বলিল, তিনি নিজের কোন পরিচয় দেন নাই, কোথায় থাকেন তাহাও বলিলেন না। কিন্তু কথাবার্ত্তা শুনিয়া তাঁহাকে ভদ্রবংশসম্ভূত বলিয়া মনে হইতেছিল। আমি মহিলাটির সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া দেখিলাম ইংরাজি কথাবার্ত্তাও তিনি জানেন, আকৃতি ও আচার-ব্যবহার ভদ্রবংশের স্ত্রীলোকের মত। উজ্জ্বলশ্যামবর্ণা, মধ্যমাকৃতি, প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়স্কা, চশমা-পরিহিতা এই নারীর সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া সংস্কৃতি ও সৎবংশের পরিচয় বিরাজ করিতেছিল। কিন্তু তিনি নিজের পরিচয় আমাকে দিতে অস্বীকার করিলেন। তাঁহাকে ক্ষুধার্ত্ত জানিয়া বাড়ীতে লুচি ও তরকারী করিয়া দিতে চাহিলে আমাদের নিরামিষ রন্ধনের কোন ভিন্ন উনুন নাই শুনিয়া তিনি লুচি খাইতে অস্বীকার করিলেন। পরে রাত্রি প্রায় ৮॥০টার সময় আমি বাজারের কিছু সন্দেশ ও জিলাপি আনাইয়া দিলাম এবং তিনি তৃপ্তি সহকারে তাহা ভোজন

করিলেন। এই মহিলাকে দেখিয়া প্রথমে আমার মনে কোন সহানুভূতির উদয় হয় নাই অথচ পরে তাঁহার কথঞ্চিৎ ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে সমর্থ হইয়া মনে মনে বড়ই প্রীতিলাভ করিলাম। আমি ক্রমশঃ দেখিতেছি যে, ভাল কাজ করিবার শক্তিও মানুষের নাই, ভগবানের দয়া হইলে তবেই মানুষ সৎকার্য্য করিতে সমর্থ হয়। শ্রীপরমহংসদেব বলিতেন "মানুষ যন্ত্র তিনি যন্ত্রী," এই কথা বর্ণে বর্ণে সত্য।

শ্রীঅসিতামোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। অসিতাবাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের Establishment Section-এর কর্ম্মচারী। এই ভদ্রলোক আপনার চরিত্রের মিষ্টতা ও উদারতার গুণে অতি অল্পদিনেই আমার বন্ধুস্থানীয় হইয়াছেন। প্রায় ২।৩ বৎসর পূর্ব্বে ইঁহার একমাত্র পুত্র অজিত রিপন কলেজে প্রথম বার্ষিক বিজ্ঞান শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইয়াছিল এবং অজিতের শিক্ষকরূপে অসিতাবাবুর সহিত আমার পরিচয়ের সূত্রপাত। এক জায়গায় আমাদের উভয়ের জীবনে মিল ছিল এবং সেইজন্য বোধহয় বন্ধুত্ব এত সহজ হইয়াছিল—আমরা উভয়েই বিপত্নীক। বিশ্ববিদ্যালয়ের আফিসে আমার সময় সময় ছোট ছোট প্রয়োজন হইত, এবং সেই সময় অসিতাবাবুর সাহায্য লইতাম। অজিত যতদিন পড়িয়াছিল ততদিন অসিতাবাবুর সাহায্য সহজেই গ্রহণ করিয়াছিলাম, কিন্তু অজিত পাশ করিয়া যাইবার পরও যখন অসিতাবাবু অযাচিত ও অকুণ্ঠিতভাবে আমার কাজের সময় সাহায্য করিতে লাগিলেন তখন আমি বিস্মিত হইলাম। ভাল করিয়া অসিতাবাবুকে লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। দেখিলাম মিষ্টভাষী, শিষ্টাচারী এই ভদ্রলোক একগুণ উপকার পাইলে তাহার চতুর্গুণ করিয়া ফেরৎ দিয়া থাকেন, একবার উপকার পাইলে চিরদিন তাহা স্মরণ রাখেন। চরিত্রের এইরূপ বিশিষ্টতা আমি সচরাচর মানুষের মধ্যে দেখি

নাই। সুন্দর, হ্রস্বদেহ, প্রশান্তবদন এই ভদ্রলোকের সহিত বন্ধুতা আমার পরিণত বয়সের পরম সৌভাগ্য।

(১১)

৭ই মার্চ্চ, ২৩শে ফাল্গুন। কথাপ্রসঙ্গে আরতি আমাকে বলিল আজ পূর্ণিমার জন্মদিন। মেয়েদের জন্মদিনের কথা আমার মনে থাকে না কিন্তু আরতি তাহার দিদিদের, নিজের এবং দিদিদের ছেলেমেয়ে সকলেরই জন্মতারিখ মনে করিয়া রাখে। আরতি অত্যন্ত হিসাবী, বাবার টাকাকড়ি কি উপায়ে কম খরচ হইতে পারে সে বিষয়ে সর্ব্বদাই সচেষ্ট। সময়ে অসময়ে আরতি আমাকে মিতব্যয়িতার প্রয়োজনীয়তা বুঝাইবার চেষ্টা করে। আমি চুপ করিয়া শুনি কিন্তু ব্যয়সঙ্কোচ করিবার শক্তি অথবা ইচ্ছা আমার নাই। পূর্ণিমার জন্মদিনের কথা শুনিয়া আমি আরতির বক্তৃতা শুনিবার জন্য কৌতুক করিয়া বলিলাম—"বুজুর জন্মদিন আজ, তাহলে তাকে দশটা টাকা পাঠিয়ে দেওয়া যাক।" আরতি আমার কথা শুনিয়া হঠাৎ মুখর হইয়া উঠিল এবং পুরাতন ঘটনা ও স্মৃতি মন্থন করিয়া পূর্ণিমাকে টাকা দেওয়ার বিরুদ্ধে তর্কযুক্তি উত্থাপন করিতে লাগিল। আরতি বলিল, "আমি যখন ভাগলপুর গেছ্লাম তখন কি একদিনের জন্যও সে ঘর গুছুতে এসেছিল? আপনার খবর নিতে এসেছিল? আপনার যখন রাঁধুনি চলে গেল তখন ভাত রেঁধে দিতে এসেছিল? জুতো বুরুষ একদিন করে দিয়েছিল? ও স্বার্থপর আছে। অন্য মেয়েরা হলে আস্‌ত। সেদিন শুধু শুধু আপনি সেই ল্যাভেণ্ডার রংয়ের ১৭৲ টাকার কাপড়খানা ওকে দিয়ে দিলেন।" আমি মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর বাহিরের ঘরে মাদুরে শয়ন করিয়া নির্ব্বিকারচিত্তে আরতির বক্তৃতা শুনিতে শুনিতে কখন গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম

তাহা জানিতে পারিলাম না। আরতির তীক্ষ্ণ জিহ্বা হইতে তাহার অন্যান্য দিদিরাও সহজে নিষ্কৃতি পায় না। বিশেষতঃ যেখানে তাহার বাবার ব্যয়বৃদ্ধি হইবাব সম্ভাবনা সেখানে আরতি শিষ্টাচার মানে না এবং দিদিদের সম্মান বক্ষা করিতেও প্রস্তুত নহে। গত বৎসর জুন মাসে যখন অরুণা, করুণা ও পূর্ণিমা এখানে আসিয়াছিল তখন তাহাদের ছেলেমেয়েদের জন্য প্রচুর পবিমাণে দুধ ও হরলিক খরচ হইত। দুধের সঙ্গে মায়েরা ছেলেমেয়েদেব চিনি দিলে আরতি তাহাদিগকে তিরস্কার করিত, আবার দুধ খাওয়ার পর যদি চিনি বাটীর তলায় পড়িয়া থাকিত তাহা হইলে জিনিষ নষ্ট হইতেছে বলিয়া আবতি বিরক্তি প্রকাশ করিত।—"চিনি বাটীর তলায় পড়ে থাকে, তোমাদের বড় লবাবী।" ছেলেমেয়েদের অধিকবার হবলিক খাওয়াইলে আবতি বলিত "কেবল হরলিক। বার্লি খাওয়াতে পাব না? সেখানে তো বার্লি খাওয়াও, এখানে কেবল বাবার পয়সা খবচ করা।" "সেখানে" অর্থাৎ মেয়েদের নিজ নিজ শ্বশুর বাড়ীতে। মেয়েরা অন্য সব কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিত কিন্তু "সেখানে"র মর্য্যাদালঙ্ঘন হইবামাত্র তিনজনে এককণ্ঠে স্বামী-গৃহের সম্মানহানিকর ভাষার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া উঠিত। বড়দিদি হিসাবে প্রতিবাদের ভার অরুণার উপরেই পড়িত এবং অরুণা বলিত—"বড় গোছালী হয়েছিস্। ভারি কথা হয়েছে তোব।" দিদিরা সকলেই আরতিকে ভালবাসে সুতরাং মানঅপমানের অভিনয় সাধারণতঃ ঐখানেই শেষ হইত, তবে পূর্ণিমা ও আরতি পিঠোপিঠি বলিয়া পূর্ণিমা সহজে আরতিকে নিষ্কৃতি দিত না, পূর্ণিমার তর্জ্জন ও গর্জ্জন বহুক্ষণ ধরিয়া অথবা মধ্যে মধ্যে বিশ্রামের পর পুনঃ পুনঃ চতুর্দ্দিকে প্রতিধ্বনিত হইত। মেয়েদের এই বাদানুবাদগুলি আমি অত্যন্ত রুচির সহিত উপভোগ করি।

(১২)

২২শে মার্চ্চ, বিকাল ৫টার সময় নিমাইকে সঙ্গে লইয়া নিকটবর্ত্তী থানার ডাকবাক্সে চিঠি ফেলিতে যাইলাম। থানার কাছেই কয়লা-বোঝাই একখানি প্রকাণ্ড মোটরলরী দাঁড়াইয়াছিল। দেখিলাম এক দরিদ্র বৃদ্ধ সকলের সম্মুখেই লরী হইতে এক চাঙ্গড় কয়লা উঠাইয়া লইল এবং তাহার হস্তস্থিত বস্তায় পুরিয়া লইবার উপক্রম করিল। তৎক্ষণাৎ লরীর চালক আসিয়া বৃদ্ধকে তিরস্কার করিল এবং বৃদ্ধের মিনতি সত্ত্বেও কয়লাখণ্ডখানি কাড়িয়া লইয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিল। বৃদ্ধ মলিনমুখে মুহূর্ত্তের জন্য দাঁড়াইয়া অবশেষে ধীরে ধীরে অন্যদিকে চলিতে লাগিল। এই বৃদ্ধকে সামান্য একখণ্ড কয়লা হইতে বঞ্চিত হইতে দেখিয়া আমার মনে দুঃখ হইল, আমি তাহাকে ডাকিয়া আমার সহিত আসিতে ইঙ্গিত করিলাম। বৃদ্ধ অন্নাভাবে কৃশ, অত্যন্ত লম্বা, তাহার চক্ষু দুইটি কোটরগত, মনে হইল সমস্ত দিন রৌদ্রে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। তাহার হাতে একটি প্রকাণ্ড বস্তা, রাস্তা হইতে কুড়ান ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কাগজ-খণ্ডগুলিতে বস্তাটির অর্দ্ধেকের উপর পূর্ণ হইয়াছে। বৃদ্ধ আমার সহিত আসিল এবং বোধহয় ক্লান্তির জন্য আমার বাহিরের বারান্দায় বসিয়া পড়িল। আমি আরতিকে কিছু খাবার দিতে বলিলাম। বাড়ীতে বিশেষ কিছুই ছিল না, আরতি তাহাকে কিছু মুড়ি, ৪টি পাকা কলা, ৫খানা বাতাসা আনিয়া দিল। আমি তাহাকে চার আনা পয়সা দিলাম। বৃদ্ধ মুড়ি লইয়া তৎক্ষণাৎ চিবাইতে লাগিল এবং আমার প্রতি অপূর্ব্ব স্নিগ্ধ কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে নির্ণিমেষ লোচনে চাহিয়া রহিল। কিছু কয়লা দিব মনে করিলাম কিন্তু বোঝা বাড়িয়া যাইবে, বৃদ্ধের পক্ষে কষ্টকর হইবে মনে করিয়া বিরত হইলাম। মৃদুস্বরে আমাকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে

বৃদ্ধ চলিয়া গেল, আমি মনে মনে তাহার আশীর্ব্বাদ অবনত মস্তকে গ্রহণ করিলাম। সেদিন চিঠি ডাকবাক্সে দিবার কোন প্রয়োজন ছিল না, কারণ পরদিন সকালের পূর্ব্বে চিঠিগুলি পিওন লইয়া যাইবে না তাহা জানিতাম। কোন কাজ ছিলনা বলিয়া নিমাইয়ের সহিত বেড়াইতে বেড়াইতে চিঠি ফেলিতে যাইলাম। তখন বুঝিতে পারি নাই, বিশ্বজননী এই বৃদ্ধকে কিছু দিবার জন্য আমাকে সেদিকে আকর্ষণ করিতেছেন। তাঁহারই দয়া এই জড়পিণ্ড মানুষের হাত দিয়া চতুর্দ্দিকে বর্ষিত হইতেছে, যে গ্রহণ করে সে বুঝিতে পারে না, কিন্তু যে জড়পিণ্ডকে এইরূপ কার্য্যে বিশ্বজননী নিয়োজিত করেন তাহার মনুষ্যজন্ম সার্থক।

(১৩)

২৬শে মার্চ্চ দ্বিপ্রহরের পর কলেজ হইতে বাড়ী প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। প্রায় দুই ঘণ্টা পরে হঠাৎ কলিকাতার চতুর্দ্দিকে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা আরম্ভ হইল। আমি রাজাবাজারের সম্মুখস্থ Circular Road দিয়া সাধারণতঃ কলেজে যাই এবং বাড়ী প্রত্যাবর্ত্তন করি। দাঙ্গার সময়ে এই রাজাবাজারের সম্মুখস্থ রাস্তাটি হিন্দু যাত্রীদের পক্ষে বিপদসঙ্কুল হইয়া উঠে। এবারেও অসংখ্য হিন্দু এই রাস্তার সম্মুখে এবং অন্যান্য স্থানে হতাহত হইল। আমাদের পাড়ার একটি ভদ্রলোক সার্কুলার রোডে গুরুতররূপে আহত হইয়া হাসপাতালে নীত হইলেন—ভাগ্যক্রমে ভদ্রলোক বাঁচিয়া গিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে এইরূপ দাঙ্গা হইতেছে, গভর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণ উদাসীন, নিরীহ পথচারীগণ গুণ্ডাদের দ্বারা অতর্কিত ভাবে আক্রান্ত হইয়া হতাহত হইতেছে অথচ ইহা বন্ধ করিবার কোন ব্যবস্থাই অবলম্বিত হইতেছে না।

(১৪)

১লা এপ্রিল। দাঙ্গা চলিতেছে বলিয়া রাত্রি ৭টার পর হইতে Curfew (সান্ধ্য-আইন) প্রচলিত হইয়াছে। আমি ৭টার পূর্ব্বেই ঘরে ফিরিয়াছি এবং বাহিরের ঘরে বসিয়া পড়াশুনা করিতেছি। রাত্রি প্রায় ৮টার সময় হঠাৎ একটি চামচিকা রাস্তা হইতে উড়িয়া আসিয়া বাহিরের ঘরে মেজেতে পতিত হইল। আরতি রান্নাঘর হইতে আসিয়া সন্তর্পণে অনেক দূরে দাঁড়াইয়া ঘাড় হেঁট করিয়া চামচিকাটিকে লক্ষ্য করিল এবং বলিয়া উঠিল—"কে ফেলবে?" ঠিক সেই সময় ডাক্তারবাবুদের ঝি সিন্ধু ডাক্তারবাবুর জন্য ষ্টু রাঁধিবার জন্য টম্যাটো চাহিতে আমাদের বাড়ীতে প্রবেশ করিল। চামচিকাটিকে দেখিয়া সিন্ধু মন্তব্য প্রকাশ করিল—"এ ছুঁতে নেই, ছুঁলে রোগা হয়ে যায়।" আমি বলিলাম "আমি ফেলে দোব এখন, কারুকে ছুঁতে হবে না।" তখন আরতি বলিল "না আপনাকে ফেলতে হবে না, এ্যাকে রোগা হয়ে গেছেন।" আমি চুপ করিয়া কাজ করিতেছি তখন আরতি পুনরায় মন্তব্য প্রকাশ করিল—"চামচিকাটা বেশ মোটাসোটা।" কথাগুলি দুইবার পুনরাবৃত্তি করিল। আরতি বোধহয় আমাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিল যে, চামচিকা রোগা হইলে ছুঁইলে দোষ হইত কিন্তু এই চামচিকাটি যেহেতু মোটাসোটা তখন সাধারণ নিয়ম এক্ষেত্রে খাটিবে না। আমি উঠিয়া চামচিকাটিকে কাগজে করিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিলাম, আরতি তখন আসিয়া বারংবার আমার গা ও মাথায় গঙ্গাজল প্রক্ষেপ করিয়া চামচিকা স্পর্শ-জনিত শারীরিক দোষ ধৌত করিয়া দিল।

(১৫)

সাল, ইংরাজি ১৫ই এপ্রিল। নববর্ষের

বাহিরের ঘরে আসিয়া বসিলাম। আজ

কোন কাজ করিব না, অখণ্ড বিশ্রাম। সকাল প্রায় ৭৷৷০টার সময় নিমাইকে সঙ্গে লইয়া গাঙ্গুরামের দোকানে মিষ্টি কিনিতে যাইলাম। চালদাবাগান বৈষ্ণব সম্মিলনীতে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবার জন্য খই, বাতাসা, ফলফুল ও কিছু মালপোয়া পাঠাইয়া দিলাম, আরতির নামে পূজা দেওয়া হইল। আচার্য্য মহাশয় পূজা দিয়া আমাদের জন্য প্রসাদ ও শ্রীচরণামৃত পাঠাইয়া দিলেন। ছোট ডাক্তারবাবু, মন্নু এবং মমতাদের বাড়ী খাবার পাঠাইয়া দিলাম, উমাকে মিষ্টি ও টাকা দেওয়া হইল, নিমাই, ঝি যশোদা ও পাচক ঠাকুরকে কিছু মিষ্টি ও টাকা দিলাম। প্রতিবাসীদের মধ্যে কেহ কেহ নববর্ষ বলিয়া আমাকেও খাবার দিলেন। মন্নু, জয়ারাণী ও গৌরী ইহারা তিন বোন আসিয়া আমাকে প্রণাম করিল এবং খাবার দিয়া যাইল। সমস্তদিন কাজকর্ম্ম কিছুই করিলাম না, আনন্দের মধ্যে ভগবৎ স্মরণ করিয়া সময় অতিবাহিত করিলাম।

২১শে এপ্রিল গ্রীষ্মাবকাশের জন্য কলেজ বন্ধ হইল। এত পূর্ব্বে সাধারণতঃ ছুটি দেওয়া হয় না কিন্তু এখনও কলিকাতায় দাঙ্গা-হাঙ্গামার জন্য লোকজন মরিতেছে বলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ সমস্ত কলেজ ও স্কুল বন্ধ করিয়া দিলেন। প্রায় মাসাধিক হইতে চলিল তথাপি এখনও নরহত্যা নিবারিত হইল না। ১৬ই জুন কলেজ খুলিবার কথা আছে।

(১৬)

২৫শে এপ্রিল কলিকাতায় দাঙ্গা উপলক্ষ্যে এক শোচনীয় হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইল। নিত্যই তো কত নরহত্যা হইতেছে তাহার নির্ণয় নাই কিন্তু আজ অপরাহ্ণকালে মুসলমান-অধ্যুষিত পার্ক সার্কাস পল্লীতে ডাক্তার P. K. Sengupta আততায়ীর গুলিতে অপরাহ্ণকালে

নিজের বাড়ীতে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন শুনিয়া কলিকাতার সকলেই শিহরিয়া উঠিল। এই ভদ্রলোক ডাক্তারী করিতেন এবং বিশেষ করিয়া দরিদ্র মুসলমানগণই ইঁহার নিকট বিনা পয়সায় ব্যবস্থা ও ঔষধ পাইত। কিন্তু অপরাহ্ণকালে তাঁহার বৈঠকখানায় দুইজন মুসলমান প্রবেশ করিয়া গুলি করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিল। পশুদের মধ্যেও কৃতজ্ঞতা আছে, কিন্তু এই হত্যাকারীগণ পশু-সাধারণ গুণ হইতেও বঞ্চিত। বিশেষতঃ চিকিৎসকগণ সকলেরই শ্রদ্ধাপাত্র, ইঁহারা জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলেরই সেবা করিয়া থাকেন। ডাক্তার সেনগুপ্তের বয়ঃক্রম মাত্র ৪২ বৎসর হইয়াছিল, বিবাহ করেন নাই। M. Sc., M. B, C. H. B. (Edinburgh) প্রভৃতি উপাধিগুলি তাঁহার কৃতিত্বের পরিচায়ক। ডাক্তার বাবুর মাতা এখনও জীবিতা। ইঁহার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া বাংলার ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী Mr. A. K. Fazlul Haque সংবাদপত্রে লিখিলেন —"Captain P. K. Sen Gupta অদ্য অপরাহ্ণে গুলীবিদ্ধ হইয়া নিহত হইয়াছেন। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ন্যায় মর্ম্মান্তিক আর কিছু হইতে পারে না। তাঁহার মানবপ্রেম ছিল অনন্যসাধারণ। চিকিৎসক হিসাবেও তিনি বিশেষ কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি সকলকেই বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করিতেন।" কলিকাতায় হিন্দুগণ কি অশান্তি ও বিপদের মধ্যে বাস করিতেছে তাহা এই ঘটনা হইতে সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

(১৭)

৩০শে এপ্রিল। আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের I. A. পরীক্ষার খাতা-দেখা শেষ করিয়া সমস্ত খাতাগুলি Head Examiner শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য্যের বাড়ী দিয়া আসিলাম। এখনও হিন্দু-

মুসলমান দাঙ্গা স্থানে স্থানে চলিতেছে, সুতরাং অনেক রাস্তা ঘুরিয়া তারাপদদের গাড়িতে করিয়া সকালবেলা ৭২নং বালীগঞ্জ প্লেসে মোহিনী-বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। মোহিনীবাবু বাড়ীতেই ছিলেন, অল্পক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিয়া খাতাগুলি তাঁহাকে দিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। তাঁহার সহিত আমার প্রায় ১০।১২ বৎসরের পরিচয়। মোহিনীবাবু এখন কলিকাতা বিশ্ববিত্তালয়ের Post-Graduate Department-এ ইংরাজির চেয়ারে অধিষ্ঠিত। ক্ষীণকায়, হ্রস্বদেহ, শ্যামবর্ণ, এই অধ্যাপকের আকৃতিতে বিশেষ পরিলক্ষণীয় কিছুই নাই, কেবল কথাবার্ত্তার সময় চোখের ভিতর দিয়া উৎসাহদীপ্ত যে আলোক হঠাৎ সময় সময় বাহির হইতে দেখা যায় তাহাতে ইঁহার বুদ্ধির উৎকর্ষ সহজেই ধরা পড়ে। অধ্যাপকরূপে ছাত্রসমাজে ইঁহার সুখ্যাতি নাই,—বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর, সুস্পষ্ট উচ্চারণ এবং সহজ ও হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতাশক্তি ইঁহার মধ্যে বিশেষ পরিদৃষ্ট হয় না। সুতরাং University-র ছাত্রবাজারে মোহিনী-বাবুর মূল্য আশানুরূপ না হইবারই সম্ভাবনা। অথচ আমি অনেক সময় ইঁহার সহিত নানাবিধ বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিয়া লক্ষ্য করিয়াছি যে গভীর মননশীলতা, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণশক্তি, রসগ্রাহিতা ইঁহার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে বর্ত্তমান। Edmund Spenser সম্বন্ধে যে thesis মোহিনীবাবু Ph. D. উপাধির জন্য লিখিয়াছিলেন তাহাতে মোহিনীবাবুর সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায় না—সে যেন ভাসা ভাসা ভাব, বাছা বাছা কতকগুলি শব্দ প্রয়োগ মাত্র। কিন্তু পরে Spenser সম্বন্ধে তিনি যে সমস্ত গবেষণা করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার গভীর চিন্তাশক্তি ও সাহিত্যরসাস্বাদী মনের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। আমেরিকা হইতে প্রকাশিত Variorum Edition Spenser-এর ভিতর মোহিনীবাবুর এই গবেষণার উল্লেখ আছে। পূর্ব্বে দেখিতাম যে, মোহিনীবাবুর চরিত্রে যথেষ্ট রুক্ষতা রহিয়াছে—হঠাৎ

লোকের উপর বিরক্ত হইয়া উঠেন, মুখ ভার করিয়া বসিয়া থাকেন, শিষ্টাচার রক্ষা করিবার মত মুখের কথা বলিতেও যেন তাঁহার যথেষ্ট কার্পণ্য। তাঁহার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আমি তাঁহার অনেক সহযোগীর মুখেও শুনিয়াছি। কিন্তু ক্রমশঃ বৎসরের পর বৎসর লক্ষ্য করিতে লাগিলাম যে, তাঁহার প্রকৃতির যেন পরিবর্ত্তন হইতেছে,—শিক্ষিত লোক চেষ্টা করিয়া কিরূপে নিজের ব্যবহারের মধ্যে মাধুর্য্য ও উদারতা আনিতে পারেন মোহিনীবাবু তাহার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মোহিনীবাবু নীরব কর্ম্মী, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণের কল্যাণের জন্য তিনি কত চিন্তা করেন তাহার পরিচয় আমি অনেক সময় পাইয়াছি। কি করিলে ছাত্রগণের ইংরাজির শিক্ষা অধিকতর ফলপ্রদ হইতে পারে, ইংরাজি শিক্ষার মান কিরূপে ধীরে ধীরে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাড়ান যাইতে পারে, কোথায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুলত্রুটির জন্য ছাত্রগণ পরিশ্রম সত্ত্বেও যথেষ্ট সুফল পাইতেছে না—এই সমস্ত মোহিনীবাবু প্রায়ই চিন্তা করিয়া থাকেন এবং শিক্ষাব্রতী লোক পাইলেই তাঁহার সহিত এই বিষয়ে আলোচনা করেন। যখন Matriculation, I. A., B. A. অথবা M. A.-র ইংরাজি পাঠ্য বিষয়বস্তু লইয়া আলোচনা করেন তখন মনে হয় ইংরাজিশিক্ষাই মোহিনীবাবুর জগতে ও জীবনে একমাত্র সার বস্তু,—ইংরাজির বাহিরে যেন মানুষের জীবনে আর কোনও প্রয়োজনীয় বিষয় নাই। ইঁহার পরিশ্রম করিবার শক্তি অসাধারণ। আমরা কয়েকজন পরীক্ষক তাঁহার বাহিরের ঘরে বসিয়া পরীক্ষাসংক্রান্ত কাজ করিতেছি, মোহিনীবাবু দ্বিপ্রহরে ভাত খাইয়া আমাদের পাশের বেঞ্চিতে একখানি গলিতপত্র মোটা বই মাথায় দিয়া দশ মিনিট শুইয়া বিশ্রাম করিলেন, তাহার পর উঠিয়া সমানে আমাদের সহিত কাজ করিয়া যাইতে লাগিলেন। সন্ধ্যা হইল, তথাপি কাজের বিরাম নাই। মোহিনীবাবুর বাংলাসাহিত্য কিরূপ পড়া আছে জানি না, কিন্তু তাঁহার

বাংলা রচনা আমি দেখিয়াছি, মনে হইয়াছে—ইঁহার ইংরাজি অপেক্ষা বাংলা রচনাভঙ্গী অধিকতর সুন্দর, অধিকতর হৃদয়গ্রাহী। অথচ পরিশ্রমকুশলতা, কার্য্যে একনিষ্ঠতা, গভীর চিন্তাশক্তি প্রভৃতি নানাবিধ গুণাবলীর অনুপাতে মোহিনীবাবু শিক্ষিত সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন নাই—ইংরাজির চেয়ারে অধিষ্ঠিত ভূতপূর্ব্ব দশজনের মত তিনিও একজন, ইহাই অধিকাংশ লোক জানেন। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, বাংলাদেশে,—বোধ হয় পৃথিবীর সর্ব্বত্র—নিজেকে মানব-চক্ষুর সম্মুখে স্থাপিত করিতে হইলে যে-পরিমাণ আত্মপ্রচার প্রয়োজন তাহা মোহিনীবাবুর মত নীরব কর্ম্মীর মধ্যে নাই। বিখ্যাত ধনী ব্যবসায়ী Henry Ford একবার বলিয়াছিলেন যে, মানুষ কবিতা, ছবিআঁকা, বিজ্ঞান প্রভৃতি ক্ষেত্রে genius স্বীকার করে অথচ প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করাও যে একরকম genius-সাপেক্ষ, কবিতা-লেখার মত অর্থো-পার্জ্জন করার কৌশলও যে সকলের পরিজ্ঞাত নহে—ইহা মানুষ স্বীকার করে না। সেইরূপ শুধু গুণ থাকিলেই মানুষ খ্যাতি অর্জ্জন করে না,—খ্যাতি অর্জ্জন করিবার কৌশল জানা চাই। একজন বিখ্যাত ইউরোপীয় অধ্যাপক এই কথাই লিখিয়াছেন :

"Was it not Goethe who remarked that in the neighbourhood of all famous men we find men who never achieve fame, and yet were esteemed by those who did, as their equals or superiors? Descartes, I think, said the same thing. Fame will not run after the men who are afraid of her. She makes mock of those trembling and respectful lovers who deserve but cannot force her favours. The public is won by the bold, imperious talents—



by the enterprising and the skilful. It does not believe in modesty, which it regards as a device of impotence. The golden book contains but a section of the true geniuses ; it names those only who have taken glory by storm."

মোহিনীবাবুকে দেখিয়া এই কথাগুলি আমার মনে পড়িত—"modesty" তাঁহার চরিত্রের একটি বিশিষ্টতা এবং এই 'modesty'র জন্যই তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিতে পারেন নাই।

স্বভাবতঃ স্বল্পভাষী এই ভদ্রলোক আমার সহিত কথাবার্ত্তা কহিবার সময় মুখর হইয়া উঠেন, মন খুলিয়া কথাবার্ত্তা বলেন, তখন ইঁহার ভিতরের মানুষটিকে আমি ভাল করিয়া দেখিতে পাই এবং দেখিতে ভালবাসি। কী স্নেহশীল পিতা! ছেলেমেয়েদের সামান্য অসুস্থতা ইঁহার মনে কল্পনার রংয়ে অনেক বড় হইয়া দেখা দেয়। কলেরার টীকা লইয়া মেয়ের পেটের অসুখ করিয়াছে, পেটের অসুখ হয়ত কলেরায় দাঁড়াইতে পারে, এমন হয়ত কোন কোন ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়াছে,—এইরূপ 'হয়ত'-দুশ্চিন্তার ধাক্কায় একজন এতবড় পণ্ডিতের মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত সমস্ত কলকব্জাগুলি হঠাৎ বিকল হইতে দেখিয়াছি। স্নেহাধীন এইরূপ শিক্ষিত মানুষ দেখিলে আমি মনে মনে হাসি,—ভাবি মহামায়ার কী লীলা,—শিক্ষা, সংস্কৃতি, বুদ্ধি সব চাপা পড়িয়া মায়াধীন পূর্ব্বজন্মসংস্কার প্রবল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। স্বভাবতঃ নীরস ও স্বল্পভাষী এই অধ্যাপক আবার গান শুনিতে ভালবাসেন। বাড়ীতে গায়কের সমাবেশ হইয়াছে, গান চলিতেছে, আমি মোহিনীবাবুকে লক্ষ্য করিতেছি,—সে মানুষই নয়! মনের ভিতর গানের প্রতিধ্বনি বাহিরের চক্ষু ও মুখের ভঙ্গীতে মুহুর্মুহুঃ প্রকাশিত হইতেছে—ভাবপ্রবণ চিত্ত সমস্ত শরীরটিকে এক একবার চঞ্চল করিয়া তুলিতেছে। দুই একবার

এইরূপ দেখিয়া আমার সন্দেহ হইয়াছে, মোহিনীবাবুর বাহিরের কঠোরতা ও নীরসতার অন্তরালে একটি ভাবপ্রবণ মন লুক্কায়িত আছে। অথচ বাহিরের ছবির সঙ্গে ভিতরের এই ভাবপ্রবণতার মোটেই মিল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আমি পরম কৌতুকের সহিত লক্ষ্য করিয়াছি যে, এই ইংরাজি-শিক্ষিত বিলাত-ফেরত, বিদ্বান অধ্যাপকের দক্ষিণ হস্তে নানাবিধ আকারের একর্কাড়ি মাদুলি বেশ আঁটসাঁট করিয়া বাঁধা আছে। শরীর রক্ষার জন্য ভগবানের দয়া যথেষ্ট নহে, স্বাস্থ্যের নিয়ম রক্ষা করাও যথেষ্ট নহে, মধ্যে মধ্যে মধুপুরের বাড়ীতে যাইয়া বায়ু-পরিবর্ত্তনও যথেষ্ট নহে,—তাই আজ এই ইংরাজির অধ্যাপককে শরীরধারণের জন্য কতকগুলি তামার, রূপার ও সোণার ঢোলকের পশ্চাতে আশ্রয় লইতে হইয়াছে। সমাজ, জাতি ও জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কার এতই অনতিক্রমণীয়! ইঁহার চরিত্রে একটা দুর্ব্বলতা লক্ষ্য করিয়া আমি সময় সময় বড়ই দুঃখিত হইয়াছি। যে সমস্ত লোকের দ্বারা কার্য্যের একটু বেশী সহায়তা পাইয়া থাকেন তাহাদের অসাধু আচরণ, মনের সঙ্কীর্ণতা, স্বার্থসিদ্ধির বীভৎস ক্ষুধাও মোহিনীবাবুর নিকট উপেক্ষণীয়। অনেক সময় বিশ্বাসভাজন, নির্ভরযোগ্য মানুষকে পরিত্যাগ করিয়া তিনি সাময়িক সুবিধার জন্য স্বার্থান্বেষী লোককে প্রশ্রয় দিয়াছেন। এইরূপ দুর্ব্বলতা আরও কোন কোন প্রধান পরীক্ষকের মধ্যে আমি লক্ষ্য করিয়াছি। ইহার ফলে আজ কয়েক বৎসর হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা-প্রণালীর নানাবিধ বিশ্বাস্য ও অবিশ্বাস্য কুৎসা ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক সমাজে ভাসিয়া বেড়াইতেছে—তাহাও আমার কাণে আসিতেছে। মোহিনীবাবুকে নানাবিধ কারণে আমি শ্রদ্ধা করি সুতরাং তাঁহার এই দুর্ব্বলতা আমার ভাল লাগে না। মোটকথা খাদ না থাকিলে গড়ন হয় না। তথাপি এই অধ্যাপকের জীবনে নানাবিধ সদ্গুণ

ছোটখাট দুর্ব্বলতাকে প্রায় ঢাকা দিয়া ফেলিয়াছে, তাই ইঁহার সঙ্গে কথা কহিয়া আমি অনেক সময় যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়াছি।

(১৮)

৯ই মে তারিখে প্রমথবাবুর একখানি পত্র পাইলাম, পত্রখানি ৮ই মে লিখিত। শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা পূর্ব্বে অনেক স্থলে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। প্রমথবাবু উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী, বর্ত্তমানে হাবড়ায় ডেপুটি পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। এই বন্ধু আমার বয়োজ্যেষ্ঠ, সংসারের অভিজ্ঞতা ইঁহার অনেক বেশী, জ্ঞান ও স্থির-বুদ্ধিতে আমার অপেক্ষা অনেক প্রবীণ। বিশেষতঃ ধর্ম্মবিশ্বাস ইঁহার জীবনে এক পরিলক্ষণীয় বস্তু। কিন্তু এইরূপ লোক যখন আমার প্রশংসা করিয়া পত্র দেন, তখন আমার মস্তক লজ্জায় ধূলিতে লুটাইয়া পড়ে, আমি চোখের জলে বারংবার ভগবানকে স্মরণ করি। প্রমথবাবুর কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহের জন্য অনেকদিন হইতে চেষ্টা চলিতেছিল, সম্প্রতি তাহার বিবাহ সুসম্পন্ন হওয়ায় প্রমথবাবু নিশ্চিন্ত হইলেন। তিনি এই সংবাদ জানাইয়া আমাকে ১৬, ভবানন্দ রোড কালীঘাট হইতে ৮ই মে-র পত্রে লিখিলেন, "·········শুনিয়া আনন্দিত হইবেন যে, আমি এখন ভগবৎ আশীর্ব্বাদে কন্যাদায় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছি। আপনাকে এই সংবাদ দিবার জন্য বড়ই উৎকণ্ঠিত ছিলাম। আপনার নিকট হইতে যে সব শিক্ষা পাইয়াছি তাহাতে আমাকে পূর্ব্বাপর অগ্রসর হইতে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। আপনি আমার গুরুস্থানীয়। সাক্ষাতে অন্যান্য কথা বলিব।·········" আমি এই পত্র পাঠ করিয়া স্তম্ভিত হইলাম, ভূমিতে মস্তক রাখিয়া প্রমথবাবুকে প্রণাম করিলাম, ভগবানকে স্মরণ করিলাম। কেহ প্রশংসা করিলে তাহা উল্লেখ করা

অথবা লিপিবদ্ধ করা মূর্খের কার্য্য, কিন্তু যদি সেই প্রশংসার পাত্র সত্যসত্যই প্রশংসার অধিকারী হয় তাহা হইলেই এই সাধারণ নিয়ম রক্ষা করা তাহার কর্ত্তব্য। নতুবা লোকে তাহাকে যশোলিপ্সু বলিয়া ঘৃণা ও পরিহাস করিবে। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে এই প্রশংসা এতই মিথ্যা ও বৃথা যে তাহার উল্লেখ না করিলে আমার আত্মপ্রবঞ্চনা করা হইবে, ভগবানের নিকট আমি অপরাধী হইব। অন্তর্য্যামী জানেন আমি কি, কি উপাদানে আমার মন ও চরিত্র গঠিত, আমাব ভিতরে যে কদর্য্যতা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে তাহা সম্পূর্ণরূপে আমিও জানি না। কিন্তু যেটুকু নিজেকে চিনিতে পারিয়াছি তাহাতে সময় সময় অন্ধকার রাত্রিতে নির্জ্জন কক্ষে একাকী জাগিয়া চিন্তা করিয়া লজ্জিত হইয়াছি, নিজের জীবনে ধিক্কার আসিয়াছে। আজ বন্ধুবান্ধবের নিকট হইতে এই প্রশংসার ভার নীরবে সহ্য করা আমার পক্ষে এতই কঠিন যে, চোখের জলেও সে জ্বালা অথবা লজ্জার লঘুতা সম্পাদিত হয় না। আমি জানি, আমার অন্তর্য্যামী জানেন, বন্ধুবান্ধব অথবা ছাত্র অথবা গুরু-স্থানীয় কোন লোকের নিকট সময় সময় যে সম্মান ও প্রশংসা আমি পাই তাহা আমার জীবনে একটা বিরাট পরিহাস মাত্র।

(১৯)

১৬ই মে, শুক্রবার। এখন রাত্রি ৮৷৷৹টা—আমি স্মৃতিকথা লিখিতেছি, আমার সম্মুখে টেবিলের কাছে মেজের উপর বসিয়া আরতি গীতার একাদশ অধ্যায় মুখস্থ করিতেছে। আজ কয়েকদিন ধরিয়া আরতির শ্লোক মুখস্থ করার খুব উৎসাহ হইয়াছে। শ্রীভাগবত, উপনিষদ প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থের ভাল ভাল শ্লোক আরতি আমার নিকট হইতে তাহার একখানি খাতায় লিখিয়া লইয়াছে, মানে বুঝিয়া লইয়াছে এবং অতি দ্রুতগতিতে

মুখস্থ করিয়া ফেলিতেছে। তাহার এই উৎসাহ দেখিয়া আমি তাহাকে প্রশংসা করি এবং খুব মনোযোগ সহকারে শ্লোকগুলির অর্থ গ্রহণ করিয়া সে সেইগুলি কণ্ঠস্থ করিবার চেষ্টা করে। ৫।৭ দিনের মধ্যেই অনেকগুলি শ্লোক তাহার মুখস্থ হইয়া গিয়াছে, আবার তাহার ভিতর হইতে কিছু কিছু লিখিয়া তাহার বড়দিদিকে বিতরণ করিয়াছে। আরতির ছোট দিদি অথবা সেজদিদির উপর তাগর কোন আস্থা নাই, তাহাদের মধ্যে কেহ বা নাস্তিক কেহ বা অলস, ইহাই আরতির অভিমত। সুতরাং আরতি তাহাদিগের দুইজনকে কোন শ্লোক লিখিয়া পাঠায় না। দুইটি দিদির সম্বন্ধে আরতির এই অদ্ভুত মন্তব্য শুনিয়া আমি সময় সময় খুব হাসিয়া থাকি। এখন আরতি গীতা আবৃত্তি করিতেছে, সম্মুখে চেয়ারের উপর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, উপনিষৎ, স্তবের বই পড়িয়া আছে, তাহার সঙ্গে হিসাবের খাতা এবং ছোট ডাইরীখানিও লক্ষ্য করিতেছি। এই সমস্ত উৎকৃষ্ট ভাবপরিপূর্ণ শ্লোকগুলিব প্রতি আমার অসংখ্য ছাত্রছাত্রীগণের দৃষ্টি অনেক সময় আকর্ষণ করিয়াছি কিন্তু তাহাদের মধ্যে কাহাকেও ইহা গ্রহণ করাইতে পারি নাই। আজকালকার ছাত্র-ছাত্রীগণের ধর্ম্মভাব অত্যন্ত বিরল। তাই আরতিব উৎসাহ দেখিয়া আমি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি।

(২০)

১৮ই মে রবিবার। আজ বেলা প্রায় ১॥০ টার সময় সমু ও অমু তাহাদের বাবার সহিত আমাদের বাড়ী আসিল, পূর্ব্ব হইতেই কথা ছিল তাহারা দুইভাই আমার এখানে কিছুদিন থাকিবে। সমুর হাতে একটি পুঁটলি এবং তাহার ভিতর একটি জীর্ণ মণিব্যাগে সমুর বহুদিন-সঞ্চিত সম্পত্তি—১।৶১৫। অমু সম্পূর্ণ নিঃস্ব এবং বৈরাগ্যবান।

উভয়ের মুখ ও দেহ বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র অসংখ্য ফোড়া ও পাঁচড়ায় পরিপূর্ণ। দুই ভাই বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াই তারকণ্ঠে বারংবার ঘোষণা করিল, তাহারা বাবা ও মাকে ছাড়িয়া দাদুর বাড়ীতে একাকী বহুদিন বাস করিতে সমর্থ, সাধারণ বদ্ধজীবের ন্যায় বালীর কাহারও জন্য তাহাদের মনকেমন করিবে না। জীবন কিছুক্ষণ পরে বালী ফিরিয়া যাইল। সমু দ্বিতলে তাহার ছোটমাসিমার নিকট যাইয়া বলিল, "ছোট মাসিমা, আমাদের যাবার সময় একটা জাম্বাক কিনে দিও।" সমুর ছোট মাসিমা সমস্ত কাজকর্ম্ম করিতে পারে, স্নেহ প্রদর্শনার্থ বোনপোদের সেবা-শুশ্রূষা করিতেও আপত্তি নাই, কিন্তু পয়সা খরচ করিয়া কিছু দিতে হইলে তাহার মেজাজ তিক্ত হইয়া যায়। সুতরাং আরতি উত্তর দিল— "বাড়ীতে ঢুকতে না ঢুকতে জিনিষের ফরমাস্, তোর মা শিখিয়ে দিয়েছে বুঝি?" সমু সহজে দমিবার পাত্র নয়, সে উত্তর দিল "তোমাকে বল্লে হবে না, দাদুকে বলতে হবে।" দ্রুতগতিতে সমু সিঁড়ি বাহিয়া নীচেয় আসিয়া বাহিরের ঘরে প্রবেশ করিল এবং একটি জাম্বাকের প্রয়োজন আমাকে জানাইল। আমি জাম্বাক কিনিয়া দিবার আশ্বাস দিলাম, সমু ও অমু হৃষ্টচিত্তে চতুর্দ্দিকে খেলা করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

(২১)

৩রা জুন, মঙ্গলবার। ভারতবর্ষে কি প্রকার শাসনতন্ত্র গঠিত হইবে, ইংরাজজাতি ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কিরূপ মীমাংসা করিয়া যাইবে তাহা লইয়া বহুদিন হইতে অনেক গবেষণা চলিতেছিল। আজ রাত্রি ৮টার (Bengal Time) সময় বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেন এবং পরে প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত জহরলাল নেহেরু, মুসলমান নেতা Mr. Jinnah এবং সর্ব্বশেষে যুদ্ধমন্ত্রী শ্রীযুক্ত বলদেও

সিং ভারতের সর্ব্বজাতি ও দল কর্ত্তৃক গৃহীত এক মীমাংসা সম্বন্ধে রেডিওতে বক্তৃতা করেন। ভারতবর্ষ হিন্দু ও মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চল হিসাবে দুইভাগে বিভক্ত হইল। বাংলা ও পাঞ্জাব প্রত্যেক প্রদেশ দুইভাগে বিভক্ত হইল। অখণ্ড ভারতবর্ষের আদর্শ লইয়া কংগ্রেস যে এতদিন দুঃখ ও ত্যাগ বরণ করিতেছিল তাহা নিষ্ফল হইলেও, মন্দের ভাল বলিয়া সকলেই হৃষ্টচিত্তে ইহা গ্রহণ করিল। বিশেষতঃ বাঙ্গালী হিন্দুরা বহুদিন হইতে মুসলমান League গভর্ণমেণ্টের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারা হিন্দুদের জন্য পশ্চিমবঙ্গে পৃথক গভর্ণমেণ্ট স্থাপিত হইবার আশ্বাস পাইয়া নিশ্চিন্ত হইল। আমি Captain নরেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীতে বসিয়া তাঁহার রেডিওতে সমস্ত বক্তৃতাগুলি নিবিষ্টমনে শ্রবণ করিলাম। লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের কথাগুলি বেশ সুস্পষ্ট, সহজ ও সরলভাবে প্রকাশিত হইতেছিল। লোকমুখে শোনা যায় যে, এই নূতন ভাইসরয় ভদ্র এবং ভারতবর্ষের হিতকামী বন্ধু এবং তাঁহারই চেষ্টায় বহুদিনের হিন্দু-মুসলমানের কলহ অন্ততঃ সাময়িকভাবে দূরীভূত হইল। আজিকার এই রাজনৈতিক ঘোষণা ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা।

(২২)

৪ঠা জুন, বুধবার। আজকাল গ্রীষ্মাবকাশের জন্য কলেজ বন্ধ থাকায় দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর আমি বাহিরের ঘরে মাদুর পাতিয়া বিশ্রাম করি, ইলেকট্রিক পাখা খোলা থাকে। আজ অভ্যাসমত শুইয়া আছি, সমু আমার পা টিপিয়া দিতেছে, আরতি ও অমু বসিয়া আছে। অমু ধীরে ধীরে স্বেচ্ছায় আরতির পা টিপিতে আরম্ভ করিল। আরতির পা টিপিবার লোক এ বাড়ীতে কেহই নাই সুতরাং এই অপ্রত্যাশিত সম্মান লাভ করিয়া আরতি বিশেষ আনন্দিত হইল। অমুর সহিত

কথাবার্ত্তায় আরতির এই প্রসন্নতা মুহুর্মুহুঃ প্রকাশিত হইতেছিল। হঠাৎ আনন্দের আতিশয্যে আরতি অমুকে বলিল—"তুই তো খুব ভাল করে পা টিপ্‌ছিস্, কি নিবি বল্?" আমি ভাবিলাম আজ অমুর পরম সৌভাগ্য, অ-দাতা বলিয়া কীর্ত্তিশালিনী ছোটমাসিমার নিকট তাহার আজ বিশেষ প্রাপ্তিযোগ, নিশ্চয়ই ২।৩ টাকা পুরস্কার অমু লাভ করিবে। কিন্তু অমুর নিষ্কাম কর্ম্ম, বারংবার মাসিমা কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়াও সে উত্তর দিল—"আমার কিচ্ছু চাইনা, আমি কিচ্ছু নোবনা।" আমি মনে মনে অমুর বুদ্ধির নিন্দা করিতেছিলাম, আজ এই শুভ মুহূর্ত্তে প্রসন্নহৃদয় মাসিমার নিকট সে হয়ত একটা মোটা গোছের টাকা চাহিলেও পাইত, অথচ কেবলই বলিতেছে "কিছুই লইবনা।" অবশেষে দান করিতে কৃতসঙ্কল্প আরতি অমুকে বলিল—"আমি তোকে আজ এক মুঠো মুড়কি বেশী দোব।" এই দানসঙ্কল্প শ্রবণ করিয়া আমার চক্ষু চড়কগাছ হইল, কোথায় টাকাকড়ি বর্ষিত হইবে সেইস্থানে মুষ্টিমেয় মুড়কি মাত্র; এ যেন রামচন্দ্র রাজা হইবেন, হঠাৎ তাঁহার প্রতি বনগমনের আদেশ! আরতির দানশক্তি উপলব্ধি করিয়া আমি বিস্ময়ে হতবাক্ হইলাম এবং চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পাশবালিশ পায়ে দিয়া নিদ্রার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

(২৩)

৬ই জুন, শুক্রবার। দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর অভ্যাসমত বাহিরের ঘরে শয়ন করিয়াছিলাম, বেলা ১॥৹টার সময় যখন উঠিলাম তখন পেটে দারুণ যন্ত্রণা। ক্রমশঃ ভেদ ও বমি আরম্ভ হইল। বমি করিতে আমার বড়ই কষ্ট হয়, যেন দম বন্ধ হইয়া আসে। দ্বিপ্রহরে যাহা খাইয়াছিলাম তাহা সমস্তই অজীর্ণ বমি হইয়া গেল। কিছুদিন হইতে পার্শে প্রভৃতি

মাছ আমি খাইতে পারি না, খাইলেই কিছুক্ষণ পরে পেটব্যথা আরম্ভ হয় এবং গা বমি বমি করে। আজ চিংড়িমাছ খাইয়াছিলাম, পূর্ব্বে চিংড়িমাছ খাইয়া এরূপ ভেদবমি কখনও হয় নাই কিন্তু এবার চিংড়ি-মাছও পেটে সহ্য হইল না। আমি অসুস্থ হইয়া শয্যাশায়ী হইলাম, শরীরে কিছু শক্তি আছে বলিয়া মনে হইল না। আমি ভাবিতে লাগিলাম যে, বার্দ্ধক্যে তীর্থস্থানে যাইয়া দিনযাপন করিব সঙ্কল্প আছে কিন্তু শরীর যদি এতই অপটু হয় তাহা হইলে বিদেশে অপরিচিত স্থানে একাকী অবস্থান করা আমার পক্ষে সহজ হইবে না।

(২৪)

৮ই জুন, রবিবার সমু ও অমু জীবনের সহিত বেলা ৩—২৫ মিনিটের ট্রেনে শিয়ালদহ দিয়া বালী চলিয়া যাইল। এবার দুইভাই বড়ই আনন্দে দিন কাটাইয়াছিল। উভয়েরই শরীর ফোড়া ও পাঁচড়ায় অসুস্থ ছিল তথাপি খেলা করিয়া, গান গাহিয়া, এবং নানাবিধ মিষ্টান্ন ভোজন করিয়া আনন্দে তাহারা কুড়ি দিন আমাদের এখানে কাটাইয়াছিল। মা ও বাবাকে ছাড়িয়া তাহারা আমার কাছে থাকিতে পারিবে কিনা সন্দেহ ছিল কিন্তু একদিনের জন্যও তাহারা মনকেমন করিতেছে বলিয়া অভিযোগ করে নাই। সর্ব্বদা ইহারা কথা শুনিত, কোনরূপ অবাধ্যতা একদিনের জন্যও লক্ষ্য করি নাই। সমুর চোখের কাছে একটি প্রকাণ্ড ফোড়া অস্ত্র করিবার প্রয়োজন হইল এবং আমি তাহাকে বড় ডাক্তারবাবু অর্থাৎ Captain Narendra Choudhury মহাশয়ের নিকট লইয়া যাইলাম। ডাক্তারবাবু অস্ত্রচালনা করিয়া বলপূর্ব্বক যখন ফোড়াটি টিপিয়া ভিতরে ছুরি চালাইয়া পুঁযরক্ত বাহির করিয়া আনিলেন তখন সমু চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। রক্তপুঁয সমস্ত দেহে গড়াইয়া

পড়িল এবং ডাক্তারবাবুর নির্দ্দেশমত তাঁহার ঝি সমুর গায়ে ২।৩ বালতি জল ঢালিয়া দিল। সিক্তদেহে কাঁপিতে কাঁপিতে এবং কাঁদিতে কাঁদিতে সমু আমার সহিত বাড়ী ফিরিল। যন্ত্রণার তুলনায় তাহার ধৈর্য্য দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। ইহার পর আমি নরুণ দিয়া মধ্যে মধ্যে কয়েকবার তাহার কয়েকটি ফোড়া কাটিয়া দিয়াছিলাম। স্বহস্তে ফোড়া কাটা দূরের কথা, ফোড়াকাটা দাঁড়াইয়া দেখিতেও আমার ভয় হয়। কিন্তু সমু আমাকে কলম পরিত্যাগ করাইয়া অস্ত্রও ধারণ করাইয়াছিল। আমি ফোড়া কাটিলে সমু ভীত হইত কিন্তু রোদন করিত না। প্রতিবার তাহাকে বলিতাম "আর কাটিতে হইবে না, এই ফোড়াটা কাটিলেই সব ভাল হইয়া যাইবে।" কিন্তু পুনর্ব্বার অস্ত্রধারণ করার প্রয়োজন হইত, তখন আমার পূর্ব্ববাক্য স্মরণ করাইয়া অভিযোগের কণ্ঠে সমু বলিত, "সেদিন বল্লে আর কাট্‌তে হবে না, আবার আজ কাট্‌ছ কেন?" এই সত্যকথার বিরুদ্ধে আমার কোনই উত্তর ছিল না সুতরাং নির্ব্বাক হইয়া অস্ত্র চালনা করিতাম। প্রত্যেক ফোড়া কাটিবার সময় চুক্তি অনুযায়ী সমুকে একটি টাকা আমি দিতাম এবং ফোড়াকাটার ক্ষণিক যন্ত্রণা একটি চক্‌চকে টাকা অনেক পরিমাণে লাঘব করিয়া দিত। অমুরও একটি ফোড়া আমাকে নরুণের দ্বারা কাটিতে হইয়াছিল। কিন্তু শারীরিক এইরূপ যন্ত্রণা অনুক্ষণ ভোগ করিলেও উভয় ভ্রাতার আনন্দের সীমা ছিল না। খেলা করিতে করিতে হঠাৎ বাহিরের ঘরে প্রবেশ করিয়া সমু আমাকে প্রশ্ন করিত, "দাদু, 'রুটি' বানান করত।" পাছে মূর্খ বলিয়া দৌহিত্রের কাছে অপযশ হয় এই ভয়ে আমি সহস্র কাজ ফেলিয়া তৎক্ষণাৎ "রুটি" বানান করিতাম, তখন হৃষ্টচিত্তে সমু প্রত্যাবর্ত্তন করিত। এইরূপ বানানের পরীক্ষা আমাকে প্রায়ই দিতে হইত। অমু কিন্তু তাহার দাদামহাশয়কে বিনা পরীক্ষায় পণ্ডিত বলিয়া স্বীকার

করিয়া লইয়াছিল। তাহার গান ও নৃত্য সময়-অসময়ের অপেক্ষা রাখিত না। কোন কোন দিন সন্ধ্যাবেলা বাহিরের ঘরে কাজ করিতে বসিয়াছি এমন সময় অমু আসিয়া পাশের চেয়ারে উপবিষ্ট হইয়া উচ্চকণ্ঠে গান ধরিত। তাহার একটি গান আমার মনে আছে। "বৌকে গরম চা দিতে ভুলনা, ভুলনা, ভুলনা, বৌয়ের মেজাজ জাননা, জাননা, জাননা।" উচ্চকণ্ঠে অমু গান গাহিতেছে, আমি কলম রাখিয়া স্থির হইয়া বসিয়া আছি, রাস্তার বারান্দায় অপূর্ব্বগীতরসপিপাসু কয়েকটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে দাঁড়াইয়া গান শুনিতেছে, অমুর কোন দিকে দৃষ্টি নাই, গানের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে—"বৌকে গরম চা দিতে ভুলনা, ভুলনা, ভুলনা।" আরতির নিকট উভয় ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসবের কবিতার কয়েকটি লাইন শিখিয়াছিল, সেগুলি প্রায়ই উভয়ে একসঙ্গে আবৃত্তি করিত।

(আজ) স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে নাচে দেবগণ
হরি হরি হরিধ্বনি ভরিলা ভুবন॥
শিব নাচে, ব্রহ্মা নাচে আর নাচে ইন্দ্র
গোকুলে গোয়ালা নাচে পাইয়া গোবিন্দ॥
নন্দের মন্দিরে গোয়ালা আইল ধাইয়া
হাতে নড়ি কাঁধে ভার নাচে থৈয়া থৈয়া॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোল অঙ্গণে ঢালিয়া
নাচেরে নাচেরে নন্দ গোবিন্দ পাইয়া॥
আনন্দ হইল বড় আনন্দ হইল
এ দাস শিবাইয়ের মন ভুলিয়া রহিল॥

"নাচে থৈয়া থৈয়া" কথাগুলি বলিবার সঙ্গে সঙ্গে অমু দুই হাত তুলিয়া মহা উৎসাহ সহকারে নাচিতে আরম্ভ করিত, ক্লান্তি নাই,

অবসাদ নাই, অমু নৃত্য করিতেছে,—আমি এই নৃত্য বড়ই উপভোগ করিতাম।

বালী যাইবার পূর্ব্বদিন অর্থাৎ ৭ই জুন, শনিবার, রাত্রি ৯-১৫ মিনিটের সময় আমরা সকলে আহারাদি সমাপন করিয়াছি, বাহিরের ঘরে আমি চেয়ারে বসিয়া আছি, সমু কাছে দাঁড়াইয়া আছে, দ্বিতলের বড় ঘরে আরতি বিছানা পাতিতে গিয়াছে, অমুও তাহার সঙ্গে গিয়াছে। হঠাৎ অমু চীৎকার করিয়া উঠিল এবং আরতি আমাকে ডাকিয়া বলিল অমুকে কাঁকড়াবিছা কামড়াইয়াছে। আরতি কাঁকড়া-বিছাটি মারিয়া আনিল,—প্রকাণ্ড বিছা। এদিকে অমু যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে কাতরকণ্ঠে রোদন করিতেছে। আমি আকস্মিক এই দুর্ঘটনায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলাম। পাড়ায় একজন ঔষধ দেন, তাঁহার ঔষধ দেওয়া হইল কিন্তু সে দারুণ যন্ত্রণার কোন উপশম হইল না। রাত্রিতে আমি ও আরতি তাহাকে বারংবার ক্রোড়ে লইতে লাগিলাম, পাখার বাতাস করিতে লাগিলাম, একটু ঘুম আসে আবার যন্ত্রণায় কাঁদিয়া অমুর নিদ্রাভঙ্গ হয়। আমি ভাবিলাম হয়ত বালকের বাপ-মার জন্য মনকেমন করিতেছে কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয় সে তাহার বাপ-মার কথা একবারও উল্লেখ করিল না। আমি একবার উঠিয়া বাহিরে গিয়াছিলাম, তৎক্ষণাৎ আমাকে সন্ধান করিল এবং আমি কাছে বসিলে সন্তুষ্ট হইল। এইরূপে প্রায় সমস্ত রাত্রি জাগরণ ও উৎকণ্ঠায় অতিবাহিত করার পর রাত্রি সাড়ে তিনটার পর অমু ঘুমাইয়া পড়িল। কাঁকড়াবিছা কামড়ানর ভীষণ যন্ত্রণা, কিন্তু এই বালক অসীম ধৈর্য্য সহকারে তাহা সহ্য করিল দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। পরদিন প্রভাতে পা বেশ ফুলিয়া উঠিল, অমু সহজে হাঁটিতে পারিল না, খোঁড়াইয়া একটু একটু যাতায়াত করিতে লাগিল। বিছা

কামড়ানর পর অমুকে ভুলাইবার জন্য ৪টি টাকা দিয়াছিলাম। সেই টাকা লইয়া সকালে উঠানে বসিয়া সে সমু ও নিমাইয়ের সহিত গল্প ও খেলা করিল। যে সময় আসিবার কথা ছিল সে সময় জীবন উপস্থিত হইল না, তাহার অভ্যাসমত সময় অতিক্রম করিয়া আসিল। সমু ও অমু একটি থালা, ৫টি সার্ট, ৪টি প্যাণ্ট, ২খানি গামছা, পাউডার, সাবান, জাম্বক, সিদ্ধমলম, হরলিক, বার্লি, জ্যাম, এক কৌটা বিস্কুট, ল্যাবেঞ্চুস, সন্দেশ, আম, চিরুণী ও ২৯৲ টাকা নগদ এক সুবৃহৎ পুঁটলিতে পরিপূর্ণ করিয়া আনন্দচিত্তে তাহাদের বাবার সহিত বালী চলিয়া যাইল। দুইটি বালকের অভাব আমি বহুদিন অনুভব করিলাম।

(২৫)

সাঁইথিয়া হইতে কৃষ্ণপ্রসন্নের একখানি পোষ্টকার্ড পাইলাম, চিঠিখানি ৭ই জুন লেখা। অন্যান্য সংবাদের পর কৃষ্ণ লিখিয়াছে—"এবার বৃষ্টি না হওয়ায় এত বড় বড় রুই কাতলা এবং কই মাগুর মাছের আমদানী যে বলা যায় না, দর অবশ্য ১৷৹ টাকা সের। এ রকম বড় বড় কই মাগুর কয়বৎসর দেখা যায় নাই। মাছ দেখি আর আপনাকে মনে পড়ে। কলকাতা পাঠাবার ইচ্ছা কিন্তু নিয়ে যাবার লোক নাই। যদি প্রমথবাবু ইতিমধ্যে এসে পড়েন পাঠাবো।" আমি কৃষ্ণপ্রসন্নের চিঠি পড়িয়া হাসিলাম—সুদূর সাঁইথিয়ায় ভাল মাছ দেখিয়া আমাকে তাহার মনে পড়িতেছে। বহুবৎসর পূর্ব্বে কৃষ্ণপ্রসন্ন আমার ছাত্র ছিল। তাহার এই অক্ষুণ্ণ ভালবাসার কথা স্মরণ করিয়া বিস্মিত আনন্দে আমার মন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

(২৬)

১০ই জুন, মঙ্গলবার, সকালবেলা সার্পেণ্টাইন লেনে তাবাপদকে পড়াইয়া প্রায় ৯৷৹টার সময় বাড়ী ফিরিতেছিলাম। Fordyce Lane হইতে একটি অপ্রশস্ত গলি বাহির হইয়াছে, তাহার ভিতর কয়েকখানি ছোট ছোট ভাড়াটিয়া বাড়ী। রাস্তার পারে দুইটি ভাই খেলা করিতেছিল—বড়টির ৪।৫ বৎসব বয়স, ছোটটি ২।২৷৹ বৎসরের হইবে। হঠাৎ বিপরীত দিকের মোড় হইতে একখানি প্রকাণ্ড লরী গলির ভিতর দিয়া আসিতে লাগিল। বালক দুইটি একটি বাড়ীর দেয়াল ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল এবং পাছে লরী কর্ত্তৃক নিষ্পেষিত হইয়া যায় এই ভয়ে রোদন করিতে লাগিল। লরীচালক পূর্ব্বেই বালক দুইটিকে লক্ষ্য করিয়াছিল, সুতরাং সাবধানে ধীরে ধীরে লরী অগ্রসর হইতে লাগিল। কিন্তু বালকদেব ভয়ের সীমা নাই—ছোট ভাইটি দেওয়াল আঁকড়াইয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে, বড় ভাই তাহাকে কোলে করিয়া পলাইবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু ভার উত্তোলন করিতে পারিতেছে না, "মা কোলে নাও," "মা কোলে নাও" বলিয়া ছোট ভাইকে কোলে লইবার জন্য মাতাকে ডাকিতেছে এবং উভয় হস্তে যথাসাধ্য ছোট ভাইটিকে আকর্ষণ করিয়া সঙ্কীর্ণ গলির ভিতর নিজ বাড়ীতে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে। আমি দাঁড়াইয়া সমস্ত দেখিতেছিলাম, ছেলে দুইটিকে আচ্ছাদন করিয়া দাঁড়াইয়া সাহস দিলাম, "ভয় নাই," "ভয় নাই" বলিলাম, রোদনধ্বনি থামাইয়া প্রিয়দর্শন বালকদ্বয় কৃতজ্ঞ ও প্রসন্ন দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিল, লরীটি ধীরে ধীরে চলিয়া যাইল। "মা কোলে নাও" ধ্বনিটি ভাবিতে ভাবিতে আমি অগ্রসর হইলাম, আমাব বহু জীবনের পুঞ্জীভূত অব্যক্ত রোদনধ্বনি যেন

বালকের কথায় আজ ভাষাপ্রাপ্ত হইয়া বিশ্বজননীর চরণে নিবেদিত হইতে লাগিল—তখন বুকের ভিতর "মা কোলে নাও" "মা কোলে নাও" অবিরত গুমরিয়া উঠিতেছে।

(২৭)

১২ই জুন। আজ বন্ধু আশুতোষ দাস তাহার দেশের বাড়ী বীরভূম জেলায় আমড়া গ্রামে দেহত্যাগ করিল। আশু বহুবৎ Police Inspector-এর কাজ করিয়া অসুস্থতার জন্য কিছুদিন পূর্ব্বে অবসর গ্রহণ করিয়াছিল। Foot Print Inspector-রূপে আশু সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল, পুলীশ মেডাল পাইয়াছিল। এই কার্য্যোপলক্ষ্যে তাহাকে বাংলাদেশের বহুস্থানে যাতায়াত করিতে হইত। আশুর কথা পূর্ব্বে অনেকবার উল্লেখ করিয়াছি। আশুরা তিন ভাই—জ্যেষ্ঠ মাখনবাবু পুলীশ ইন্‌স্পেক্টর ছিলেন, মধ্যম ভোলানাথ উকিল হইয়াছিল, আশু সর্ব্বকনিষ্ঠ। আজ একে একে ইহাদের সব ভাইগুলিই ইহলোক পরিত্যাগ করিল। আশু আমাকে "দাদা" বলিত,—কতই প্রীতির সম্বন্ধ আমাদের উভয়ের মধ্যে ছিল। কতদিন বসিয়া আমরা ধর্ম্মালোচনায় সময় অতিবাহিত করিয়াছি তাহার নির্ণয় নাই। আমরা উভয়ে পানিহাটী, দক্ষিণেশ্বর, খড়দহ প্রভৃতি স্থানে দেবদর্শন করিতে গিয়াছিলাম, কত ভক্তির সহিত আশু দেবমন্দিরে প্রণাম করিত তাহা আমি সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিয়াছি। একদিন কথায় কথায় আমি বলিলাম শ্রীভাগবতে শ্রীকৃষ্ণকে "স্বপ্রকাশ" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে,—শ্রীকৃষ্ণ স্বপ্রকাশ, নিজে কৃপা করিয়া মানব হৃদয়ে প্রকাশিত না হইলে জ্ঞান ও ভক্তির দ্বারা তাঁহার দর্শনলাভ করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। আশু "স্বপ্রকাশ" কথাটি শুনিয়া কিরূপ আনন্দিত হইল তাহা আমি চক্ষের

সম্মুখে দেখিতে পাইতেছি, বারংবার "স্বপ্রকাশ" কথাটি উচ্চারণ করিল, মধ্যে মধ্যে কথাটি উল্লেখ করিয়া তাহার গভীর আনন্দ প্রকাশ করিল। আশুর একটিমাত্র কন্যা বিবাহের পর মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল, আর কোন সন্তান আশুর ছিল না। তাহার স্ত্রী অনেক পূর্ব্বেই মারা গিয়াছিলেন, আশু আর বিবাহ করে নাই। আশু চলিয়া গেল, আমাকে যেন বড়ই একা একা মনে হইতেছে। এই সমস্ত সবল বিশ্বাসী লোকের চিরন্তন স্থান যে বিশ্বজননীর চরণে সে বিষয় আমার অনুমাত্রও সন্দেহ নাই।

(২৮)

১৫ই জুন বাড়ীতে বসিয়া 'Illustrated [illegible]ndon News' পড়িতেছিলাম, পত্রিকাখানি ৫ই এপ্রেল ১৯[illegible] সালের, London হইতে কলেজে পূর্ব্বদিন মাত্র আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। এক জাতীয় পাখীর কথা পড়িলাম—নাম "Passenger Pigeon"। ছবি দিয়াছে, পাখীটি দেখিতে বড়ই সুন্দর। উত্তর আমেরিকাতে এক সময় এই পাখী লক্ষ লক্ষ দেখা যাইত কিন্তু মাংসলোভী মানুষ এই পক্ষীজাতিটিকে ভক্ষণ করিয়া নিঃশেষ করিয়া দিয়াছে। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে একদল এই পক্ষী আকাশ দিয়া উড়িয়া যাইবার সময় ১৪ ঘণ্টা সূর্য্য আচ্ছাদিত হইয়াছিল—কি অসংখ্য পক্ষীই সেই দলে ছিল তাহা নির্ণয় করা কঠিন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের পর এই পাখী আর আমেরিকায় দেখা যায় নাই। লেখক Maurice Burton, D. Sc. লিখিয়াছেন—

"There once was a pigeon in North America. It is no longer there. It was a long-winged bird, slender of tail, coloured bluish and fawn, with a slate-coloured head and purplish-brown breast. The most

remarkable thing about it was, however, the tremendous numbers in which it existed......Ross King, in 1866, saw a flock which obscured the sun for 14 hours and was 300 miles long and 1 mile wide......The pigeon's one crime against humanity was that it was edible, and as the town grew in the United States of America, there opened up a ready market for its carcase. ......By September 1, 1914, these vast hordes were gone, and the species extinct, and one more name was added to the long list of animals exterminated by man......"

এই পৃথিবীতে মনুষ্যজাতি ভগবানের চক্ষে কত অপরাধে অপরাধী তাহার নির্ণয় নাই।

(২৯)

১৯শে জুন, বৃহস্পতিবার। আজ মার বার্ষিক শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইল। পুরোহিত মহাশয়ের সমস্ত কার্য্য সমাপন করিতে বেলা প্রায় ২॥০টা বাজিল। এ জীবনে মার কোন সেবাই আমি করিতে পারি নাই —শ্রাদ্ধকার্য্যের সময় সেই কথাই আমার বারংবার মনে পড়িতেছিল। রাত্রিতে বাগিরের ঘরে বসিয়া অন্য কোন কার্য্য করিতে ইচ্ছা হইল না, আরতি গীতা ও অন্যান্য স্তব পড়িল, আমি শ্রবণ করিলাম। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে আরতি নিম্নলিখিত লাইনগুলি পড়িল এবং আমি ব্যাখ্যা করিয়া তাগকে অর্থ বুঝাইয়া দিলাম। শ্রীরামানন্দ রায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বলিতেছেন—

এক সংশয় মোর আছয়ে হৃদয়ে
কৃপা করি কহ মোরে তাহার নিশ্চয়ে॥

পহিলে দেখিনু তোমা সন্ন্যাসীস্বরূপ
এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যামগোপরূপ ॥
তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চন-পঞ্চালিকা
তার গৌরকান্ত্যে তোমার শ্যাম অঙ্গ ঢাকা ॥
তাহাতে দেখিয়ে মাত্র সবংশীবদন
নানাভাবে চঞ্চল সদা কমল নয়ন ॥
এই মত তোমা দেখি হয় চমৎকার
অকপটে কহ প্রভু কারণ ইহার ॥
প্রভু কহে কৃষ্ণে তোমার গাঢ় প্রেম হয়
প্রেমের স্বভাব এই জানিহ নিশ্চয় ॥
মহাভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম
তাঁহা তাঁহা হয় তাঁর কৃষ্ণের স্ফুরণ ॥
স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তাঁর মূর্ত্তি
সর্ব্বত্র হয় নিজ ইষ্টদেব-স্ফূর্ত্তি ॥
শ্রীরাধাকৃষ্ণে তোমার গাঢ় প্রেমা হয়
যাঁহা তাঁহা রাধাকৃষ্ণ তোমারে স্ফুরয় ।
রায় কহে প্রভু তুমি ছাড় ভারিভূরি
মোর আগে নিজরূপ না করিহ চুরি ॥
শ্রীরাধার ভাবকান্তি করি অঙ্গীকার
নিজরস আস্বাদিতে হৈলে অবতার ॥
নিজগূঢ় কার্য্য তোমার প্রেম আস্বাদন
আনুসঙ্গে প্রেমময় কৈলে ত্রিভুবন ॥
আপনে আইলা মোরে করিতে উদ্ধার
এবে যে কপট কর কোন ব্যবহার ॥

তবে প্রভু হাসি তাঁরে দেখাল স্বরূপ
রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ ॥

....

এই সমস্ত পড়িতে ও শুনিতে অনেক রাত্রি হইয়া গেল।

(৩০)

২০শে জুন, শুক্রবার, বাংলাদেশের ইতিহাসে এক চিরস্মরণীয় দিন। বড়লাটের ৩রা জুনের বক্তৃতা অনুযায়ী বঙ্গবিভাগের জন্য ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদের ভোট লওয়া হইল। কতরকম গুজব যে এই হতভাগ্য দেশে এই ঘটনা লইয়া প্রচারিত হইতেছিল তাহার নির্ণয় নাই। বিশেষ করিয়া একটি গুজব সংবাদপত্রসমূহে এবং লোকের মুখে মুখে শোনা যাইতে লাগিল। হিন্দু সভ্যগণের ভোট অখণ্ডবঙ্গদেশের পক্ষে অর্থাৎ মুসলমান গভর্ণমেণ্টের পক্ষে ক্রয় করিবার জন্য Muslim League এক কোটী টাকা খরচ করিতে প্রস্তুত। অর্থাৎ হিন্দুদিগের নিজের কোন দেশপ্রেম অথবা দায়িত্বজ্ঞান নাই তাহারা কয়েকখণ্ড টাকা পাইলেই হিন্দুজাতির স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতে পারে। এই সমস্ত গুজব সহজেই লোকে বিশ্বাস করিল। একদিন ছোট ডাক্তারবাবুর সহিত এই লইয়া কথাবার্ত্তা হইল। তিনিও এই কথা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত। আমি অনেক তর্কযুক্তির দ্বারাও এই অসম্ভব গুজব সম্বন্ধে তাঁহার বিশ্বাস দূর করিতে পারিলাম না। অবশেষে ২০শে জুন বেলা ৪—৪০ মিনিটের সময় শুনিলাম যে ৫৮—২১ ভোটে অর্থাৎ ২১ জন মুসলমান সভ্যের বিরুদ্ধে সমগ্র হিন্দু সভ্যগণের ভোটের দ্বারা ব্যবস্থাপক সভা বঙ্গদেশকে পূর্ব্ব ও পশ্চিম বাংলায় বিভক্ত করা অনুমোদন করিয়াছে। হিন্দুগণ Muslim League

গভর্ণমেণ্টের অত্যাচার হইতে মুক্ত হইয়া নিশ্চিন্ত হইল। রাস্তাঘাটে সর্ব্বত্র এক কথা, সকলেরই মনে আনন্দ। পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমান শাসিত হিন্দুদিগের জন্য সকলেই দুঃখিত ও চিন্তিত দেখিলাম তথাপি বাঙ্গালী হিন্দুর একটা স্বতন্ত্র গভর্ণমেণ্ট স্থাপিত হইবে বলিয়া সকলেই সুখী ও নিশ্চিন্ত। অদৃষ্টের কি পরিহাস, যে হিন্দুরা Lord Curzon-এর বঙ্গবিভাগ বন্ধ করিবার জন্য কত নির্য্যাতন ও অত্যাচার সহ্য করিয়াছে সেই বাঙ্গালী হিন্দুরাই আজ বঙ্গ বিভক্ত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর! Muslim League গভর্ণমেণ্টের অত্যাচার মানুষের সহনশীলতার সমস্ত সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছিল বলিয়াই আজ বাঙ্গালী হিন্দুর মনের এইরূপ আমূল পরিবর্ত্তন।

(৩১)

২২শে জুন, রবিবার, বাড়ীতে বসিয়া "Illustrated London News" পড়িতেছিলাম, পত্রিকাখানি ১২ই এপ্রিল ১৯৪৭ সালের। ইটালীর ভূতপূর্ব্ব জগৎবিখ্যাত নেতা মুসোলিনীর মৃত্যুর বর্ণনা আছে। Walter Audisio নামে জনৈক ইটালীয়ান সমাজতন্ত্রবাদীর একখানি ছবি দেওয়া হইয়াছে, সে জনসমক্ষে বক্তৃতা করিতেছে। লেখক লিখিয়াছেন—

[On March 30, Walter Audisio, also known as Colonel Valerio, told a communist gathering at the Basilica of Maxentius, in Rome, how he had killed Mussolini. Acting, he said, on orders from the G. H. Q. of the Volunteer Liberty Corps, he took Mussolini to a garden at Dongo, near Lake Como, and there shot him. "I did not have the impression I was

shooting a man" he said, "but an inferior beast. Mussolini did nothing but tremble."]

জগতের ইতিহাসে কতবড় একজন লোকের মৃত্যুর পরও তাঁহার নিন্দার শেষ হয় নাই। মুসোলিনীর অন্য অপরাধ যাহাই থাকুক না কেন তিনি বীর ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অথচ একজন অজ্ঞাত অখ্যাত সাধারণ লোক তাঁহাকে লোকচক্ষুতে হেয় প্রতিপন্ন করিয়া ইটালীর নরনারীর নিকট করতালি অর্জ্জন করিতেছে। ইতিহাসে সত্যের অপলাপ এইভাবেই সংঘটিত হইয়া থাকে।

(৩২)

২৬শে জুন, বৃহস্পতিবার। আজ কলিকাতার স্থানে স্থানে এবং আমাদের এই অঞ্চলে সমস্তদিন ব্যাপী সান্ধ্য আইন অর্থাৎ সমস্ত দিনরাত্রি কেহ বাড়ীর বাহিরে যাইতে পারিবে না। বাজার হাট বন্ধ, এমন কি ঔষধপত্রের জন্যও বাড়ীর বাহিরে যাওয়া নিষেধ। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা চলিতেছে, পূর্ব্বদিন যেসব অঞ্চলে বেশী খুন জখম হইয়াছে সেই সেই স্থানে আজ এইরূপ ব্যবস্থা। ১লা জুন তারিখেও এইরূপ হইয়াছিল। সারাদিন বাড়ীতে আবদ্ধ হইয়া আছি। আজ বি. এ. সংস্কৃত পরীক্ষা, পরীক্ষার্থীরা বিশেষ অনুমতি পত্র লইয়া পরীক্ষা দিতে যাইতেছে। সন্ধ্যার পর সান্ধ্য আইন প্রত্যহই আছে, কোন কোন দিন এইরূপ সমস্ত দিনই মানুষকে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে হয়। মানুষ নরহত্যা করিতে পশুর মত উন্মত্ত সুতরাং পশুর মতই তাহাকে দিবারাত্র শৃঙ্খলিত রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

২রা জুলাই, বুধবার গ্রীষ্মাবকাশের পর কলেজ খুলিল। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা মন্দীভূত হইলেও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আক্রমণে মানুষ

নিত্যই হতাহত হইতেছে। আমি আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট দিয়া সাবধানে কলেজে যাতায়াত করিতেছি। রিপণ কলেজের নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ "সুরেন্দ্রনাথ কলেজ" নূতন নামকরণ করিলেন।

(৩৩)

৬ই জুলাই, রবিবার রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের নিকট শ্রীভাগবতের একটি খণ্ড আনিতে যাইলাম। তাঁহার নিকট এক এক খণ্ড করিয়া শ্রীমদ্‌ভাগবত আনিতেছি এবং পড়া শেষ হইলে তাহা ফিরাইয়া দিয়া পরবর্ত্তী খণ্ডটি লইয়া আসি। নগেন্দ্রবাবু পরম বৈষ্ণব, তাঁহার কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। কথা প্রসঙ্গে বোসপুরের বংশীধরের জেঠামহাশয়ের কথা উল্লেখ করিলাম—তিনি প্রতিদিন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক হরিনাম জপ করিতেন। জীবনে মাত্র তিনদিন তিনি অবস্থা-বৈগুণ্যে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা জপ করিতে পারেন নাই। সেই তিনদিনের মধ্যে একদিন তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু হওয়ায় তিনি শোকে অভিভূত হইয়াছিলেন। নগেন্দ্রবাবু আমার বিশেষ বন্ধুলোক, তিনি আমার কথা শুনিয়া ঈষৎ হাসিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন "আমার বড় ছেলেটি মুন্‌সেফ্ ছিল, তার বিবাহ দিয়েছিলাম। সে যেদিন মারা যায় সেদিনও আমি হরিনামের সংখ্যা পূরণ করেছিলাম।" নগেন্দ্রবাবু প্রত্যহ একলক্ষ হরিনাম জপ করিয়া থাকেন। আমি তাঁহার মনের এই অপূর্ব্ব দৃঢ়তা, তাঁহার অনন্যসাধারণ আধ্যাত্মিক উন্নতির অবস্থা চিন্তা করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। কী বলিষ্ঠ মন, দারুণ পুত্র-শোকও যাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না!

(৩৪)

২০শে জুলাই, রবিবার সকাল হইতেই বৃষ্টি আরম্ভ হইল, ক্রমশঃ বৃষ্টির বেগ বৃদ্ধি পাইয়া রাস্তাঘাট সমস্ত জলে ডুবিয়া যাইল। আমার

বাহিরের ঘরে সাধারণতঃ জল প্রবেশ করে না কিন্তু আজ বেলা ১০টার পূর্ব্বেই রাস্তায় একবুক জল দাঁড়াইল এবং আমাদের উঠান, রান্না ঘর ও বাহিরের ঘরে জল জমিয়া গেল। উনুন ডুবিয়া যাইল, কোন রকমে তাড়াতাড়ি রান্নার কার্য্য সারিয়া আরতি সমস্ত খাদ্যদ্রব্য দ্বিতলে লইয়া গেল। কলিকাতার অনেক পরিবার, বিশেষতঃ আমাদের পল্লীতে একতলাবাসী গৃহস্থেরা, সেদিন ভাত রান্না করিতে পারেন নাই। সমস্ত দিবারাত্র জল ছিল, পরদিন প্রভাতে জল সরিয়া যাইল।

(৩৫)

২৫শে জুলাই, শুক্রবার। আজ কয়েকমাস হইতে ছোট ডাক্তারবাবু অর্থাৎ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় ও তাঁহার স্ত্রী অসুস্থ। ডাক্তারবাবু উদরী হইয়া শয্যাশায়ী। পূর্ব্বে তিনিই অসুস্থ হন এবং তাঁহার স্ত্রী সংসারের সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া দিবারাত্র ডাক্তারবাবুর সেবাশুশ্রূষা করিতে থাকেন। কিন্তু ডাক্তার বাবুর অসুস্থতার ২।৩ মাস পরেই তাঁহার স্ত্রী মুখের ভিতরে দুরন্ত ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হইয়া অসুস্থ হইয়া পড়েন। তখনও স্বামীর সেবাশুশ্রূষার ত্রুটি ছিল না। যখনই দেখি বা শুনি তখনই এই মহীয়সী মহিলা স্বামীর পার্শ্বে বসিয়া আছেন,—রাত্রিতেও স্বামীর পার্শ্বে শয়ন করিয়া সুদীর্ঘ বিনিদ্র যামিনী সেবাশুশ্রূষার মধ্য দিয়া কাটাইতেছেন। ক্যান্সারের Deep X-ray চিকিৎসা হইতে লাগিল, জলের মত অর্থ ব্যয় হইল কিন্তু রোগের কোন উপশম হওয়া দূরের কথা অতি দ্রুত-গতিতে রোগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবিবেচক চিকিৎসকের অর্থলোভের ফলে অতিরিক্ত X-rayর অপপ্রয়োগে রোগ কঠিন আকার ধারণ করিল। উপর্য্যুপরি ১৭দিন X-ray দেওয়ার পর রোগিণীর উজ্জ্বল ও সুপুষ্ট

ঘন মুখমণ্ডল শীর্ণ ও মসীবর্ণ হইয়া গেল, রোগের যন্ত্রণায় এই অসীম ধৈর্য্যশালিনী মহিলা বালিকার মত নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ বামগালের ভিতরের ক্ষত প্রসারিত হইয়া গালের মাংস গলিত হইয়া ছিদ্র হইয়া গেল এবং স্থানে স্থানে দাঁত অথবা মুখগহ্বর দেখা যাইতে লাগিল। রোগিণীর নিদ্রা ছিল না, অতি তরল পানীয় বস্তুও গলাধঃকরণ করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইল।

এইরূপ অবস্থায় ২৫শে জুলাই, রাত্রি প্রায় ৯৷৷০টার সময় আহারাদির পর আমি দ্বিতলের ভিতরের দিককার বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছি এমন সময় পাশের দিকের ডাক্তারবাবুর বাড়ীর একটি প্রকোষ্ঠ হইতে তাঁহার ছেলেমেয়েদের উত্তেজিত কথাবার্ত্তা আমার শ্রুতিগোচর হইল। কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া কথাবার্ত্তাগুলি মনোযোগ দিয়া শুনিবার পর আমি বুঝিতে পারিলাম যে কন্যা রমা তাহার মাতার গালে যে ব্যাণ্ডেজ যত্নসহকারে বাঁধিয়া দিতেছে তাহা পরমুহূর্ত্তেই রোগিণী বলপূর্ব্বক খুলিয়া ফেলিতেছেন সুতরাং ক্ষতের পুঁজরক্ত ব্যাণ্ডেজে আবদ্ধ না থাকিয়া বালিশে এবং মুখমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে। পুত্রকন্যাগণ সকলে মাতাকে বেষ্টন করিয়া বসিয়া আছে, ব্যাণ্ডেজ না খুলিয়া ফেলিবার জন্য অনুরোধ করিতেছে, তর্কযুক্তি দেখাইতেছে কিন্তু রোগিণী সম্পূর্ণ নির্ব্বাক অথবা অস্ফুটস্বরে যাহা বলিতেছেন তাহা আমার শ্রুতিগোচর হইতেছে না। আমি বুঝিতে পারিলাম ব্যাণ্ডেজে অবরুদ্ধ ক্ষতের পুঁজরক্ত ভিতরে যন্ত্রণা ও অস্বচ্ছন্দতার সৃষ্টি করিতেছে, জ্বালা ও যন্ত্রণা ধৈর্য্যের সকল সীমাকে অতিক্রম করিয়া যাইতেছে সুতরাং রোগিণী ব্যাণ্ডেজ রাখিতে পারিতেছেন না। অথচ ব্যাণ্ডেজ না রাখিলে প্রবাহিত পুঁজরক্তে বিছানা বালিশ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমস্তই কলুষিত হইয়া উঠিবে, অপ্রীতিকর দুষ্টগন্ধে সমস্ত কক্ষটি পরিপূর্ণ হইবে। এইরূপ সমস্যার সময়ে নিজেরা নিরুপায়

হইয়া পুত্রকন্যাগণ পার্শ্বের কক্ষ হইতে অসুস্থ পিতাকে আহ্বান করা স্থির করিল। সাধারণতঃ ইহারা রুগ্ন পিতাকে এই কক্ষে ডাকিত না, কারণ একেই তিনি নিজে অত্যন্ত অসুস্থ তাহার উপর তিনি আসিলে কখনও বা রোগিণীর যন্ত্রণা দেখিয়া দুঃখে রোদন করিতেন কখনও বা রোগিণীর রোগজনিত দৃঢ়তা দেখিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিতেন। কিন্তু আজ রাত্রিতে অনন্যোপায় হইয়া কন্যা রমা "বাবা" "বাবা" বলিয়া পিতাকে রোগিণীর কক্ষে আহ্বান করিল। আমি নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া সমস্তই শুনিতে লাগিলাম।

ডাক্তারবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এরূপ পত্নীবৎসল স্বামী জীবনে কখনও আর দ্বিতীয়টি আমি দেখি নাই। সুদীর্ঘ দশ বৎসর আমি ইঁহাদের অতি নিকটে থাকিয়া পরস্পরকে বিশেষ মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করিয়াছি, কখনও স্বামীস্ত্রীর মধ্যে কলহ অথবা পরুষবাক্য আমি শ্রবণ করি নাই। কিন্তু আজ ডাক্তারবাবুর সমস্ত কথাই নিষ্ফল হইল। রোগী ও দুর্ব্বল স্বামী বিরক্ত হইয়া উত্তেজিত কণ্ঠে কন্যাকে আদেশ করিলেন "ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দাও, দেখি কেমন খোলে।" ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হইল, ছেলে মেয়েরা রুদ্ধকণ্ঠে অপেক্ষা করিয়া আছে, রোগিণী নির্ব্বাক ধৈর্য্যের সহিত নিস্পন্দ হইয়া শয্যায় শায়িতা। ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হইবামাত্র রোগিণী পুনরায় তাহা খুলিয়া ফেলিলেন। এইবার ডাক্তারবাবুর ধৈর্য্যচ্যুতি হইল, তিনি বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে স্ত্রীকে তিরস্কার করিলেন, পুত্রকন্যাগণকে রোগিণীর হাত ধরিয়া রাখিবার আদেশ দিলেন। রোগিণীর ক্ষীণ কণ্ঠ এইবার আমার শ্রুতিগোচর হইল, স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া অভিমানপূর্ণ কণ্ঠে তিনি বলিলেন "তোমাদের যদি অসুবিধা হয় তা হলে আমি বাইরে বারান্দায় গিয়ে শুচ্ছি।" ইহার অর্থ সকলেই বুঝিল, আমিও বুঝিলাম। এইকথাগুলির ভিতরে গভীর বেদনা ও

অভিমান প্রচ্ছন্ন ছিল। যে অসুস্থা মাতা ও স্ত্রী আজ রোগের অসীম যন্ত্রণায় এই বন্ধন বারংবার উন্মোচন করিতেছেন তাঁহার সেই নিদারুণ যন্ত্রণা উপলব্ধি করিবার কল্পনাশক্তি পুত্রকন্যা অথবা স্বামীর ছিল না—ইহাই রোগিণীর প্রথম অভিযোগ। দ্বিতীয় অভিযোগ এই যে, যে মাতা ও স্ত্রী নিজ স্নেহময় হস্তে অসুস্থ পুত্রকন্যা এবং স্বামীর মলমূত্র দিন, মাস ও বর্ষের পর বর্ষ চন্দনের মত প্রীতি সহকারে পরিষ্কার করিয়াছেন, কন্যা রমার টাইফয়েড জ্বরের সময় তাহার শ্বশুরবাড়ী লক্ষ্ণৌ-এ যাইয়া অক্লান্ত দেহ ও চিরপ্রসন্ন মন লইয়া দিবস ও যামিনী রোগক্লিষ্ট দেহের ক্লেদ ও গ্লানি নিজহস্তে অপনোদন করিয়াছেন, তাঁহার জীবনদীপের চিরনির্ব্বাণের সময় পুঁজরক্তের দুর্গন্ধ সহ্য করিবার ধৈর্য্য বা প্রীতি তাহারা দেখাইতে আজ বিমুখ হইতেছে কেন? তাঁহার তৃতীয় অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধে। স্নেহ ও প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার সুদীর্ঘ প্রায় পঞ্চাশ বৎসর অবিরল ধারায় গ্রহণ করিয়া আজ মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া যখন সেই প্রীতি ও স্নেহের সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন হইয়াছে তখনই স্বামী যেন মুখ ফিরাইতেছেন, তাঁহার কঠিন বাক্য শুনিয়া মন ভয় ও নিরাশায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। "আমি বাইরে বারান্দায় গিয়ে শুচ্ছি"—এই কয়টি সহজ ও সরল কথার অন্তরালে কী গভীর অভিমান প্রচ্ছন্ন ছিল, কী অভিযোগ স্বামীর স্নেহ ও প্রীতির নিকট নিবেদিত হইতেছিল তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম। আমি ইহাও বুঝিলাম কী অসীম প্রীতি ও বেদনার সংঘর্ষে আজ সহনশীল স্বামীর এই বিরক্তি প্রকাশ। অবশেষে ছেলে মেয়েরা বাবাকে নিজ কক্ষে পাঠাইবার জন্য ব্যস্ত হইল, তাহারা ভাবিল রোগের অপেক্ষা ঔষধ তীব্রতর হইয়া উঠিতেছে, তাহারা দেখিল স্নেহশীল মাতার মনে গভীর বেদনা, সেই বেদনার প্রতিঘাতে পিতার

মন মুহ্যমান। ছেলেমেয়েদের কেহ পিতাকে সঙ্গে করিয়া তাঁহাব নিজ কক্ষে দিয়া আসিল। স্নেহ, প্রীতি ও ভালবাসার এমন অপূর্ব্ব সংঘর্ষ আমি কখনও দেখি নাই,—ইহাই সংসারের সমস্ত দুঃখকষ্টকেও মধুর ও সহনীয় কবিয়া তোলে।

পবদিনের কথা। অপরাহ্ণকালে অভ্যাসমত ছোট ডাক্তারবাবুর শয্যাপ্রান্তে চেয়ারের উপর গিয়া বসিলাম। অন্যান্য কথার পর ডাক্তাববাবু পূর্ব্ব রাত্রের ঘটনাব কথা পাড়িলেন—আমি যে রাত্রিতে তাঁহাদের কথাবার্ত্তা কিছু কিছু শুনিয়াছিলাম তাহা প্রকাশ করিলাম না। পূর্ব্বোল্লিখিত ঘটনাবলী ও কথাবার্ত্তা স্থূলভাবে সমস্ত বলিয়া পরে সজল নয়নে ডাক্তাববাবু আমাকে বলিলেন "আজ আমার সঙ্গে দেখা হবার পর আমার স্ত্রী বল্লেন—'এতদিন তোমাদের বাড়ীতে আছি, কখনও উঁচুকথা তুমি আমাকে বলনি। আর কালকে রাত্রিতে তুমি ছেলে-মেয়েদের কাছে আমাকে বকেছ। তা তুমি বেশ করেছ। আমার যদি কিছু দোষ হয়ে থাকে ক্ষমা করো।' দেখুন প্রফেসর সাহেব, কথাগুলো শুনে পর্য্যন্ত আমাব মনটা খারাপ হয়ে আছে।" এই কথাগুলি বলিতে বলিতে ডাক্তারবাবুর চোখের কোণ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। আমি ডাক্তারবাবু ও তাঁহাব স্ত্রীর অপূর্ব্ব প্রীতির এই ঘাতপ্রতিঘাত শ্রবণ করিয়া মনে মনে হাসিলাম, ভাবিলাম প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীব্যাপী কি অপূর্ব্ব স্নেহ ও প্রীতির সম্বন্ধ আজ মহাকালের কঠোর স্পর্শে বিচ্ছিন্ন হইতে চলিয়াছে।

(৩৬)

৩০শে জুলাই, বুধবার, কলেজ হইতে ফিরিয়া বাহিরের ঘরে বসিয়া কাজ করিতেছি এমন সময় জনৈক পুরাতন পান বিক্রেতা আমাকে

বলিল যে কিছুক্ষণ পূর্ব্বে বাদুড় বাগান ষ্ট্রীট ও কেশব সেন ষ্ট্রীটের সংযোগস্থলে দুইটি ভাই স্কুল হইতে বাড়ী ফিরিবার পথে মুসলমান আততায়ীর হস্তে হত হইয়াছে। কিয়ৎক্ষণ পরে আমাদের প্রতিবাসী অক্ষয়বাবুর নিকট সমস্ত ঘটনাবলী শুনিলাম—অক্ষয়বাবু ঐ অঞ্চলে প্রায়ই যাতায়াত করেন, আজিও ঘটনার সময় ঐ অঞ্চলের নিকটস্থ একটি বাড়ীতে বসিয়াছিলেন। বালক দুইটি ভাই, একটি ১৪।১৫ বৎসর বয়স্ক, অপরটি ১২।১৩ বৎসর। উভয়েই ঝামাপুকুরের Brahmo Boys School-এ পড়িত, স্কুল হইতে প্রায় ৩টার সময় বাড়ী ফিরিতেছিল। হঠাৎ কেশব সেন ষ্ট্রীটের অপর পার্শ্বস্থ মুসলমান পল্লী হইতে দুইজন অস্ত্রধারী লোক আসিয়া ছেলে দুইটিকে গুরুতর আঘাত করিয়া পলাইয়া গিয়াছে। বড় ছেলেটি তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করে, দ্বিতীয়টি আহত অবস্থায় হাসপাতালে যাইবার পথেই মারা যায়। কি নির্ম্মম নরহত্যা এই কলিকাতার বক্ষের উপর দিয়া দিনের পর দিন সংঘটিত হইতেছে তাহার সমস্ত সংবাদ আমরা পাই না, ২।১টি ঘটনা যাহা শুনি তাহাতে মানুষ এবং হিংস্র পশুর মধ্যে কোন পার্থক্য আছে বলিয়া মনে হয় না।

(৩৭)

৫ই আগষ্ট সন্ধ্যার পর বাহিরের ঘরে বসিয়া কাজ করিতেছি বালক নিমাই আসিয়া উপস্থিত হইল। কিছুদিন হইতে সে একখানি প্রথম ভাগ সন্ধ্যাবেলা আমার নিকট অথবা আরতির কাছে কয়েক মিনিটের জন্য পড়িতে আসে। ছবিবহুল প্রথমভাগ খানি আমি তাহাকে কিনিয়া দিয়াছি। কিন্তু বালক পড়িতে চাহে না, কোনদিন আসিয়া ছুটি প্রার্থনা করে, কোনদিন বা একেবারেই অনুপস্থিত হয়। আজ আসিয়াও নিমাই পাঠ অভ্যাস করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিল। আমি

বিরক্ত হইয়া বলিলাম "যদি পড়বে না তবে এলে কেন?" তাহাতে নিমাই উত্তর দিল "আমি পড়তে আসিনি, তোমাকে দেখতে এসেছি।" কথাগুলি আমার বড়ই ভাল লাগিল—"তোমাকে দেখতে এসেছি।" ভগবৎসম্বন্ধে হইলে ইহাই "অহেতুকী প্রেম।" এই বিশ্বে অর্থোপার্জ্জন, জ্ঞান উপার্জ্জন অথবা বিষয় ভোগ করিতে আসি নাই—এ জীবনে এ সমস্ত কোন প্রয়োজনই নাই, জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য—"তোমাকে দেখতে এসেছি।"

৮ই আগষ্ট, ২২শে শ্রাবণ, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুদিন। রিপণ কলেজের সমস্তই অদ্ভুত, অন্যান্য কলেজগুলি মৃত্যুদিবস বলিয়া বন্ধ দিলেও আমাদের কলেজ বন্ধ হইল না। বেলা ১০॥০টার সময় কলেজে যাইলাম, পর পর দুই ঘণ্টা দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে আমার ক্লাস ছিল। ইংরাজি পড়াইতে ইচ্ছা করিল না, রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে কিছু কিছু বলিয়া পরে কবির কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি করিয়া ছেলেদিগকে শুনাইলাম এবং সংক্ষেপে অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া দিলাম। বার্দ্ধক্যবশতঃ জিহ্বা পূর্ব্বের ন্যায় দৃঢ় নাই তথাপি কবিতা আমি সুন্দর ও সুস্পষ্ট করিয়া আবৃত্তি করিতে পারি, ছাত্রেরা আমার কবিতার আবৃত্তি শুনিতে ভালবাসে। রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলি শুনিয়া ছাত্রেরা সকলেই প্রীত হইল, আমিও ভাবিলাম মহাকবির মৃত্যুদিনে আমি বাঙ্গালীর কর্ত্তব্য পালন করিয়াছি।

(৩৮)

১৪ই আগষ্ট, বৃহস্পতিবার। অপরাহ্নকালে ডাক্তারবাবুর বাড়ীর বারান্দায় বসিয়া আছি। তাঁহার ছেলে ধীরেনবাবু আসিয়া বলিলেন ডাক্তারবাবু আমাকে উপরে ডাকিতেছেন। কোন কোনদিন বিকালবেলা

আমার উপরে যাইতে দেরী হইলে ডাক্তারবাবু তাঁহার দৌহিত্র বরুণ অথবা কোন পুত্রের দ্বারা আমাকে ডাকিয়া পাঠাইতেন। আজিকার ডাকও সেইরূপ সাধারণ মনে করিয়া আমি ধীরে ধীরে উপরে যাইয়া আমার নির্দ্দিষ্ট চেয়ারে উপবেশন করিলাম। আমি বসিবামাত্র ডাক্তারবাবু অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে আমাকে বলিলেন—"প্রফেসার সাহেব, চলে যাচ্ছে, নাড়ি নেই।" প্রথমটা আমি একটু অন্যমনস্ক ছিলাম বলিয়া ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই, কিন্তু শীঘ্রই বুঝিলাম যে ডাক্তারবাবুর স্ত্রীর অবস্থা খারাপ। কয়েকদিন হইতে রোগিণীর আহারনিদ্রা ছিল না, ঔষধ সেবন করিবার শক্তিও লোপ পাইয়াছিল। ডাক্তারবাবু পুনঃ পুনঃ "চলে যাচ্ছে" কথাগুলি বলিলেন এবং রুদ্ধকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। শোকে তাঁহাকে বিবশ ও অভিভূত দেখিয়া মনে শক্তি সঞ্চয় করিয়া আমি তাঁহাকে বলিলাম "আপনি কাঁদবেন না। আপনাকে ছেলেমেয়েরা ৩।৪দিন রোগিণীর ঘরে যেতে দেয়নি পাছে আপনি কান্নাকাটি করেন বলে। কিন্তু রমার মার যা শরীরের অবস্থা তা'তে ৩।৪ দিন আগেই তাঁ'র প্রাণ বিয়োগ হ'ত, কেবল আপনার সঙ্গে শেষ দেখা ও বিদায় নেবার জন্যই তিনি এখনও বেঁচে আছেন। আজ সকালে আপনি তাঁকে দেখেছেন, তাঁর জীবনের শেষ কাজ হয়ে গেছে, এইবার তিনি চলে যাবার জন্য প্রস্তুত। অসহ্য দেহের যন্ত্রণা তিনি ভোগ কর্চ্ছেন, আরোগ্যের কোন সম্ভাবনা নেই, এখন শরীর যত শীঘ্র যায় ততই রোগিণীর শান্তি ও মঙ্গল। আপনি যদি কাঁদেন তা'তে তাঁ'র স্বচ্ছন্দগতির বাধা হয়, এই জন্য সাধু সন্ন্যাসীদের মৃত্যুর সময় বা প'রে রোদন করা নিষিদ্ধ। ইনি এগার বৎসর বয়সে আপনাদের বাড়ীতে এসেছেন, আজ ৫৮ বৎসর বয়স,—এই ৪৭ বৎসর নিরবচ্ছিন্নভাবে আপনাদের বাড়ীর সকলের সেবা করেছেন, এখন তাঁ'র চিরশান্তি

লাভ কর্ব্বার সময় ও অধিকার। আপনি কেঁদে তাঁর শেষ মুহূর্ত্তগুলি তিক্ত করে তুলবেন না। আপনি যদি আকর্ষণ করেন তাহলে তাঁ'র মৃত্যু হ'তে আরও অনেক দেরী লাগবে, এই রকম অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ কর্ত্তে হবে। আপনি তাঁকে প্রসন্ন মনে আশীর্ব্বাদ করুন, তাঁর অনন্তযাত্রা শীতল ও সার্থক হক।" ডাক্তারবাবু আমার কথাগুলি নীরবে অতি ধৈর্য্যসহকারে শ্রবণ করিলেন এবং অশ্রুকোমল কণ্ঠে বলিলেন "আমি আশীর্ব্বাদ করেছি।" আমি তখন অন্যকথা আরম্ভ করিয়া ডাক্তারবাবুর মনকে বিষয়ান্তরে লইয়া যাইলাম।

সন্ধ্যাবেলা প্রায় ৬৷৷০ টার সময় ডাক্তার মল্লিক রোগিণীকে দেখিতে আসিলেন এবং পরীক্ষা করিয়া বলিলেন ২।১ ঘণ্টার মধ্যেই প্রাণ বিয়োগ হইবে। তাঁহার কথা শুনিয়া বাড়ীতে রান্না বন্ধ করা হইল। আমি ভাবিলাম যে ডাক্তারের কথা বোধহয় ঠিক হইবে না কারণ এই গৃহলক্ষ্মী বাটীর সকলকে অভুক্ত রাখিয়া বিশৃঙ্খলার মধ্যে চিরবিদায় গ্রহণ করিবেন না। সম্মুখে চাকর অবিনাশকে দেখিয়া বলিলাম যে রোগিণীর প্রাণবিয়োগ হইতে এখনও দেরী আছে সুতরাং তাড়াতাড়ি যাহা কিছু একপাকে রাঁধিয়া লইয়া সকলে আহারাদি সম্পন্ন করিয়া লইলেই ভাল। আমার কথামত কিনা জানিনা, কিন্তু সেইরূপ ব্যবস্থাই হইল। ইতিমধ্যে ডাক্তারবাবুর বড় জামাতা শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল কুমার মিত্র আমাকে বলিলেন "একবার ওঘরে গিয়ে দেখ্‌বেন?" অনেক মহিলা ও আত্মীয়পরিজন পার্শ্বের কক্ষে রোগিণীকে দেখিতে আসিয়াছেন সুতরাং আমি ইতস্ততঃ করিলাম। প্রফুল্লবাবু আমার মনের ভাব বুঝিয়া পুনরায় আমাকে বলিলেন যে আমি দেখিতে যাইলে কোন অসুবিধা হইবে না। আমি তখন প্রফুল্লবাবুর সঙ্গে পার্শ্বের কক্ষে রোগিণীকে দেখিবার জন্য উপস্থিত হইলাম।

প্রশস্ত কক্ষের মেজেতে পূর্ব্বদিকে মস্তক রাখিয়া ডাক্তারবাবুর স্ত্রী ভূমিশয্যায় শায়িতা। যে গৌরবময়ী মূর্ত্তি আমি কতবার দেখিয়াছি তাহার চিহ্নমাত্রও আজিকার মৃত্যুকবলিত দেহের কোন অংশে ছিল না। একখানি মোটা চাদরে কণ্ঠদেশ হইতে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত, মুখে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, কয়েকদিন পূর্ব্বে যে ব্যাণ্ডেজ বারংবার উন্মোচন করিতেছিলেন আজ মৃত্যুর আদেশে নীরবে তাহা সহ্য করিতেছেন। কতবার যে উজ্জ্বল সুগঠিত মুখমণ্ডল দেখিয়াছি সেই মুখ চিনিতে আমার অনেক দেরী হইল। বামচক্ষু অপেক্ষাকৃত বিস্ফারিত, ধীরে ধীরে নাভিশ্বাস প্রবাহিত হইতেছে। লম্বমান নিস্পন্দ দেহ কাষ্ঠখণ্ডের মত পড়িয়া আছে, কেবল মধ্যে মধ্যে দক্ষিণ পদ ঈষৎ স্পন্দিত হইতেছে। বক্ষের উপর ক্ষুদ্র একটি গীতা। চতুর্দ্দিকে আত্মীয় পরিজন রোগিণীকে বেষ্টন করিয়া উপবিষ্ট—স্ত্রীলোকের সংখ্যাই বেশী। রোগিণীর শিরোভাগে বড় ডাক্তারবাবুর স্ত্রী উপবিষ্টা। কয়েকটি ক্ষেত্র লক্ষ্য করিয়া আমি বুঝিতে পারিয়াছি এই সৌম্যমূর্ত্তি মহিলা ধর্ম্মপরায়ণা, অন্য সকলে উদাসীন হইলেও অনন্তপথযাত্রী পথিকের আত্মার কল্যাণের জন্য ইনি সর্ব্বদাই সতর্ক। আমি কক্ষে প্রবেশ করিয়া সব দৃশ্যটিকে ধীরে ধীরে গ্রহণ করিতেছি এমন সময় শুনিলাম বড়ডাক্তার-বাবুর স্ত্রী তাঁহার পৌত্র শ্যামলকে রোগিণীর মুখে গঙ্গাজল প্রদান করিতে বলিতেছেন। কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই তিনি কোন একজন লোককে (বোধ হয় স্বামী বড়ডাক্তারবাবুকে) বলিলেন "প্রফেসার বাবুর পায়ের ধূলা মাথায় দিয়ে দাও।" তাহাই করা হইল, আমি প্রথমটা সঙ্কুচিত হইয়াছিলাম,—এই মুমূর্ষু মহিলা আমার অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠা এবং তাঁহার জীবন নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা পরিশুদ্ধ, আমার মত যজ্ঞসূত্রমাত্রচিহ্নিত ব্রাহ্মণের পদধূলি পুণ্যবতী পরলোকযাত্রী এই মহিলার মস্তকে স্পর্শ করাইলে আমার মহা অপরাধ হইবে। পরক্ষণেই ভাবিলাম ইঁহারা যাহা ভাবিয়া পদধূলি

লইতেছেন তাহা মিথ্যা নয়, আমাকে নিমিত্ত করিয়া সেই বিশ্বপিতার আশীর্ব্বাদ এই রোগশোকক্লিষ্ট দেহ ও মনের শান্তি বিধান করুক। আমি একপার্শ্বে কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া মনে মনে রোগিণীর উদ্দেশে শ্রীহরিনাম জপ করিলাম, ভগবৎচরণে তাঁহার আত্মার চিরশান্তি প্রার্থনা করিলাম। রোগিণীকে ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া আমার ধারণা হইল তাঁহার অন্তঃসংজ্ঞা রহিয়াছে, বাহিরে যে অজ্ঞানতার আবরণ তাহা রোগজনিত দেহের একান্ত দুর্ব্বলতাপ্রসূত। ভিতরে ভিতরে তিনি সবই বুঝিতেছেন, সবই দেখিতেছেন। জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে এই যে মুহূর্ত্তগুলি বড়ই বেদনাদায়ক। "একদিন অন্যে কথা কবে আমি রব নিরুত্তর"—এই অবস্থা মৃত্যুপথগামী গৃহীর পক্ষে বড়ই করুণ ও অসহনীয়। আমি সেই কক্ষ ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে ডাক্তারবাবুর বড় ছেলে শচীন্দ্রবাবুকে একান্তে ডাকিয়া বলিলাম "আপনার মার জ্ঞান আছে মনে হচ্ছে, আপনি বড় ছেলে একবার 'হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ' নাম তাঁর কানের কাছে শুনিয়ে দেবেন।" শচীন্দ্রবাবু বিস্মিত দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন "জ্ঞান আছে?" আমি তাঁহার কথাগুলি বুঝিলাম,—তাঁহার বিশ্বাস হইতেছিল না। তখন পুনরায় তাঁহাকে বলিলাম যে জ্ঞান থাকুক বা নাই থাকুক হরিনামের অমোঘ শক্তিতে তাঁহার আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধিত হইবে। সাধারণ মানুষে জানে না যে হরিনামের কি অমোঘ শক্তি—মৃতদেহের কর্ণকুহরেও হরিনাম ধ্বনিত হইলে সেই অমোঘ-শক্তিবলে মানুষ ভবসমুদ্র অনায়াসে পার হইয়া যায় তাহা অনেকেরই বিদিত নহে। আমি শেষবার রোগিণীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহার কল্যাণে শ্রীহরি স্মরণ করিতে করিতে ধীরে ধীরে সেই কক্ষ পরিত্যাগ করিলাম।

রাত্রি ১২টার পর প্রাচীরগাত্রে ডাক্তারবাবুর কন্যা রমার কণ্ঠধ্বনি শুনিয়া আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। রমা আরতিকে ডাকিয়া বলিতেছে

তাহার মাতা ৯—৫৪ মিনিটের সময় দেহত্যাগ করিয়াছেন, ডাক্তারবাবু আমাকে ডাকিতেছেন। আমি তৎক্ষণাৎ শয্যাত্যাগ করিয়া ডাক্তারবাবুর বাড়ী চলিয়া যাইলাম।

বাড়ীর ভিতরে প্রশস্ত প্রাঙ্গনে মৃতদেহ সুসজ্জিত অবস্থায় স্থাপিত—চতুর্দ্দিকে অসংখ্য আত্মীয় পরিজন। বাড়ীতে প্রবেশ করিতে করিতেই ডাক্তারবাবুর ক্ষীণকণ্ঠ শ্রুতিগোচর হইল—"প্রফেসারবাবু এসেছেন?" আমি উত্তর দিলাম "আসিয়াছি।" উপরে যাইয়া ডাক্তারবাবুর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলাম। ডাক্তারবাবু বলিলেন "শীগ্‌গীর নীচেয় গিয়ে দেখুন, বেশ মানিয়েছে।" ডাক্তারবাবুর মন শোকাচ্ছন্ন নহে, অকুণ্ঠিত দৃষ্টি, সুস্পষ্ট কথা, বুঝিলাম মোহের আকর্ষণ বিচ্ছিন্ন করিয়া আজ প্রশান্তমনে নিজ সহধর্ম্মিণীকে চিরবিদায় দিতেছেন। মৃতদেহের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলাম, ডাক্তারবাবু ইতিমধ্যে উপরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, বারংবাব আমাকে মৃতদেহের নিকটে যাইয়া দেখিতে বলিতেছেন। লক্ষ্য করিলাম ডাক্তারবাবুব মুখ অস্বাভাবিক বিবর্ণ। আমার মন তখন গভীর ভারাক্রান্ত, কথা কহিবার রুচি নাই, তথাপি ডাক্তারবাবুর পুনঃ পুনঃ প্রশ্নের উত্তরে কথা কহিতে হইতেছিল। দেখিলাম কাষ্ঠ ও রজ্জুনির্ম্মিত শয্যায় মৃতদেহ আসীন, সমগ্র মুখমণ্ডল চন্দনচর্চ্চিত, নববধূর মত মুখের এক অনির্ব্বচনীয় শোভা। কয়েকঘণ্টা পূর্ব্বে যে মুখ রোগমসীমাখা দেখিয়াছিলাম মৃত্যুর পর সেই মুখের অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইলাম। মৃতদেহের পরিধানে মূল্যবান বেনারসী সাড়ি, শুনিলাম সাতচল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে এই সাড়িখানি পরিধান করিয়া কম্পিত বক্ষে, নম্র নেত্রপাতে, বধূরূপে এই বাড়ীতে প্রথম প্রবেশ করিয়াছিলেন। সেই একদিন আর এই একদিন! সেদিনকার শুভক্ষণ, চন্দনচর্চ্চিত ললাট, রক্তপট্টাম্বর, উৎসবের বাঁশরী-সঙ্গীত, অজানা বাড়ীতে অজানা

মানুষের কাছে ভীরু ও কম্পিত আত্মনিবেদন। আজিও সর্ব্বদুঃখতাপ-হারী মৃত্যুর শুভলগ্ন, আজিও চন্দনচর্চ্চিত ললাট, সেই রক্তপট্টাম্বর, আজিও চিরবিচ্ছেদশঙ্কিত শতছিদ্রআত্মীয়হৃদয়ের মর্ম্মস্পর্শী শোকবাঁশরী! সেদিনের মত আজিও কল্যাণকঙ্কণ, আজিও সীমান্ত-সীমায় মঙ্গল সিন্দূরবিন্দু। এই দুইদিনের মধ্যস্থলে সাতচল্লিশটি অখণ্ড বৎসর অনন্ত কালসমুদ্রের মধ্যে বুদ্বুদের মত কোথায় মিশাইয়া যাইতেছে। পুত্রকন্যাগণ পদধূলি লইল, স্বামী নিস্পন্দনয়নে দ্বিতলে দাঁড়াইয়া আছেন, রাত্রি প্রায় ২॥০টার সময় নিঃশব্দচরণে, গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে ডাক্তারবাবুর সংসারের লক্ষ্মী-স্বরূপিনী এই মহীয়সী মহিলা সব পার্থিব বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া অনন্তযাত্রা করিলেন।

শবদেহ বহন করিয়া লইয়া যাইবার পর আমি ধীরে ধীরে ডাক্তারবাবুর কক্ষে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম বড়ডাক্তারবাবুর স্ত্রী দেবরের মস্তকে পাখার বাতাস দিতেছেন, ছোটডাক্তারবাবু চক্ষুদ্বয় নিমীলিত করিয়া শয়ন করিয়া আছেন। আমার পদশব্দে ডাক্তারবাবু চাহিয়া দেখিলেন, বাতাস করিতে বারণ করিলেন, আমাকে বসিতে বলিলেন। কিছুক্ষণ পরে বড়ডাক্তারবাবুর স্ত্রী বাহিরে চলিয়া যাইলেন, আমি একাকী ডাক্তারবাবুর নিকট বসিয়া রহিলাম। ডাক্তারবাবুর প্রথম কথাই—"বেশ মানিয়েছে, নয়?"—এই কথাগুলি কিছুক্ষণ পরে পরে বহুবার বলিলেন, আমাকে শোনা-ইতেছেন তাহা নহে, আমার কোন উত্তরও প্রত্যাশা করিতেছেন না, এই কথাগুলি নিজেকে যেন নিজে বলিতেছেন। আমি বুঝিলাম ডাক্তার-বাবুর মন আজ বর্ত্তমানের সীমা অতিক্রম করিয়া বারংবার সাতচল্লিশ বৎসর পূর্ব্বের অতীতে চলিয়া যাইতেছে, সেদিনকার শুভদৃষ্টিই পুনঃ পুনঃ স্মৃতিতে উদিত হইতেছে,—"বেশ মানিয়েছে" কথাটি আজিকার নহে, সাতচল্লিশ বৎসরের পুরাতন কথা। আমি ডাক্তারবাবুকে নিদ্রা

যাইতে বলিলাম কিন্তু তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিলেও মুহূর্তের জন্যও নিদ্রা যাইলেন না। আমি রাত্রি ৪টা পর্য্যন্ত ডাক্তারবাবুর নিকট বসিয়া রহিলাম। মধ্যে মধ্যে ডাক্তারবাবু কথা কহিতেছেন, আমি বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছি। একবার হঠাৎ ডাক্তারবাবু কন্যা রমাকে ডাকিলেন, পার্শ্বের প্রকোষ্ঠ হইতে রমা আসিয়া উপস্থিত হইবামাত্র ডাক্তারবাবু অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বলিলেন "প্রফেসার সাহেব, বড় আদরের মেয়ে রমা, আজ তাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে।" এই কথা উচ্ছুসিত কণ্ঠে বারংবার বলিয়া কন্যাকে দুইহস্তে বক্ষে জড়াইয়া নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন। আমি বসিয়া বসিয়া দেখিলাম, ভাবিলাম এই মায়ার ক্ষণভঙ্গুর সংসারকেও ভগবান কত মধুর করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন! রাত্রি অগ্রসর হইতেছে, সমস্ত বাড়ীটাকে আচ্ছন্ন করিয়া এক অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতা। আমি চেয়ারে বসিয়া আছি, ভাবিতেছি। এই পরলোকগতা মহিলা স্বামীর "Guide, friend and philosopher" ছিলেন, সমস্ত বিষয়ে ইঁহারই পরামর্শমত ডাক্তারবাবু পরিচালিত হইতেন। এইরূপ কত ঘটনা যে আমার মনে পড়িল তাহা লিপিবদ্ধ করা অসম্ভব। স্বামীস্ত্রীর এমন মধুর সম্বন্ধ আমি আর কখনও দেখি নাই। ডাক্তারবাবু বহুদিন পূর্ব্বে উভয়ের জন্ম-পত্রিকা বিচার করাইয়াছিলেন, বিচারে দেখা গিয়াছিল ডাক্তারবাবুর স্ত্রীর বৈধব্য যোগ নাই, এই মহিলারও তাহাই চিরকালের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তারপর একদিন ডাক্তারবাবু কঠিন উদরীরোগে শয্যাশায়ী হইলেন, তখন তাঁহার স্ত্রী সম্পূর্ণ সুস্থ। আমি ভাবিলাম জন্মপত্রিকার হিসাব মিলিল না, ডাক্তারবাবুর স্ত্রীকে বৈধব্য ভোগ করিতে হইবে। একদিন বৈষ্ণব সম্মি-লনীগৃহে শ্রীভাগবত পাঠ শ্রবণ করিতে গিয়াছি, শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহের সম্মুখে বসিয়া রায় বাহাদুর নগেন্দ্রবাবু হরিনাম জপ করিতেছেন। ডাক্তারবাবুর অবস্থা জিজ্ঞাসা করার পর নগেন্দ্রবাবু বলিলেন "কিন্তু আমি

Mrs. Choudhuryকে দেখেছি, লক্ষ্মীঠাকরুনের মত চেহারা, ওঁর বৈধব্যকষ্ট হতে পারে না।" সম্মুখে বিগ্রহ,—আমি এই বৈষ্ণবের মুখে এই বাণী শ্রবণ করিয়া চমকিয়া উঠিলাম। তারপর এই মহিলা ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হইলেন, ক্রমশঃ রোগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

একদিনের কথা। আমি অভ্যাসমত অপরাহ্নকালে ডাক্তারবাবুর নিকটে বসিয়া আছি। অন্যান্য কথার পর ডাক্তারবাবু আমাকে বলিলেন কয়েকদিন যাবৎ স্বামীস্ত্রীর মধ্যে কথাবার্ত্তা হইতেছে, উভয়েরই মৃত্যু অনিবার্য্য, কিন্তু পূর্ব্বে কে ইহসংসার পরিত্যাগ করিয়া যাইবে! স্ত্রী আগে চলিয়া যাইতে চাহেন, স্বামী বলেন তিনি চলিয়া যাইলেও স্ত্রী সংসারটি পূর্ব্বের মতই পরিচালিত করিতে পারিবেন, গৃহস্বামীর অভাব বিশেষ পরিলক্ষিত হইবে না। আমি কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "শেষ পর্য্যন্ত কি স্থির হ'ল?" ডাক্তারবাবু বলিলেন "কি কর্ব্ব? উনিই আগে যাবেন স্বীকার করে নিতে হল। তবে এও বল্লাম যে আমিও বেশীদিন নই, তোমার পরে পরে আমি যাচ্ছি।" আজ রাত্রিতে ডাক্তারবাবুর কাছে বসিয়া সেই কথা স্মরণ করিয়া আমি ডাক্তারবাবুর আয়ুষ্কাল সম্বন্ধে চিন্তিত হইয়া পড়িলাম।

গভীর রাত্রি, বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছি। ডাক্তারবাবুর স্ত্রীর অসুখ কত দ্রুতগতিতে বাড়িয়া চলিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে ব্যাধির প্রকোপে পাঁচিলের নিকট দাঁড়াইয়া আরতির সহিত কথাবার্ত্তা বন্ধ হইল, স্বামীর কল্যাণার্থ পূর্ণিমা ও সংক্রান্তির দিনে শ্রীনারায়ণের পূজার প্রসাদ আরতিকে নিজহস্তে আর দিতে পারিলেন না, ডাক্তারবাবুর শয্যাপ্রান্তে বসিবার সামর্থ্য আর রহিলনা, ছেলেমেয়েদের সতর্ক চক্ষু এড়াইয়া শয্যা হইতে উঠিয়া বাহিরে যাইবার সময় একদিন পড়িয়া গিয়া কপালে আঘাত পাইলেন। ছেলেমেয়েরা

এইবার দিবারাত্র তাঁহাকে পাহারা দিতে লাগিল। কী কোমল ও অসাধারণ সেবাশক্তি আমি এই ছেলেমেয়েদের দেখিয়াছি, কী মাতৃভক্তির পরিচয় ইহারা অনুক্ষণ দিয়াছে! রাত্রিতে কিছুই আহার করিতে চাহিতেন না, বোধ হয় তরল পদার্থ আহার করিলেও কণ্ঠদেশে জ্বালাযন্ত্রণা হইত। রাত্রি হয়ত তখন ৯॥০—আমি তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইতেছি। শচীন্দ্র, তপেন্দ্র, হিতেন্দ্র, ধীরেন্দ্র সকলেই মাতাকে বেষ্টন করিয়া বসিয়া আছে, তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা ও কনিষ্ঠা কন্যারও গলা পাইতেছি; তাঁহার ভাগিনেয়ী শতদল নাম্নী এক মহিলার মৃদুকণ্ঠ সময় সময় শ্রুতিগোচর হইতেছে। এক একবার সকলে দুধবার্লি খাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছে, রোগিণী দৃঢ়কণ্ঠে প্রত্যাখ্যান করিতেছেন, অথবা দৃঢ় অপেক্ষাও দৃঢ়তর মৌনতার ভিতর দিয়া তাঁহার প্রত্যাখ্যান প্রকাশিত হইতেছে। রমা বলিল "মা একটু খাও, এতগুলো লোকে বল্‌ছে, কথা রাখতে হয়।" মাতার উত্তর নাই। অবশেষে পুত্রকন্যাগণ পরাজিত হইয়া শম্ভুর শরণাপন্ন হইল। এই শম্ভু রোগিণীর পৌত্র, বয়স প্রায় ৩।৩॥০ বৎসর। প্রিয়দর্শন এই বালক পিতামহীর বড়ই প্রিয়, কত বিচিত্র ভাষায় পিতামহী এই নাতিকে আদর করিতেন তাহা শুনিয়া আমি কতদিন মনে মনে হাসিয়াছি। সেই শম্ভু আজ আসিয়া উপস্থিত হইল, বালককণ্ঠে বলিল "মাকুমা, একটুখানি খাও, শীগ্‌গীর খাও।" এইবার পিতামহীর তপোভঙ্গ হইল, মুখ খুলিয়া কিছু খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করিলেন। এই রকম কতদিন হইয়াছে তাহার নির্ণয় নাই। কত প্রীতির সহিত, ভক্তির সহিত ইহারা সকলে রোগিণীর সেবা করিয়াছে তাহা এক অপূর্ব্ব জিনিষ—কাহারও কোন বিরক্তি নাই, মুহূর্ত্তের জন্য কাহারও ধৈর্য্যচ্যুতি লক্ষ্য করি নাই। বিশেষ করিয়া কন্যা রমার মাতাকে সেবাশুশ্রূষার কথাই আজ গভীর রাত্রিতে আমার পুনঃ পুনঃ মনে পড়িতেছিল।

গভীর রাত্রি, বাড়ীর ভিতর নিস্তব্ধতা, আমি বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছি, মধ্যে মধ্যে ডাক্তারবাবুর কথার ক্ষুদ্র উত্তর দিতেছি। কী আদর্শ গৃহিণীরূপে এই মহিলাকে আমি সুদীর্ঘ দশ এগার বৎসর লক্ষ্য করিয়াছি তাহা মনে পড়িতেছে। পুত্রবধূগণ কোন দোষত্রুটি করিলে তাহা যে কেবল নীরবে সহ্য করিতেন তাহাই নহে, সকলের চক্ষু হইতে, এমন কি নিজস্বামীর নিকট হইতেও তাহা গোপন করিতেন। এমন সর্ব্বংসহা শাশুড়ি, মাতা, পিতামহী এবং স্ত্রী আমার দীর্ঘজীবনে আর কখনও দেখি নাই। আমার প্রতি তাঁহার করুণার সীমা ছিল না, আমার কন্যাগুলিকে, বিশেষতঃ আরতিকে তিনি সর্ব্বদাই স্নেহ করিতেন। আরতি যখন কয়েকমাসের জন্য তাহার বড়দিদির বাড়ী ভাগলপুর গিয়াছিল তখন এই পুণ্যবতী মহিলার স্নেহে আমি আহারাদির কোন কষ্ট পাই নাই, আমার পাচক ছিল না, কিন্তু জলখাবার দুইবেলা, অন্নব্যঞ্জন, লুচি প্রভৃতি নানাবিধ সুস্বাদু দ্রব্যের ব্যবস্থা করিয়া আমার একাকীবাসের সমস্ত অসুবিধা তিনি সযত্নে দূর করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট আমার ঋণের সীমা নাই। একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার কাগজপত্র দেখিতে বালীগঞ্জে শ্রীযুক্ত মোহিনী মোহন ভট্টাচার্য্যের বাড়ী গিয়াছিলাম, সময়মত ফিরিতে পারিলাম না, রাত্রি প্রায় ১২টা বাজিল। বাড়ীতে আরতি একা, ভয়ে এবং দুশ্চিন্তায় প্রতি মুহূর্ত্ত তাহার নিকট দুর্ব্বহ। তখন এই মহিলা পুনঃ পুনঃ আরতিকে আশ্বাস দিতেছিলেন এবং যখন রাত্রি অধিক হইল তখন নিজে আসিয়া আরতির নিকট বসিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এমন সময় আমি ফিরিয়া আসিলাম। আমার কন্যা করুণার কঠিন অসুস্থতার সময় বারংবার আসিয়া কত সাহায্য করিয়াছিলেন তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এইরূপ কত ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা লিপিবদ্ধ করা অসম্ভব।

আজ গভীর রাত্রিতে বসিয়া কত কথাই মনে পড়িতে লাগিল। একটি কথা ভাবিতেছি, অপরটি আসিয়া উপস্থিত হইতেছে, পূর্ব্ব চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইয়া যাইতেছে। এইরূপ অসম্বদ্ধ, অসম্পূর্ণ চিন্তালহরীব মধ্য দিয়া বাত্রি প্রবাহিত হইল, আমি ভোর চারিটার পব নিজগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

(৩৯)

১৫ই আগষ্ট শুক্রবার। আজ স্বাধীনতা দিবস। ইংরাজ রাজশক্তি আজ সমগ্র ভারতবর্ষের শাসনভার ভারতবাসীদিগের হস্তে অর্পণ করিতেছেন। মুসলমানদের দাবী মিটাইবার জন্য ভারতবর্ষকে হিন্দুস্থান ও পাকিস্থানে বিভক্ত করা হইয়াছে। কংগ্রেস চিবদিন অখণ্ড ভারতের জন্য কত দুঃখ, ত্যাগ ও মৃত্যু পর্য্যন্ত বরণ করিয়াছে, আজ কতকগুলি মুসলমানের অসঙ্গত দাবী রক্ষা করিবার জন্য বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট কংগ্রেসের আদর্শ ভঙ্গ করিয়া দিলেন। তথাপি সমগ্র ভারতবর্ষে আনন্দের সীমা নাই—ভারতবর্ষ আজ বহুআকাঙ্খিত স্বাধীনতা লাভ কবিয়াছে। সমগ্র কলিকাতা নগরী অসংখ্য জাতীয়-পতাকা পরিশোভিত। আমি জীবনে কখনও বাড়ীতে পতাকা উত্তোলন করি নাই, আজিকাব শুভদিন স্মরণ করিয়া একখানি পতাকা ক্রয় করিয়া বারান্দায় টাঙ্গাইয়াছিলাম। পথে পথে অসংখ্য নবনারী আনন্দে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—অন্নবস্ত্রহীন সাধারণ নরনারীর এই আনন্দ অভিযান বিশেষ পরিলক্ষণীয়। বহুদিন হইতে প্রজ্জ্বলিত হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা হঠাৎ নির্ব্বাপিত হইল, মহাত্মা গান্ধীর চেষ্টা ও উদ্দেশ্য সফল হইল। কলেজ ও স্কুল সমস্তই স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে ১৪ই আগষ্ট হইতে ২৪শে আগষ্ট পর্য্যন্ত বন্ধ রহিল।

(৪০)

২৭শে আগষ্ট কর্ম্মোপলক্ষ্যে বালীগঞ্জে গিয়াছিলাম। কর্ম্ম শেষ করিয়া বেলা প্রায় ৯॥০টার সময় শ্রীযুক্ত ত্রিপুরারি চক্রবর্ত্তীর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম—ইঁহার বাড়ী Fern Place নামক রাস্তার উপরে। ত্রিপুরারিবাবু আমার বহুদিনের পরিচিত বন্ধু। ইনি বিশ্ব-বিদ্যালয়ে এম. এ. ক্লাশে ইতিহাসের অধ্যাপক। কথা প্রসঙ্গে শ্রীভাগবতের কথা উঠিল। আমার ধারণা ছিল ইনি ধর্ম্মশাস্ত্র অধিক অধ্যয়ন করেন নাই, কেবলমাত্র ইতিহাসেই সুপণ্ডিত। আমি শ্রীভাগবতের ভাব ও ভক্তির কথা আলোচনা করিতেছি, ত্রিপুরারিবাবু নীরব মনোযোগের সহিত শুনিতেছেন। ক্রমশঃ তাঁহার দুই একটি কথা শুনিয়া আমার চৈতন্য হইল। তাহার পর কথা প্রসঙ্গে দেখিলাম তিনি শ্রীভাগবত, শ্রীমহাভারত, উপনিষদ্ প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ সকল অতি মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছেন,—ব্যাকরণে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি। ত্রিপুরারিবাবু তাঁহাব দ্বিতলের প্রকোষ্ঠে আমাকে লইয়া যাইয়া তাঁহার গ্রন্থাগার দেখাইলেন—ইতিগাস অপেক্ষা ধর্ম্মগ্রন্থই তাহাতে অধিক। শুনিলাম ত্রিপুরারিবাবুর পিতা পণ্ডিত ছিলেন, পুত্রের এই ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠের স্পৃহা পণ্ডিত ও ধার্ম্মিক পিতার নিকট হইতে প্রাপ্ত। অবশেষে আমি শ্রোতা হইয়া নির্ব্বাক বিস্ময়ে ত্রিপুরারিবাবুর নিকট অনেক তত্ত্বকথা শ্রবণ করিলাম। কুন্তীদেবী যখন বনপ্রস্থান করিয়াছেন তখন যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পুত্রগণ বৃদ্ধামাতাকে বন হইতে তাঁহাদের ভোগৈশ্বর্য্যপরিশোভিত রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করাইবার জন্য অশেষ প্রকারে মিনতি করিলেন, কিন্তু এই বিষয়বিরক্তা ধর্ম্মপ্রাণা নারী কিছুতেই ঐশ্বর্য্যের মধ্যে ফিরিয়া আসিলেন না। নিষ্ফল হইয়া পুত্রগণ বিদায়ের সময় আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা

করিলেন। মাতা তাঁহাদের দীর্ঘজীবন কামনা করিলেন না, ভোগৈশ্বর্য্য চিরস্থায়ী হউক আশীর্ব্বাদ করিলেন না, শরীর নীরোগ হউক প্রার্থনা করিলেন না, শত্রু ক্ষয় হইয়া নিরুপদ্রবে রাজ্য ভোগ করিয়া পুত্রগণ সুখী হউক এই অভিপ্রায়ও মাতা কুন্তী ব্যক্ত করিলেন না। তাঁহার শ্রীমুখ হইতে আশীর্ব্বাদ নির্গত হইল।

ধর্ম্মে তে ধীয়তাং বুদ্ধির্মনস্তু মহদস্তু তে।

কী মহীয়সী মাতা, কী অনির্ব্বচনীয় আশীর্ব্বাদ! ত্রিপুরারিবাবু মহাভারত খুলিয়া এই স্থানটি পাঠ করিয়া আমাকে শুনাইলেন। আমি দেখিলাম মহাভারতের নানাস্থানে রঙ্গীন পেন্সিলের দাগ, যে সমস্ত ভাব ও ভাষা ত্রিপুরারিবাবুর ভাল লাগিয়াছে সেই স্থানেই পেন্সিলের চিহ্ন। ত্রিপুরারিবাবু মহাভারতের আরও স্থানে স্থানে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষ হইবার পর আর এক মাতা শতপুত্র হারাইয়া শোকে ক্রুদ্ধা ফণিনীর মত যুধিষ্ঠির প্রভৃতি ভ্রাতৃবর্গকে শাপ প্রদান করিতে উদ্যত। গান্ধারী সত্যবাদিনী, তিনি অমোঘবাক্, তাঁহার শাপ কোনও শক্তিই প্রতিহত করিতে পারিবে না। ব্যাসদেব ব্যাকুল হইয়া গান্ধারীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্যাসদেব স্মরণ করাইয়া দিলেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় প্রতিদিন দুর্য্যোধনাদি পুত্রগণ যুদ্ধে যাইবার পূর্ব্বে মাতা গান্ধারীকে প্রণাম করিয়া আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেন, মাতা "যুদ্ধে বিজয়ী হও" আশীর্ব্বাদ করিতেন না, প্রতিদিনই বলিতেন "যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ"। গান্ধারী সত্যবাদিনী, তিনি যদি যুদ্ধে জয় কামনা করিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেন তাঁহার অমোঘ আশীর্ব্বাদের বলেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের হয়ত অন্যরূপ পরিণতি হইতে পারিত। কিন্তু গান্ধারীর ইচ্ছাশক্তি, ভগবৎশক্তির অনুকূল, ভগবৎ ইচ্ছার সহিত তাহা এক হইয়া গিয়াছিল। শ্রীব্যাসদেব পুত্রশোকাতুরা

মাতাকে স্মরণ করাইয়া দিবামাত্র গান্ধারীর স্মৃতিলাভ হইল, তিনি শাপ প্রদান করিতে নিবৃত্ত হইলেন। এইরূপ কত ভাল ভাল তত্ত্বকথা ত্রিপুরারিবাবুর নিকট শ্রবণ করিয়া, কৃতার্থ হইয়া, এই জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক অধ্যাপককে মনে মনে প্রশংসা করিতে করিতে বিদায় গ্রহণ করিলাম। সমস্তদিন "ধর্ম্মে তে ধীয়তাং বুদ্ধির্মনস্তু মহদস্তু তে" কথাগুলি হৃদয়কন্দরে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

(৪১)

৩০শে আগষ্ট, শনিবার, আজ কলেজ নাই। সকালবেলা থানার নিকট ডাকবাক্সে চিঠি ফেলিয়া হৃষিকেশ পার্কের ভিতর দিয়া বাড়ী ফিরিতেছি এমন সময় একটি উজ্জ্বলকান্তি, হৃষ্টপুষ্ট, কোমলদেহ প্রায় ১।১৷৷০ বৎসর বয়স্ক শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া একটি ১২।১৪ বৎসরের চাকর দাঁড়াইয়া আছে লক্ষ্য করিলাম। শিশুকে দেখিয়া তাহার প্রতি আমাব মন আকৃষ্ট হইল। আমি তাহার নিকটে যাইয়া ক্রোড়ে লইবার জন্য হস্ত প্রসারিত করিবামাত্র অপরিচিত আমার ক্রোড়ে শিশুটি আগ্রহের সহিত আসিল, কোন ইতস্ততঃ করিল না। আমি বিস্মিত স্নেহের সহিত তাহাকে ক্রোড়ে লইলাম। শিশু আমার ক্রোড়ে আসিয়া অস্ফুট ভাষায় তাহার মনের প্রীতি জ্ঞাপন করিল, কত কি বলিল আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। চাকরের নিকট শুনিলাম ইহাদের বাড়ী নিকটেই, শিশুর নাম "কাজল"। "কাজল" বলিয়া ডাকিবামাত্র শিশু আমার দিকে তাকায়, মনের প্রীতি নানা ভঙ্গীতে প্রকাশ করে। কিয়ৎক্ষণ পরে যখন চাকরটি তাহাকে লইতে গেল তখন বালক আমাকে আঁকড়াইয়া ধরিল, চাকরের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইল, কিছুতেই চাকরের ক্রোড়ে যাইবে না। আমি অপেক্ষা

করিলাম, চাকরটি যতবার কাজলকে লইতে যায় ততবারই সেই এক অভিনয়। অবশেষে জোর করিয়া চাকরটি তাহাকে লইল, আমি ভাবিলাম পূর্ব্বজন্মে হয়ত বালকের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ ছিল নতুবা অপরিচিতের প্রতি এমন আকস্মিক আকর্ষণ এই শিশুর হওয়া সম্ভবপর নহে।

(৪২)

১লা সেপ্টেম্বর কলেজের কার্য্য শেষ করিয়া সার্পেণ্টাইন লেনে অন্নপূর্ণাকে পড়াইতে যাইলাম। তারাপদর বোন অন্নপূর্ণা দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ে, কয়েকমাস হইতে তাহাকে পড়াইতে যাইতেছি। বেলা প্রায় ৩টার সময় তাহাকে পড়াইয়া ফিরিবার পথে ক্যাম্বেল হাসপাতালের সম্মুখে স্থানে স্থানে জনতা দেখিয়া আমার সন্দেহ হইল। দেখিলাম ট্রামবাস চলাচলও বন্ধ হইয়াছে। শুনিলাম হঠাৎ হিন্দুমুসলমানের দাঙ্গা পুনরায় আরম্ভ হইয়াছে। কেন এবং কোথায় এই দাঙ্গার সূত্রপাত হইল তাহা কেহই বলিতে পারিল না। আমি হ্যারিসান রোড দিয়া আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট হইয়া পদব্রজে বাড়ী ফিরিলাম। পথে উত্তেজিত জনতা মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুদের সংখ্যাই অধিক পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল। মেছুয়াবাজার ও আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের সংযোগস্থলে আসিয়া পৌঁছিয়াছি এমন সময় একখানি দ্রুতগামী চলন্ত লরীকে হিন্দু জনতা ইটপাটকেল ছুড়িয়া আক্রমণ করিল। লরীটি মাল বোঝাই ছিল এবং তাহার উপরে কয়েকটি মুসলমান উপবিষ্ট। এই অতর্কিত আক্রমণ হইতে লরীটি রক্ষা করিবার জন্য চালক যেমন লরীটিকে আরও বেগে চালাইতে আরম্ভ করিল সেই সময় একটি মুসলমান হঠাৎ লরীর উপর হইতে মাটিতে পড়িয়া গেল। এইবার উন্মত্ত হিন্দু জনতা মুসলমানটিকে লাঠি

প্রভৃতির দ্বারা নির্ম্মমভাবে মারিতে লাগিল। ক্ষিপ্ত জনতার বেগে আমি বিপরীত দিকে নিক্ষিপ্ত হইলাম, একটা কথা প্রতিবাদ করিবার অবসর পাইলাম না। প্রতিবাদ করিলেও ফল হইত না, বরং আমাকেই হয়ত আক্রমণ করিত। বাড়ী ফিরিয়া প্রতিবাসীগণের মুখে শুনিলাম চতুর্দ্দিকে হিন্দুমুসলমান দাঙ্গা পুনরায় আরম্ভ হইয়াছে—কারণ কেহই বলিতে পারিলেন না। রাত্রিতে প্রায় ৮টার সময় ছোট ডাক্তারবাবুর কাছে বসিয়া আছি হঠাৎ আমার বাড়ীর ঠিক বিপরীত দিকে বাদুড় বাগান ষ্ট্রীট হইতে ক্রুদ্ধ জনতার সম্মিলিত কণ্ঠ বারংবার শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। বাহিরে আসিয়া শুনিলাম জনৈক মুসলমান তাড়া খাইয়া এই পথে পলাইবার সময় এক হিন্দুজনতা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে। তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য জনৈক প্রতিবাসী চেষ্টা করিলে উত্তেজিত জনতা তাঁহাকে আক্রমণ করে এবং তিনি নিজ বাটির দরজা কোনরূপে বন্ধ করিয়া নিজ প্রাণ রক্ষা করেন। মুসলমানটিকে হত্যা করিয়া তাহার মৃতদেহ সার্কুলার রোডের উপর ফেলিয়া দিয়া জনতা চলিয়া যায়। পরে শুনিলাম এইবারকার দাঙ্গার জন্য হিন্দুরাই সম্পূর্ণ দায়ী। সকলের মুখেই এক কথা,—কয়েকটি হিংস্রপ্রকৃতি হিন্দুর চক্রান্তের ফলে এইরূপ দাঙ্গা পুনরায় আরম্ভ হইয়াছে। কলেজের ছাত্র, আপিসের বাবু, প্রতিবাসী যাহাকেই জিজ্ঞাসা করি তাঁহারই মুখে এক কথা—হিন্দুদের দোষ। মহাত্মা গান্ধী আজ কিছুদিন যাবৎ বেলিয়াঘাটায় একজন মুসলমানের পরিত্যক্ত গৃহে বাস করিতেছেন, হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি কলিকাতা নগরীতে পুনঃস্থাপিত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। পূর্ব্বদিন রাত্রিতে একদল যুবক বেলিয়াঘাটায় যাইয়া চীৎকার করিয়া মহাত্মা গান্ধীর নিদ্রার ব্যাঘাত করিয়াছিল, তাঁহার সহচারিণী দুইটি মহিলার ভীতি উৎপাদন করিয়া তাহারা মহাত্মাকে তীব্রভাষায়

গালিগালাজ করিয়াছিল—অভিযোগ এই যে মহাত্মা গান্ধীর মুসলমান প্রীতি যথেষ্ট আছে, হিন্দুদের সম্বন্ধে তিনি উদাসীন। একজন হিন্দু তাঁহাকে মস্তকের ব্যাণ্ডেজ দেখাইল, মুসলমানেরা তাহাকে আহত করিয়াছে। পরক্ষণেই চিকিৎসকের দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া দেখা গেল সে আঘাত অতি সামান্য, রাস্তায় পড়িয়া গিয়া সাধারণ আঁচড়ের মত ক্ষতচিহ্ন মাত্র। যে মহাত্মা ১৫ই আগষ্ট দিল্লীতে থাকিলে সেই স্বাধীনতা দিবসে তাঁহাকে স্বর্ণ সিংহাসনে বসাইয়া পণ্ডিত নেহেরু প্রভৃতি নেতাগণ সম্মানিত করিতেন সেই অহিংসার মহাপুরোহিত হিন্দু-মুসলমান প্রীতি পুনঃস্থাপিত করিবার জন্য স্বেচ্ছায় কলিকাতার এক দাঙ্গাবিধ্বস্ত বাড়ীতে অতি দীনের মত বাস করিতেছিলেন। মানুষ কতদূর হীন হইলে তবে এইরূপ মহাপুরুষকে অবমানিত করিতে পারে। পরদিন মহাত্মা গান্ধী এইসব উচ্ছৃঙ্খল যুবকের আচরণ সম্বন্ধে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সংযত ভাষায় সংবাদপত্র সমূহে এক বিবরণ প্রকাশিত করিলেন, যতদিন হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা এই নগরীতে বন্ধ না হইবে তিনি খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করিবেন না।

মহাত্মা গান্ধীর দুর্ব্বল শরীরে এই স্বেচ্ছাবৃত উপবাসের সঙ্কল্পে সমগ্র ভারতবর্ষ চঞ্চল হইয়া উঠিল। কলিকাতায় হিন্দু-মুসলমানের সমবেত শোভাযাত্রা পল্লীতে পল্লীতে ভ্রমণ করিয়া সকলকে শান্ত হইতে বলিল। সৌভাগ্যের বিষয় প্রায় অধিকাংশ হিন্দুই এই দাঙ্গার নিন্দা করিল। স্বার্থান্বেষী হিংস্র প্রকৃতি সেই কয়েকটি হিন্দু লজ্জিত হইয়া আত্মগোপন করিল। গত বৎসরের আগষ্ট মাসের দাঙ্গার সময় উন্মত্ত মুসলমান জনতার উচ্ছৃঙ্খলতা লক্ষ্য করিয়া আমি ভগবানের চরণে নিত্যই প্রার্থনা করিতাম "হে চক্রধারী, আমাদের দৈত্যভয় নিবারণ কর, এই সমস্ত অসুরপ্রকৃতি মানুষকে তুমি দমন কর।"

কিন্তু এইবার হিন্দুদের কর্ম্মে লজ্জিত হইয়া শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলাম, "হিন্দুদের সুমতি দাও, তাহাদের ক্ষমা কর, নয়ত অন্যায় অপরাধের জন্য তোমার প্রদত্ত অমোঘ শাস্তিতে ইহারা দগ্ধ হইয়া যাইবে।" মহাত্মা গান্ধীর উপবাসে কলিকাতা নগরীতে সাধারণ ব্যক্তি-গণের মধ্যে যে জাগরণ হইল তাহাতে ২।৩ দিনের মধ্যেই দাঙ্গা নির্ব্বা-পিত হইয়া গেল, গান্ধী মহারাজ খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করিলেন, কলিকাতাবাসী হিন্দুরা মহাকলঙ্কের দুশ্চিন্তা হইতে রক্ষা পাইয়া নিশ্চিন্ত হইল। এই দাঙ্গার ফলে অধিকাংশ হতাহত ব্যক্তিই মুসলমান, কয়েকটি হিন্দু হতাহত হইয়াছিল। কয়েকদিন মাত্র পূর্ব্বে যে শান্তি এই নগরীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল হঠাৎ সেই শান্তি ভগ্ন করার সম্পূর্ণ অপরাধ হিন্দুদিগের। ১লা সেপ্টেম্বর কলিকাতাবাসী হিন্দুদিগের এক কলঙ্কের দিন।

(৪৩)

১২ই সেপ্টেম্বর, শুক্রবার। আজ প্রায় এক মাস হইল ডাক্তারবাবুর স্ত্রী দেহত্যাগ করিয়াছেন, আমি নিত্যই অপরাহ্নকালে ডাক্তারবাবুর নিকট যাইয়া বসিতেছি, অভ্যাসমত নানাবিধ কথাবার্ত্তা হইতেছে। ডাক্তারবাবুর রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে, জল সঞ্চিত হওয়ায় উদরটি অত্যন্ত স্ফীত পরিলক্ষিত হইতেছে। তাঁহার স্ত্রীর শ্রাদ্ধের আয়োজন যথা সময়ে হইল, ডাক্তারবাবুর উৎসাহের সীমা নাই। মুহুর্ম্মুহুঃ পুত্রগণকে ডাকিতেছেন, শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ ও আত্মীয়স্বজন ভোজন করাইবার তালিকা করিতেছেন, যে সমস্ত দ্রব্যাদি আহার করিতে স্ত্রী ভালবাসিতেন তাহা মনে পড়িতেছে আর তালিকাভুক্ত করা হইতেছে। জীবনের সমস্ত অভাব যেন এই শ্রাদ্ধবিধানের দ্বারা ভুলিবার একটা ক্ষীণ প্রচেষ্টা!

আনন্দ ও শোক উভয়ের কেহই সীমাবদ্ধ নহে, সুতরাং তাহাদের প্রবাহের সময় অপরিমিত ব্যয় করিয়া মানুষের মন যেন তৃপ্তি লাভ করে। আমাকে এক একবার ডাকিয়া শ্রাদ্ধের আয়োজনের কথা ডাক্তারবাবু শুনাইতেছেন, আমি তাঁহার মনের অবস্থা বিবেচনা করিয়া অতি সংযত ভাষায় ব্যয়বাহুল্য করা উচিত নহে বলিতেছি। শ্রীভাগবতে শ্রীনারদ যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন "শ্রাদ্ধে কুর্য্যাৎ ন বিস্তরং" (শ্রাদ্ধে অধিক ব্যয় করা উচিত নহে) তাহা ডাক্তারবাবুকে শুনাইলাম, আরও বলিলাম, পরলোকগতা মহিলা লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য সফল করিয়া গিয়াছেন, শোকোৎসবের তীব্র বাহুল্য তাঁহার রুচিকর অথবা স্বভাবের অনুকূল হইবে না। শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সাত্ত্বিকবিধি, রাজসিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন জনসমাগম অথবা ভোজন বিলাসের দ্বারা এই সাত্ত্বিক বিধিপালনের বিঘ্ন উপস্থিত হয়, তখন এই বিধি রাজসিক অথবা তামসিক অবস্থায় পর্য্যবসিত হইবার আশঙ্কা থাকে। ডাক্তার-বাবু আমার সমস্ত কথাই শান্তভাবে শ্রবণ করিতেন, আমার উপর তাঁহার অসীম প্রীতি ও বিশ্বাস ছিল, কোন কথার বিশেষ প্রতিবাদ করিতেন না। পরদিন আমাকে বলিলেন—"হ্যাঁ, ছেলেদের বলে দিয়েছি, আপনি যেমন বল্লেন সেই রকমই হবে, বেশী কিছু হবে না।" কিন্তু কার্য্যতঃ তাঁহার নির্দ্দেশে তাঁহার অপরিমিত শোকের মতই অপরিমিত ব্যয় হইল। আমি আত্মীয় ও নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের ভোজনের দিন সন্ধ্যাবেলা ডাক্তারবাবুর কাছে যাইয়া বসিলাম, সমস্ত কার্য্য পরিলক্ষণ করিলাম, পুনঃ পুনঃ তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে জানাইলাম নির্ব্বিঘ্নে সমস্ত কার্য্যগুলি সুশৃঙ্খলতার সহিত নিষ্পন্ন হইতেছে। তাঁহার উৎকণ্ঠিত হৃদয় শান্ত হইতেছে দেখিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। ডাক্তার-বাবুর নিজের শারীরিক অবস্থা সম্বন্ধে সেই রাত্রিতে যে আশঙ্কা সকলের

হৃদয়ে ছিল তাহা দূরীভূত হইল, ভগবানের দয়ায় শ্রাদ্ধের কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইল।

(৪৪)

১২ই সেপ্টেম্বর, শুক্রবার। আজ প্রায় একমাস হইতে লক্ষ্য করিতেছি ডাক্তারবাবুর মন কোনও সামান্য ব্যাপারকে অবলম্বন করিয়া সময় সময় বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে। ডাক্তারবাবুকে সাধারণতঃ বিরক্তি প্রকাশ করিতে দেখি নাই, বিশেষতঃ আত্মীয়স্বজনের প্রতি তিনি সর্ব্বদাই স্নেহপ্রবণ ও করুণাপূর্ণ ব্যবহার করিতেন। আজকাল ২।১ ক্ষেত্রে এই স্বভাবের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতেছি। ৩১শে আগষ্ট, রবিবার, ঝুলন-পূর্ণিমা। সেইদিন সন্ধ্যাবেলা ডাক্তারবাবুর ঘরে প্রবেশ করিয়াছি, তখনও চেয়ারে বসি নাই. তিনি আমাকে বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন—"আজ নারায়ণকে তুলসী দেওয়া হল না,—সবাই কাজে ব্যস্ত।" কিছুদিন হইতে আমার পরামর্শমত ডাক্তারবাবুর শারীরিক কল্যাণের জন্য প্রতি পূর্ণিমা ও সংক্রান্তির দিনে শ্রীনারায়ণকে তুলসী দেওয়া হইতেছিল, এই ব্যবস্থা তাঁহার পরলোকগতা স্ত্রী করিয়া গিয়াছিলেন। তুলসী দেওয়ার উপর ডাক্তারবাবুর বড়ই বিশ্বাস ছিল এবং এই দিনটির জন্য তিনি অপেক্ষা করিয়া থাকিতেন। এই সম্বন্ধে কথা মধ্যে মধ্যে হইত এবং তাঁহাকে তুলসী দিবার যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলাম তাহা তিনি বারংবার শুনিতে ভালবাসিতেন। আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম যে লোকে রোগ শান্তির জন্য গ্রহদেবতার পূজা করে, দানধ্যান করে, কত যজ্ঞক্রিয়া প্রভৃতির ব্যবস্থাও আমাদের শাস্ত্রে আছে। কিন্তু এই সমস্ত ব্যাপার কেবল যে ব্যয়সাধ্য তাহাই নহে, শাস্ত্রীয় মন্ত্রাদির বিশুদ্ধ উচ্চারণের উপর ইহার ক্রিয়াশক্তি নির্ভর করিয়া থাকে। কিন্তু সেরূপ ক্রিয়াকুশল

পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণ সচরাচর পরিদৃষ্ট হয় না। কিন্তু শ্রীনারায়ণের চরণে তুলসীপ্রদান করিলে তাহাতেও সর্ব্বদেবতার পূজা হয়, সকল গ্রহশান্তি হয়, সমস্ত যজ্ঞের ফলপ্রাপ্তি হয়, রোগশোকের প্রতিবিধান হয়। এই প্রসঙ্গে ডাক্তারবাবুকে আমি শ্রীভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোকটি শুনাইয়াছিলাম ঃ

যথা তরোর্মূল নিষেচনেন,
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভূজোপশাখাঃ,
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়ানাং
তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা।

[অর্থাৎ যেমন তরুর মূলদেশে জল দিলেই তাহার কাণ্ড-শাখা-প্রশাখার তৃপ্তি হয়, মুখ দিয়া অন্ন খাইলে চক্ষু কর্ণ ইত্যাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের পুষ্টিসাধিত হয়, তেমনই শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিলে সকল দেবতার পূজা করা হয়, সকলেই সন্তুষ্ট হন]। এই কথাগুলি ডাক্তারবাবুর বড়ই ভাল লাগিয়াছিল, তিনি মধ্যে মধ্যে এই শ্লোকটি শুনিতে চাহিতেন এবং আমাকে বলিতেন—“আপনি বলেছেন নারায়ণের পূজাতেই সব দেবতার সবগ্রহের পূজা, আমার সেই ভরসা।” ৩১শে আগষ্ট ঝুলনপূর্ণিমা ছিল, শ্রীকৃষ্ণের বড়ই আনন্দের দিন। আজ কিন্তু তুলসী না দেওয়ায় ডাক্তার-বাবুর ধৈর্য্যচ্যুতি পুনঃ পুনঃ লক্ষ্য করিলাম। আজ তাঁহার স্ত্রী নাই, তাঁহার কল্যাণের সতর্ক প্রহরী মৃত্যুর আদেশে অপসারিত, আজ অপর সকলেই যেন তাঁহার প্রতি উদাসীন—মনের এই অভিমান তাঁহার সমস্ত কথার ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইতেছিল। তিনি অনেকবার বিরক্তি-পূর্ণকণ্ঠে বলিলেন—“সবাই কাজে ব্যস্ত।” আমি জিজ্ঞাসা করিলাম “এমন কি কাজ থাকিতে পারে যাহাতে তুলসী দিবার পর্য্যন্ত অবসর হয়

না? এই পূজার কোন আড়ম্বর নাই, বিশেষ আয়োজনও নাই। নিজের বাটীতে স্থানাভাব হইলে পুরোহিত বাটীতেও তুলসী নিবেদিত হইতে পারে; আমার বাবা পুরোহিতের বাটীতেই তুলসী দিবার ব্যবস্থা অনেকদিন যাবৎ করিয়াছিলেন আমি দেখিয়াছি।" অবশেষে ডাক্তারবাবুর বিরক্তি ও উত্তেজনা লক্ষ্য করিয়া আমি তাঁহার মনকে অন্যপ্রসঙ্গে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু অনন্ত সহনশীল ডাক্তারবাবু পরিজন-বর্গের এই ত্রুটি কিছুতেই ভুলিতে চাহিলেন না। তাঁহার বাড়ীতে আজকাল শতদলনাম্নী তাঁহার ভাগিনেয়ী সমস্ত গৃহকার্য্যের ব্যবস্থা করেন। এই বিধবা মহিলা ডাক্তারবাবুর সংসারে বহুদিন আছেন, সুশৃঙ্খলার সহিত কার্য্য করিবার শক্তি ইঁহার অসীম। ইঁহার বিশ্রাম নাই, সর্ব্বদাই নানাবিধ সাংসারিক কার্য্য ইনি অক্লান্ত হৃদয়ে সম্পাদন করিয়া থাকেন। ডাক্তারবাবুর কথাবার্ত্তায় বুঝিলাম যে তুলসী না দেওয়ায় ডাক্তারবাবুর নৈরাশ্য ও বেদনা বিশেষ করিয়া এই মহিলার প্রতিই বিরক্তিরূপে বারংবার প্রকাশিত হইতেছে। তিনি এই মহিলাকে উপরে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং তুলসী দিবার বিধিসম্বন্ধে সমস্ত কথা তাঁহার সম্মুখে আমাকে বলিতে বলিলেন। এই মহিলা পূর্ব্বে কখনও আমার সহিত কথাবার্ত্তা কহেন নাই, সুতরাং আমি সঙ্কুচিত হইলাম, তাঁহাকে আহ্বান করিতে বারণ করিলাম, কিন্তু ডাক্তারবাবু আমার কথা শুনিলেন না। এই মহিলা আসিয়া উপস্থিত হইলেন, আমি ভাবিলাম যাহা বলিবার ডাক্তারবাবুই বলিবেন, কিন্তু তাহা হইল না, ডাক্তারবাবু আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সুতরাং আমি ধীরে ধীরে এই মহিলাকে আমার সমস্ত কথাগুলি বলিলাম। তিনি উত্তর দিলেন ডাক্তারবাবুর স্ত্রীর শ্রাদ্ধোপলক্ষ্যে প্রতিবাসীগণের বাড়ী হইতে আনীত বাসনপত্র গোছান ও পাঠান লইয়া তিনি বড়ই ব্যস্ত ছিলেন, তুলসী দিবার ব্যবস্থা করিয়া

উঠিতে পারেন নাই। আমি তাঁহার কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলাম—আজ বাসন গোছান ও দেওয়া বড় কাজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, আর যাঁহার মৃত্যু নিকট হইতে নিকটতর হইতেছে, যাঁহার বলিষ্ঠ স্কন্ধের উপর এই সংসারের গুরুভার অর্পিত, তাঁহার দেহ ও মনের কল্যাণের জন্য শ্রীনারায়ণের উদ্দেশে বিধিপালনের সময়ের অভাব! বাড়ীতে ইনিই একমাত্র মহিলা নহেন, আরও অনেক গৃহিণীস্থানীয়া মহিলা এই বাটীতে উপস্থিত। যিনি সময়ের অভাবের কথা আমাকে শুনাইলেন এই বর্ষিয়সী মহিলা বুদ্ধিমতী ও অশেষ সেবাপরায়ণা তথাপি ঘনায়মান বিপদের মধ্যে তাঁহার বুদ্ধিভ্রংশ হইল। আমি দেখিলাম সব কাজের উপরের কাজ এই বাটীর পরিজনবর্গ আজ বিস্মৃত হইয়াছেন, এই লক্ষণ শুভজনক নহে। পরিশেষে শতদল বলিলেন "আর ১৫।১৬ দিন পরেই সংক্রান্তি, সেইদিন তুলসী দেওয়া হবে, আর বাদ পড়বে না।" তাঁহার সেই কথা শুনিয়া আমার হঠাৎ মনে হইল সেই সংক্রান্তি হয়ত ডাক্তার-বাবুর জীবনে আর আসিবে না, যাহা আজ ভুল হইল সেই মর্ম্মান্তিক ভুল চিরদিনের জন্য তাঁহাদের স্মৃতিতে থাকিয়া যাইবে।

আর একদিনের কথা। পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি কিছুদিন হইতে সামান্য কোন ব্যাপারকে উপলক্ষ্য করিয়া ডাক্তারবাবুর মন ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিতেছে। ইহা অনেক সময় মৃত্যুর পূর্ব্বাভাষ। দেখা যায় মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে কোন কোন ভাগ্যবান ব্যক্তি বিষয় ও আত্মীয়স্বজন হইতে দূরে সরিয়া যান, কারণ অথবা অকারণে বিরক্তি প্রকাশেই মনের এই অবস্থাটি ধরা পড়ে। ডাক্তারবাবুর স্নেহপ্রবণ মন সাধারণতঃ আত্মীয়স্বজন পরিবেষ্টিত হইয়া থাকিতে ভালবাসিত। কতদিন দেখিয়াছি মনু, শান্তা, জয়া তাঁহার পদসেবা করিতেছে, কেহ বা বাতাস করিতেছে, কেহ বা কাছে বসিয়া আছে। সেবা গ্রহণটাই তাঁহার নিকট বড় জিনিষ ছিল না, কাছে

সকলে থাকিবে, একটি স্নেহ ও প্রীতির চিত্রের অংশরূপে তিনি রহিয়াছেন, —ইহাই দেখিতে ডাক্তারবাবু ভালবাসিতেন। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বেও শুনিয়াছি তিনি "রমা কোথায়", "নেড়া কোথায়" বলিয়া সকলকে আহ্বান করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যুর পর প্রায় মাসাধিক হইতে চলিল, আজকাল এই মেয়েগুলিকে সেবা করিতে আসিতে দেখি না, তাহারা স্বেচ্ছায় আসে না অথবা ডাক্তারবাবু তাহাদের সেবা গ্রহণ করেন না তাহা আমি জানি না, কিন্তু কতদিন এই সম্বন্ধে আমি কত কি ভাবিয়াছি। একদিন অপরাহ্ণকালে আমি তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিলাম, তিনি একাকী শয়ন করিয়া আছেন, সাধারণতঃ যে প্রীতি ও স্নেহের আহ্বান শুনিতাম —"আসুন, প্রফেসার সাহেব"—তাহা আজ শুনিলাম না। লক্ষ্য করিলাম তাঁহার ভ্রূ-যুগল কুঞ্চিত, মুখে বিরক্তির অভিব্যক্তি, হয়ত শারীরিক যন্ত্রণাও ছিল। "কেমন আছেন" জিজ্ঞাসা করিবামাত্র ডাক্তারবাবু বলিলেন— "আর কেমন আছি! এখন গেলেই বাঁচি।" সাধারণতঃ এইরূপ বিরক্তি ও নৈরাশ্যের কথা তিনি বলিতেন না। আমি বুঝিলাম কি একটা ব্যাপার তাঁহার মনকে আচ্ছন্ন করিয়াছে যে জন্য সেক্ষপীয়রের ভাষায় "This noble vessel is full of grief"। যে পুরুষ-সিংহ একদিন গভর্ণমেণ্টের উচ্চপদে সমারূঢ় হইয়া শত শত লোকের উপর আধিপত্য করিয়াছেন, যাঁহার আদেশে এতবড় একটা সংসার সহজ ও সরল পথে পরিচালিত হইত, যাঁহার সুগঠিত বলিষ্ঠ দেহ একদিন দুরূহ পর্ব্বতের কত পথ লঙ্ঘন করিয়াও অবসন্ন হয় নাই, যাঁহার স্নেহ ও পরোপকার শক্তির ছায়ায় আশ্রয় লইয়া আমি কত দুঃখের দিন অনায়াসে অতিবাহিত করিয়াছি, সেই মহা-বলিষ্ঠ ও মহাপ্রাণ ব্যক্তি আজ বিরক্ত ও সংসার যাত্রাপথে অবসন্ন! আমার দুঃখ হইল, আমি দৃঢ়কণ্ঠে তাঁহাকে বলিলাম—"আপনি ও কথা বলবেন না। আপনি বেঁচে থাকুন, আপনার ছেলেমেয়েদের তো ভরসাই, আমি আপনার

আত্মীয় নই, কিন্তু আমিও আপনার ভরসা অনেক রাখি। তা ছাড়া আপনি বেঁচে আছেন, এই বাড়ী উজ্জ্বল হয়ে আছে। আজ বিছানায় শুয়ে, উঠতে পারছেন না, তবু এ-বাড়ীর গৌরব অক্ষুণ্ণ আছে। আপনি পরমুখাপেক্ষী নন, আজ এই অক্ষম অবস্থাতেও প্রতি মুহূর্ত্তে আপনি অর্থোপার্জ্জন কর্চ্ছেন। বৃদ্ধ বয়সে মানুষকে ছেলেদের উপার্জ্জনের উপর নির্ভর করতে হয়, এতে কোন লজ্জা নেই, কিন্তু তাও আপনি করেন না। ছেলেরা যদি কিছু আপনার হাতে তুলে দেয় সে তাদের সৌভাগ্য, আপনার নয়, আপনি কোন প্রয়োজনের অধীন নন। একদিন শচীন্দ্রবাবু ২৫৲ টাকা দিয়ে আপনাকে এক জোড়া জুতো কিনে দিয়েছিলেন, আপনি কত আনন্দ করেছিলেন, আমার এখনও মনে আছে—সেটা শচীন্দ্রবাবুর সৌভাগ্য। তপেন্দ্রবাবু শীতের সময় একটা উলের গেঞ্জি কিনে দিয়েছিলেন সেই গেঞ্জি পরে এসে সান্ন্যালমশাই, সুরেশবাবু ও আমাকে আপনি দেখিয়েছিলেন, যেন বালকের মত সুখী হয়েছিলেন—সে তপেন্দ্রবাবুর সৌভাগ্য। আপনি নিজের ভাগ্যবলে এখনও নিজের ভরণপোষণ কর্চ্ছেন। "গেলেই বাঁচি" —ওকথা আপনি বলবেন না, ওকথা আমরা শুনব না।" ডাক্তারবাবু আমার কথাগুলি শুনিলেন, আমার মনে হইল যেন তাঁহার মনের ভার কাটিয়া গিয়াছে, আমরা উভয়ে অন্যকথায় মনোনিবেশ করিলাম। বাড়ী ফিরিয়া কেবলই মনে হইতে লাগিল, একথা কেন—"এখন গেলেই বাঁচি!" এই বিষয়-বিরক্তি কি চিরবিদায়ের পূর্ব্বাভাষ?

আজ ১২ই সেপ্টেম্বর, শুক্রবার, ডাক্তারবাবুর মৃত্যুর পূর্ব্বদিন। বিকালবেলা ডাক্তারবাবুর কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র তিনি বলিলেন "আজ আমার মনটা বড়ই চঞ্চল, তপু এখনও আপিষ থেকে ফেরেনি।" তখন বুঝি নাই যে পরদিন ঠিক এই সময়েই ডাক্তারবাবু ইহসংসার হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিবেন তাই আজ একটা অতি তুচ্ছতম

কারণকে অবলম্বন করিয়া মন চঞ্চল ও অস্থির। আমি বলিলাম "এখনও তপেন্দ্রবাবুর ফিরিবার সময় হয় নাই, তিনি সাধারণতঃ বাজার করিয়া ফিরেন সেই জন্যও দেরী হইতে পারে; আজকাল কোন দাঙ্গাহাঙ্গামাও নাই সুতরাং চিন্তিত হইবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। কিন্তু আমার কথাগুলি তাঁহার মনে লাগিল না, তিনি বারংবার শয্যার উপর অস্থিরভাবে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে লাগিলেন এবং মধ্যে মধ্যে বলিতে লাগিলেন "তপু এখনও এলো না, মনটা খারাপ হচ্ছে।" পূর্ব্বে আর একদিন তপেন্দ্রবাবুর আপিষ হইতে ফিরিবার দেরী হওয়ায় তিনি মনের অস্থিরতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমি ডাক্তারবাবুকে দৃঢ়কণ্ঠে বলিলাম—"আপনি ভাবছেন কেন? আপনি যতদিন আছেন ততদিন আপনার কোন ছেলের গায়ে একটি আঁচড়ও লাগবে না। আপনি এমন কোন অন্যায় কাজ করেন নি যে আপনার এই অসুস্থতার সময় নিজের দুঃখের ওপর আবার ছেলেদের জন্যে কোন দুঃখ আপনাকে ভোগ কর্ত্তে হবে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি তো একথা আর একদিন আপনাকে বলেছি।" পূর্ব্বদিন ডাক্তারবাবু আমার কথা শুনিয়া অন্ততঃ বাহ্যতঃ স্থির হইয়াছিলেন কিন্তু আজ কিছুতেই স্থির হইলেন না, বারংবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন "তপু এলো কি?" সেদিন বুঝি নাই কিন্তু পরে বুঝিয়াছিলাম যে তপেন্দ্রবাবুর আপিষ হইতে ফিরিবার দেরীটাই মনের এই অস্বাভাবিক ব্যাকুলতার কারণ নহে—কারণ অন্য এবং আরও গভীর। আগামীকল্য অর্থাৎ ২৪ঘণ্টার মধ্যেই মহাকাল আসিয়া উপস্থিত হইবে, তাহার আগমনের পূর্ব্বাভাষস্বরূপ মনের উপর এই দুশ্চিন্তার ছায়া। কিছুক্ষণ পরে তপেন্দ্রবাবু আপিষ হইতে ফিরিয়া আসিলেন, তিনি কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র ডাক্তারবাবু উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন "আঃ, বাবা এলি, বাঁচলাম।

গা ধুয়ে এসে বস।" তপেন্দ্রবাবু দেরীর কি একটা সঙ্গত কারণ প্রদর্শন করিলেন, ডাক্তারবাবু নীরবে শ্রবণ করিলেন। তখন মৃত্যুর ছায়াপাত মনের উপর আরম্ভ হইয়াছে, একদিকে গৃহ ও পরিজন এই সত্তর বৎসরের দৃঢ় বন্ধনে আকর্ষণ করিতেছে, অন্যদিকে মহাকালের অমোঘ ভেরী নিনাদিত হইতেছে, মধ্যস্থলে ভীরু মানবহৃদয় এই দ্বন্দের মধ্যে পড়িয়া দুরুদুরু কম্পিত হইতেছে—ইহাই সেদিনকার এই ঘটনার অপূর্ব্ব রহস্য। এইবার ডাক্তারবাবু নিশ্চিন্তমনে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া শয়ন করিলেন, আমি ধীরে ধীরে তাঁহার কক্ষ পরিত্যাগ করিলাম।

১৩ই সেপ্টেম্বর, ২৭শে শ্রাবণ শনিবার। বেলা প্রায় ১১টার সময় আমি স্নান করিতে আরম্ভ করিয়াছি এমন সময় দ্বারদেশে করাঘাত শুনিয়া অর্দ্ধসিক্ত অবস্থায় দ্বার উন্মোচন করিবামাত্র ডাক্তার বাবুর দৌহিত্র বরুণ আমাকে বলিল ডাক্তারবাবু আমাকে তখনই একবার দেখা করিতে ডাকিতেছেন। আমি নিজের সিক্তদেহ ও বস্ত্রের প্রতি বরুণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিলাম, স্নান সমাপন করিয়া দেখা করিতে যাইব। বরুণ বলিল চিকিৎসক দাঁড়াইয়া আছেন, আমাকে কি জিজ্ঞাসা করিবার জন্য ডাক্তারবাবু তখনই আমাকে ডাকিতেছেন। আমি অর্দ্ধস্নাত অবস্থায় গামছাটি গায়ে দিয়া তৎক্ষণাৎ ডাক্তারবাবুর কক্ষে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। ডাক্তার মল্লিক সেইমাত্র ইনজেকসন দেওয়া শেষ করিয়াছেন। আমি জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে মুখের দিকে চাহিবামাত্র রোগী আমাকে বলিলেন "কালকে রবিবার, অমাবস্যা। কালকে ট্যাপ করে পেটের জল বার করা হবে, না, সোমবারে হবে বলুন।" আমি পূর্ব্বে অনেকবার লিপিবদ্ধ করিয়াছি রোগীর আমার উপর অসাধারণ বিশ্বাস ছিল, আমাকে অত্যন্ত স্নেহ ও প্রীতি করিতেন

বলিয়া আমার পরামর্শ অনেক ক্ষেত্রে জিজ্ঞাসা করিতেন। আজ কিন্তু তাঁহার কথা শুনিয়া আমি ইতস্ততঃ করিলাম, ভাবিলাম, চিকিৎসক যদি নিতান্ত প্রয়োজনীয় মনে করেন তাহা হইলে আগামী কল্যই জল বাহির করিতে হইবে, অমাবস্যা বলিয়া অপেক্ষা করিলে হয়ত দেরী হইয়া যাইবে। ইহা মনে করিয়া আমি ঈষৎ হাস্যসহকারে চিকিৎসকের মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলাম—"এ সব ক্ষেত্রে চিকিৎসকই বড় authority, বিশেষতঃ অমাবস্যা-পূর্ণিমার কুসংস্কার শুনলে এঁরা হয়ত হাসবেন।" আমার কথা শুনিয়া রোগী বলিলেন—"না, আপনিই বড় authority, যদি কালকে অমাবস্যার জন্যে আপত্তি থাকে তাহলে সোমবারে হবে।" তখন আমি চিকিৎসকের মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলাম—"যদি আপনি একান্ত প্রয়োজনীয় মনে করেন তাহলে কালকেই কর্ত্তে হবে, নয়ত রবিবার নিষ্ফলবার বলে একটা প্রচলিত কথা আছে, তা ছাড়া অমাবস্যা, সুতরাং সোমবার হলেই ভাল হয়। তবে আপনি চিকিৎসক, আপনি যা বলবেন তা আমাদের মেনে নিতেই হবে।" ডাক্তার মল্লিক বলিলেন—"না, একদিনের দেরীতে কিছু এসে যাবে না, সোমবারেই হবে। তবে ডাক্তার পাইনকে বেলা ২টার আগে পাওয়া যাবে না, হাসপাতালের কাজ সেরে এখানে আসবেন।" সুতরাং সোমবারে জল বাহির করাই স্থির হইল। ইহার পর আমি, বড় ডাক্তারবাবু, ডাক্তার মল্লিক সকলেই ডাক্তারদের সম্বন্ধে নানাবিধ হাস্যকৌতুকের গল্প করিলাম, আমি বলিলাম ডাক্তারেরা আমাদের মত জীবের বিশ্বাসগুলিকে কুসংস্কারের পর্য্যায়ভুক্ত করেন, সুতরাং অমাবস্যা-পূর্ণিমার কথা ডাক্তারদিগকে ভয়ে ভয়ে অতি সঙ্কোচের সহিত বলিতে হয়। রোগী নিজেও এই সমস্ত কৌতুকপূর্ণ কথাবার্ত্তায় যোগদান করিলেন। আমি বাটিতে ফিরিয়া আসিলাম।

বেলা প্রায় ২॥০টার সময় বাহিরের ঘরে বসিয়া কাজ করিতেছি. ডাক্তারবাবুর ঝি সিন্ধু আসিয়া সংবাদ দিল ডাক্তারবাবু অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন, পুত্রকন্যাগণ সেবা করিতেছে, চিকিৎসককে ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে। আমি তৎক্ষণাৎ রোগীর কক্ষে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, ডাক্তারবাবু শয্যার উপর শয়ন করিয়া আছেন, বাটির মেয়েরা সেবা করিতেছে, জ্যেষ্ঠভ্রাতা নরেন্দ্রবাবু চেয়ারে বসিয়া আছেন, পুত্র ধীরেন্দ্রবাবু কাছে দাঁড়াইয়া আছেন। কক্ষের বাহিরে যাইয়া শুনিলাম যে বেলা ১২টার সময় রোগী মলত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা করা হয় কিন্তু মলের পরিবর্ত্তে প্রচুর পরিমাণে চাপবদ্ধ রক্ত নির্গত হইল। আধঘণ্টা পরে পুনরায় সেই রক্তস্রাব। রোগীকে দেখিয়া অত্যন্ত দুর্ব্বল মনে হইল। ইতিমধ্যে ডাক্তার মল্লিক আসিয়া উপস্থিত হইলেন, রোগীর নাড়ি দেখিলেন, দ্রুতগতিতে ইনজেকসান দিলেন। রোগীর কোন চঞ্চলতা নাই, প্রশান্তমুখ, যন্ত্রণার বাহ্যপ্রকাশ কিছুমাত্র ছিল না। রোগী ডাক্তার মল্লিকের সহিত মৃদুকণ্ঠে কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন, একবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"Koramin ইনজেকসন দিলেন?" ডাক্তার মল্লিক সংক্ষেপে বলিলেন "হ্যাঁ"। এমন সময় জ্যেষ্ঠভ্রাতা নরেন্দ্রবাবু রোগীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "সুরেন, কেমন আছ? কি কষ্ট হচ্ছে?" রোগী একবার চক্ষু প্রসারিত করিয়া বড় ডাক্তারবাবুর মুখের দিকে চাহিলেন, কোন উত্তর দিলেন না। এই নিরুত্তরের অর্থ সহজেই বুঝা গেল। রোগী নিজে সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসরের অধিককাল গভর্ণমেণ্টের অধীনে চিকিৎসকের কার্য্য করিয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। আজ তাঁহার যাহা অবস্থা এইরূপ রোগী তিনি নিজে কত চিকিৎসা করিয়াছেন তাহা আমি তাঁহার মুখেই শুনিয়াছিলাম। চিকিৎসা শাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। নিজের শরীরের ভিতর যে ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছিল

এবং তাহার পরিণতি কি, রোগী ভালরূপেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, মৃত্যু শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন সুতরাং "কেমন আছ?" জিজ্ঞাসার আর কোন উত্তর দিলেন না। শুনিয়াছি শরীরের এই অবস্থায় পেটের ভিতর ভীষণ যন্ত্রণা হয়, অনেক রোগী যন্ত্রণার তাড়নায় চীৎকার করিয়া থাকে। কিন্তু এমন ধৈর্য্য কখনও দেখি নাই। কতদিন দেখিয়াছি যন্ত্রণা হইতেছে, আমার সহিত কথা-বার্ত্তা কহিতেছেন কচিৎ অস্ফুট বেদনাসূচক ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতেছে। আজ কিন্তু কোন অস্ফুট শব্দও ছিল না, নির্ব্বাক নিস্পন্দ হইয়া শুইয়া আছেন, ছেলেমেয়েদের সহিত ২।১টি কথা কহিতেছেন। একবার বলিলেন "নেড়া কই" "রমা কই", "সবাই কাছে বস।" নেড়াবাবু অর্থাৎ ধীরেন্দ্রবাবু তখন পিতাকে বাতাস করিতেছিলেন, তিনি বলিলেন "এই যে আমি, কি বলছেন?" বারংবার "কি বলছেন্" জিজ্ঞাসা করায় ডাক্তারবাবু বিরক্তি প্রকাশ করিলেন। বুঝিলাম বলিবার কিছুই ছিল না, মৃত্যুর পূর্ব্বে মায়ার শেষ আকর্ষণ, তাহার পরেই মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা। এইবার রোগী চক্ষু মুদ্রিত করিয়া যেন নিদ্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন, আমি বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

পুনরায় প্রায় ৪॥০টার সময় আমি ডাক্তারবাবুকে দেখিতে যাইলাম। শুনিলাম ইতিমধ্যে পুনরায় রক্তস্রাব হইয়াছে, নাড়ি নাই। রোগশয্যার চারিদিকে আত্মীয় পরিজন। আমি কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিবামাত্র বড়ডাক্তারবাবু আমাকে বলিলেন "নাড়ি দেখুন তো?" আমি পূর্ব্বেই লক্ষ্য করিয়াছিলাম নাভিশ্বাস আরম্ভ হইয়াছে সুতরাং নাড়ি দেখিবার কোন উৎসাহ প্রকাশ করিলাম না। বড়ডাক্তারবাবু স্নেহশীল জ্যেষ্ঠভ্রাতা, বিচক্ষণ চিকিৎসক কিন্তু আজ স্নেহ ও শোকের যুগপৎ সংঘাতে তিনি বুদ্ধি স্থির করিয়া নাড়ির গতি লক্ষ্য করিতে পারিতেছেন না, ভাবিতেছেন

হয়ত নাড়ি আছে। তাঁহার পুনঃ পুনঃ অনুরোধে আমি নাড়ি দেখিলাম, কিছুই নাই, মুমূর্ষু অবস্থা।

তখন আমি একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া মনে মনে আত্মার কল্যাণের জন্য শ্রীহরি স্মরণ করিতে লাগিলাম। বড়ই ইচ্ছা হইল আজ ডাক্তারবাবুর বহুবর্ষব্যাপী স্নেহের প্রতিদানস্বরূপ তাঁহার কর্ণে তারকব্রহ্মনাম শুনাইয়া দিই কিন্তু রোগীর শয্যার উপরে অনেক স্ত্রীলোক ও আত্মীয় পরিজন বসিয়া আছেন—সংসারের মায়ার চিরন্তন চিত্র, অনন্ত পথযাত্রীকে পথের সম্বল দিবার চিন্তা ও উৎসাহ কাহারও নাই। আমি অগ্রসর হইতে সঙ্কোচবোধ করিলাম, নীরবে দ্রুতগতিতে রোগীর কর্ণকুহর ও বক্ষ প্লাবিত করিয়া শ্রীহরিনাম ঢালিয়া দিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে সেই পূর্ব্বপরিচিত নারীকণ্ঠ শ্রুতিগোচর হইল—বড়ডাক্তারবাবুর স্ত্রী রমাকে বলিতেছেন,—"এখন কেঁদ না, বাবার শেষ কাজ কর, মুখে গঙ্গাজল দাও।" আমি দেখিলাম এই ধর্ম্মপরায়ণা মহিলা আত্মার চিরকল্যাণের জন্য সচেতন, আর সকলে জড়পিণ্ডের মত নিস্পন্দ হইয়া শোক করিতেছেন। পুনরায় শুনিলাম এই মহিলাই আমার পদধূলি লইয়া ছোটডাক্তারবাবুর মস্তকে দিবার জন্য নিজ স্বামীকে অনুরোধ করিলেন। আজ আমার চক্ষে জল আসিল, যে মহাপ্রাণ ব্যক্তির পদধূলি মস্তকে ধারণ করিলে আমি ধন্য হইব তাঁহারই মহাকালসংস্পৃষ্ট মস্তকে আমার মত ভজন-সাধনবিহীন ব্রাহ্মণের পদধূলি! আমি নীরবে সহ্য করিলাম। ভাবিলাম যে পরম পিতাকে স্মরণ করিয়া ইঁহারা ব্রাহ্মণের পদধূলি গ্রহণ করিতেছেন তাহা সার্থক হউক, ডাক্তারবাবু চিরশান্তি লাভ করুন।

কক্ষটি নিস্তব্ধ, মৃত্যুর আবির্ভাবে সমস্ত হৃদয় শঙ্কিত ও শোকার্ত্ত। ডাক্তারবাবুর শেষ মুহূর্ত্ত ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে সকলেই বুঝিতে

পারিয়াছেন। রোগীর আত্মীয় সুভাষচন্দ্র আমার নিকটে আসিয়া মৃদু-কণ্ঠে বলিল "ঘড়িটা দেখবেন", অর্থাৎ মৃত্যুর সময়টি যেন লক্ষ্য করা হয়। ইতিমধ্যে রোগী ধীরে ধীরে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া বালিশের উপর পা রাখিয়া শয়ন করিলেন—তাঁহার ধীর ও সংযত অঙ্গসঞ্চালন লক্ষ্য করিয়া সুস্পষ্টই বুঝা যাইল রোগী সম্পূর্ণ সচেতন। ইহার প্রায় পাঁচমিনিট পরে একখানি ক্ষুদ্র গীতা তাঁহার বক্ষের নিকট স্থাপিত হইল, যে মালায় তিনি শ্রীহরিনাম জপ করিতেন, আমার অনুরোধে জীবন-মরণের একমাত্র সম্বলস্বরূপ সেই মালাটিও ডাক্তারবাবুর হস্তে প্রদান করা হইল। ইতিমধ্যে কন্যা রমা পিতাকে জড়াইয়া উচ্চকণ্ঠে রোদন করিয়া উঠিল—"বাবা তুমি আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছ।" তখন অপরাহ্ণ ৫—১৮ (I.S.T.) মিনিট। ৬৯ বৎসর ২৮ দিন বয়সে অশেষ স্নেহশীল, মহাপ্রাণ, পুরুষ-সিংহ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।

ক্রমশঃ সন্ধ্যা হইয়া আসিল, শ্মশানযাত্রার আয়োজন হইতেছে। ঘরের মেজের উপর ডাক্তারবাবুর সুদীর্ঘ মৃতদেহ নিস্পন্দ হইয়া পড়িয়া আছে, চক্ষুদ্বয় নিমীলিত, মুখখানি বেশ প্রশান্ত দেখাইতেছে। আমি রাস্তার ধারে দ্বিতলের বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছি, এক একবার ঘরের ভিতরে চাহিয়া দেখিতেছি। চতুর্দ্দিকে আত্মীয়স্বজনেরা বসিয়া আছেন, ডাক্তারবাবুকে দেখিয়া নিদ্রিত বলিয়া ভ্রম হইতেছে,—পরিধানে শুভ্র বস্ত্র, ললাটে চন্দনবিন্দু। আমার মনে পড়িল গতকাল ঠিক এই সময়েই ডাক্তারবাবু আমার সহিত গল্প করিতেছিলেন। সন্ধ্যার পরে রায়বাহাদুর নগেন্দ্র দত্ত মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইনি ডাক্তারবাবুর বহু-দিনের বন্ধু, মৃত্যুসংবাদে দুঃখপ্রকাশ করিলেন। তাঁহার আপত্তি সত্ত্বেও আমি তাঁহাকে উপরের ঘরে লইয়া যাইলাম, ভাবিলাম এই বৈষ্ণবের পদধূলিস্পর্শে ডাক্তারবাবুর মহাযাত্রা সহজ ও সার্থক হইবে। শ্রীহরি-

নামের মালা জপ করিতে করিতে নগেন্দ্রবাবু উপরে উঠিলেন এবং ডাক্তারবাবুর মৃতদেহ দর্শন করিলেন। আমি একবার বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম, ডাক্তারবাবুর মৃত্যুসংবাদ পূর্ণিমা ও আরতি পূর্ব্বেই পাইয়াছিল, সকলেই দুঃখে মর্ম্মাহত। ডাক্তারবাবু আমাদের আত্মীয়ের মত ছিলেন, রাত্রিতে কাহারও আহারে রুচি হইল না, সেদিন মাংস রান্না হইয়াছিল, সমস্ত ফেলিয়া দেওয়া হইল। ইহার পরও চারদিন আমাদের বাড়ীতে মাছ আসে নাই, পরমাত্মীয় ডাক্তারবাবুর মৃত্যুতে আমরা স্বেচ্ছায় এই অশৌচের রীতি পালন করিলাম। ডাক্তারবাবুর স্ত্রীর মৃত্যুর পরও এইরূপ চারদিন আমরা কেহ আমিষভক্ষণ করি নাই। সেই রাত্রিতে জলস্পর্শ করিতেও আমার রুচি হইল না, আমি মেয়েদের একাকী থাকিবার উপদেশ দিয়া শবদেহের সহিত শ্মশানযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলাম।

(৪৫)

রাত্রি ৯টা—ডাক্তারবাবুর মৃতদেহ ধীরে ধীরে শ্মশান অভিমুখে যাত্রা করিল—সঙ্গে আত্মীয়স্বজন ও আমি। ডাক্তারবাবুর স্নেহনীড় পশ্চাতে পড়িয়া আছে, সমস্ত সুখদুঃখের বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া এই শিথিল ও অবসন্ন দেহ পুত্রগণের স্কন্ধে ২।১ পদ মাত্র অগ্রসর হইয়াছে, হঠাৎ রাত্রির অন্ধকার ও নিস্তব্ধতা খণ্ড বিখণ্ড করিয়া তাঁহার কন্যা রমার রোদনধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল—"মা, এত শীগগীর কেন বাবাকে ডেকে নিলে?" ডাক্তারবাবু ফিরিয়াও চাহিলেন না, কন্যার তীব্র ও করুণ কণ্ঠধ্বনি শূন্যে মিশাইয়া গেল, আমি শ্রীহরি স্মরণ করিয়া শবের অনুগমন করিলাম।

শ্মশান আজ দীপমালায় পরিশোভিত, শঙ্খঘণ্টাধ্বনিতে মুখরিত, সমবেত ভক্তকণ্ঠ শ্রীভূতেশ্বর মহাদেবকে মধুর স্বরে স্তব করিতেছে।

শুনিলাম আজ অঘোর চতুর্দ্দশী, পবিত্র দিন, সমস্ত রাত্রি প্রহরে প্রহরে শ্মশানেশ্বরের পূজা হইবে। শ্মশানের অধিপতি শ্রীভূতেশ্বরের দিকে মস্তক রাখিয়া রজ্জুশয্যায় ডাক্তারবাবু শুইয়া আছেন, মুখটি বক্ষের দিকে নামিয়া পড়িয়াছে। চিতাশয্যার আয়োজন হইতেছে, আমি একবার করিয়া শ্রীভূতেশ্বরের সম্মুখে যাইয়া দাঁড়াইতেছি, শবদেহের পদতলে শয্যাপ্রান্তে ডাক্তারবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র অতীন্দ্র বসিয়া আছে।

রাত্রি পৌনে এগারটা। শ্মশানে ২।৩টি চিতা জ্বলিতেছে, অদূরে একটি অল্পবয়স্কা সধবা স্ত্রীলোকের শবদেহ অপেক্ষা করিয়া আছে, মুখে যেন ভীতির চিহ্ন, একটি বালকের মৃতদেহ প্রায় ভস্মীভূত হইয়া আসিয়াছে, আর একটি অতি রুগ্না অস্থিসার স্ত্রীলোকের মৃতদেহ শ্মশানে আসিয়া উপস্থিত হইল। ডাক্তারবাবুর চিতা সাজান হইয়াছে, তাঁহার স্ত্রীর পার্শ্বেই এই চিতা—মধ্যে একটি ক্ষুদ্র পথের ব্যবধান। যে মুখ পুত্রকন্যাগণকে কত স্নেহের বচনে চিরদিন আদর করিয়াছে, দীর্ঘকাল রোগশয্যায় শয়ন করিয়াও যে মুখ হইতে কর্কশ বচন বাহির হইয়া কোন পুত্রকন্যাবধূগণের মনে বেদনার সৃষ্টি করে নাই, সেই পিতার চিরস্নেহকোমলমুখে জ্যেষ্ঠপুত্র শচীন্দ্রবাবু এইবার অগ্নিপ্রদান করিলেন। একদিন ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ঠিক এই স্থানেই আমিও শাস্ত্রের এই কঠিন বিধি পালন করিয়াছিলাম, যে প্রশ্ন ও সন্দেহ সেদিন মনে জাগিয়াছিল আজিও মনে সেই নীরব প্রশ্ন উদিত হইল। চিতার লেলিহান অগ্নি শবদেহের প্রান্তভাগ অধিকার করিয়া শত শত জিহ্বা প্রসারিত করিয়া ক্রমশঃ ঊর্দ্ধদিকে অগ্রসর হইল।

শ্মশানে চিতা জ্বলিতেছে, আমি অদূরে বসিয়া ভাবিতেছি, এক একবার উঠিয়া শ্রীভূতেশ্বরকে প্রণাম করিয়া আসিতেছি। আজ কত কথাই মনে পড়িতেছে। এই ডাক্তারবাবু কলিকাতার এক বিশিষ্ট অভিজাতবংশে

জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—আভিজাত্যের অভিমান তাঁহার ছিল, আভিজাত্যের আচার ব্যবহার ও সংযম তাঁহার প্রতি বাক্য ও কার্য্যে পরিলক্ষিত হইত। মলিন অথবা জীর্ণ বস্ত্রাদি তাঁহাকে কখনও পরিধান করিতে দেখি নাই। নিতান্ত কার্য্যোপরোধ ব্যতীত তিনি সাধারণতঃ বাটীর বাহিরে যাইতেন না, তথাপি নিত্য ক্ষৌরকার্য্যের দ্বারা তাঁহার মুখ কোমল ও মসৃণ দেখাইত। শুভ্র বসন ও কুঞ্চিত পাঞ্জাবী তাঁহার দেহে সর্ব্বদাই লক্ষ্য করিতাম। ডাক্তারবাবুর আত্মীয় ও সমবয়স্ক বন্ধু অপূর্ব্ববাবু এই বিষয়ে সম্পূর্ণ বিপরীত; আমি নিজেও বাড়ীতে বেশভূষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। আমি ডাক্তারবাবুর শুভ্র বসন দেখিয়া নিজেদের সহিত তুলনা করিয়া কৌতুক সহকারে বলিতাম—"অপূর্ব্ববাবু, আপনাকে দেখে আমি সাহস পাই, দাড়ি আর ময়লা কাপড়ে দুজনেই আমরা ছোটলোক, নয়ত একলা ডাক্তারবাবুর কাছে বসতে ভয় হয়। লোকে ভাবে আমরা ডাক্তারবাবুর গোমস্তা।" ডাক্তারবাবু হাসিতেন। অন্যায় কার্য্য করিতে তিনি ভয় পাইতেন, বহুদিন গভর্ণমেণ্টের চাকুরী করিয়াছিলেন, অন্যায়রূপে অর্থোপার্জ্জনের উপায় তাঁহার নিকট কত সময় উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু আভিজাত্যের অহঙ্কার তাঁহাকে এই নীচতা হইতে সর্ব্বদাই রক্ষা করিয়াছে। বেশভূষার পারিপাট্য ও চরিত্রের পবিত্র সংযম—ইহাই আভিজাত্যের গৌরব। আজ ডাক্তারবাবুর দীনশয্যা ও দীনবেশ লক্ষ্য করিয়া আমার সেই কথাই বারংবার মনে পড়িতে লাগিল। হাস্য-কৌতুক করিবার ও তাহা শুনিয়া উপভোগ করিবার শক্তি এই ডাক্তারবাবুর কতবার লক্ষ্য করিয়াছি তাহা মনে পড়িতেছিল। ডাক্তারী পড়িবার সময় বন্ধুবান্ধবগণের সহিত "গিরীশের" দোকানে মাংস ও পরোটা খাইতেন, সেখানের কোন কোন লোকের অথবা দোকানদারের বর্ণনা, নিজেদের কথাবার্ত্তা, সমস্তই এমন ভাব ও ভঙ্গী সহকারে বর্ণনা করিতেন

যে আমি সমগ্র চিত্রটা চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পাইতাম, হাসির উচ্চ-কণ্ঠে তাঁহার বাহিরের ঘরটি মুখরিত হইয়া উঠিত। তখন ডাক্তারবাবুর নূতন বিবাহ হইয়াছে, তাঁহার শ্বশুরবাড়ী ও বন্ধু শ্রীসদানন্দ পালিতের শ্বশুরবাড়ী কাছাকাছি। শনিবাব অপরাহ্নে শ্বশুরবাড়ী যাইবার জন্য উভয় বন্ধুতেই প্রস্তুত হইতেছেন, বেশভূষার পারিপাট্যের প্রতিযোগিতা চলিতেছে, কিছুতেই ঠিক নূতন শ্বশুরবাড়ীব মত বেশভূষা হইয়া উঠিতেছে না। আমি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"এতো সেজেগুজে, নূতন জামাই, নিশ্চয়ই ভাল ঘোড়ার গাড়ি করে গেলেন?" ডাক্তারবাবু উত্তর দিলেন —"হুঁঃ, গাড়ি? অত পয়সা কোথায়? দুজনে ট্রামে উঠে গেলাম, হেদোর কাছে নেমে দু'জনে শেয়ারে প্রত্যেকে ৵০ আনা দিয়ে ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া কর্ল্লাম, আর সদানন্দকে শ্বশুরবাড়ীতে নামিয়ে দিয়ে, আমি গাড়ি করে শ্বশুরবাড়ী হাজির হলাম।" আমি কৌতুক করিয়া বলিলাম —"তা ট্রামে গেলেই হত—৵০ আনা খরচই বা কেন?" ডাক্তারবাবু বলিলেন—"গাড়ি করে না গেলে রাবড়ি খেতে দেবে কেন, দুধ দিত তাহলে।" একবার অপূর্ব্ববাবুর অসুখ হইয়াছিল, তিনি ৩।৪ দিন পরে ডাক্তারবাবুর বাড়ীতে আসিলেন, তখনও বেশ দুর্ব্বল। ডাক্তারবাবু হাসিতে হাসিতে অপূর্ব্ববাবুকে বলিলেন—"দেখ অপূর্ব্ব, তোমার অসুখ হলেই আমার ভয় হয়, তুমি দু-মাসের বড়, তুমি গেলেই তারপর আমি। তাই তোমার অসুখ শুনে আমার ভয় হয়েছিল।" এইরূপ কত হাসির কথা ডাক্তারবাবুর মুখে শুনিয়াছিলাম তাহা আজ মনে পড়িতে লাগিল। আমি ভাবিলাম সেই হাস্যমুখর মুখ এখন চিরনীরব, আমি দেখিলাম সেই কৌতুকদীপ্ত চিরপ্রসন্ন মুখখানি চিতাগ্নির উত্তাপে শুষ্ক ও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া আসিতেছে।

চিতার অগ্নি এইবার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়াছে, কিন্তু মুখখানি এখনও স্পর্শ করে নাই। আমি বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছি, ডাক্তারবাবুর কত

নূতন ও পুরাতন কথা মনে পড়িতেছে, চরিত্রের কত বিশিষ্টতা চক্ষের সম্মুখ দিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে। এই ডাক্তারবাবু বড়ই আত্মীয়বৎসল ছিলেন। "সর্ব্বঃ কান্তং আত্মীয়ং পশ্যতি" (সকলে নিজের আত্মীয়কে সুন্দর দেখে)—কালিদাসের এই কথাটি ডাক্তারবাবুর সম্বন্ধে বিশেষভাবে সত্য ছিল। তিনি পুত্রকন্যাগণের দোষ দেখিতে পাইতেন না, অন্য কেহ দোষের কথা বলিলে সহ্য করিতে পারিতেন না। একদিন অসুস্থতার মধ্যে বড়ডাক্তারবাবু ও আমি বসিয়া আছি, ছোটডাক্তারবাবু বলিলেন—"আজ আমার স্ত্রী একা উঠে বাহিরে যাবার সময় দুর্ব্বলতার জন্যে পড়ে গিয়ে কপালে লেগেছে।" বড় ডাক্তারবাবু বলিলেন—"এতো অন্যায়! ছেলেমেয়েরা সর্ব্বদা কেউ কাছে থাকতে পারে না? বাড়ীতে এতগুলো লোক একা উঠতে দেয় কেন?" তৎক্ষণাৎ ছোটডাক্তারবাবু বিরক্তি-পূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন—"দেখো দাদা, ওদের যে কত কাজ তুমি জান না। আমরা দুজন রুগী দুই ঘরে—প্রত্যেক রুগীর জন্য কাজের শেষ নেই। তার ওপর রান্নাবান্নার কাজও রমাকে দেখতে হয়। মুখেই শুনতে ঠাকুর চাকর,—সংসারের কাজ কত তুমি বোঝ না।" আমি ডাক্তার-বাবুর এই অসহিষ্ণুতা দেখিয়া মনে মনে হাসিলাম। ডাক্তারবাবুর মুখে আত্মীয়স্বজনের প্রশংসা কতবার শুনিয়াছি তাহা মনে পড়িতেছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা নিকটেই বাস করেন, তাঁহার রন্ধন কার্য্যের সুখ্যাতি ডাক্তারবাবু প্রায়ই আমার নিকট করিতেন। বাড়ীতে মিষ্টান্ন পাক করা কঠিন কিন্তু সেই মিষ্টান্ন এই কন্যা এত সুন্দর প্রস্তুত করিতেন যে দোকানের খাবার পরিত্যাগ করিয়া ইঁহার প্রস্তুত ক্ষীরমোহন ডাক্তারবাবু রোগশয্যাতেও প্রায় প্রতিদিন গ্রহণ করিতেন, সাধারণ তরকারী ইঁহার নিকট চাহিয়া খাইতেন এবং আমি উপস্থিত থাকিলে শতমুখে এই রন্ধনকার্য্যের সুখ্যাতি করিতেন। দৌহিত্র অরুণ মানভূম জেলায়

ক্ষাটরাসগড়ে অধ্যাপকের কাজ পাইয়াছে, ডাক্তারবাবু আনন্দপ্রকাশ করিতেছেন। আমি ঈষৎ ভীতকণ্ঠে বলিলাম—"মফঃস্বলে প্রফেসারি, হয়ত সামান্য মাইনে, উন্নতিরই বা আশা কি?" তৎক্ষণাৎ ডাক্তারবাবু প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন—"না প্রফেসার সাহেব, এ চাকরী ভাল, grade আছে, তাছাড়া সেখানে থাকবার বাড়ী তৈরী হচ্ছে, খুব সুবিধা হবে।" থাকিবার বাড়ীটাই একটা মস্ত বড় সুবিধা বলিয়া দেখিতেছেন—তাঁহার স্নেহদৃষ্টির সম্মুখে দৌহিত্রের ভবিষ্যৎ উন্নতির উজ্জ্বল চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, সুখী হইবে এই দৃঢ় বিশ্বাস বারংবার প্রকাশ করিতেছেন। দৌহিত্র বরুণ সাধারণ ভাবেই এম. এ. পাস করিয়াছে তথাপি তিনি আমার নিকট বারংবার বরুণের বুদ্ধিশক্তির প্রশংসা করিতেন, তাহার ভবিষ্যতের উজ্জ্বল চিত্র স্নেহের তুলিকায় আঁকিয়া আমাকে দেখাইতেন। বড় বধূমাতা বড়ই ধীর, মধুরভাষিনী এবং বিদুষী, ইহা আমি বহুবার তাঁহার নিকট শুনিয়াছি। ছোট বধূমাতা সংসারের সমস্ত কাজ জানেন, রন্ধন কার্য্যে সুদক্ষ, রাজসাহীতে কৃতিত্বের সহিত একাকী সংসার চালাইয়াছিলেন, ইহা উৎসাহ সহকারে ডাক্তারবাবু আমাকে বলিতেন। কন্যা রমার সুখ্যাতির শেষ ছিল না—তেজপুরে বালিকা বয়সে কোন্ বাঙ্গালী উচ্চ রাজকর্ম্মচারীর বাড়ীতে "যদি চিরসুন্দর নাহি হবে গো" গানটি গাহিয়া সকলকে কিরূপে বিস্মিত করিয়াছিল, সূচি-কার্য্যের প্রদর্শনীতে কোথায় মানপত্র ও পুরস্কার পাইয়াছিল, কনিষ্ঠ জামাতার কর্ম্মক্ষেত্র বেরিলির নিকট ক্লাটারবাক্‌গঞ্জে যাইয়া ডাক্তারবাবু দেখিয়াছিলেন রমা তাহার বাড়ীটিকে কেমন ছবির মত সাজাইয়া রাখিয়াছে, তারপর একদিন এই সাজান সংসার শুকাইয়া গেল—ইহা ডাক্তারবাবুর মুখে কতবার শুনিয়াছি তাহার নির্ণয় নাই। কেবল যে নিকট আত্মীয়েরাই তাঁহার স্নেহদৃষ্টিতে

সুন্দর ও উজ্জ্বল ছিল তাহা নহে, দূর দূরান্তরের আত্মীয়দিগকেও তিনি স্নেহের আলোকে সুন্দর করিয়া দেখিতেন।

অপূর্ব্ববাবু ডাক্তারবাবুর পিসিমাতার ছেলে, প্রায় সমবয়স্ক বলিয়া আত্মীয়তা অপেক্ষা বন্ধুত্বের সম্বন্ধই উভয়ের মধ্যে দৃঢ় ছিল। অপূর্ব্ববাবু প্রত্যহ সকাল ও বিকালে ডাক্তারবাবুর বাড়ীতে চা খাইতে আসেন, চা খাওয়া একটা নিমিত্ত মাত্র,—প্রীতি ও স্নেহের আকর্ষণই প্রকৃত কারণ। ডাক্তারবাবু এই বন্ধুটিকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন, তাঁহার মঙ্গলের জন্য কতদিন ডাক্তারবাবুকে চিন্তিত দেখিয়াছি। আমাকে বলিতেন অপূর্ব্ববাবু এক সময়ে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন কিন্তু আত্মীয়স্বজনের জন্য সেই অর্থ মুক্তহস্তে ব্যয় করায় বিশেষ কিছু সঞ্চয় করিতে পারেন নাই। কতদিন ডাক্তারবাবু আমার নিকট এই দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয়ের কোমল অন্তঃকরণ ও উদার মনের প্রশংসা করিয়াছেন তাহার নির্ণয় নাই। অপূর্ব্ববাবু তাঁহার কন্যাগণের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল, পরের উপকার করিতে তিনি সর্ব্বদাই প্রস্তুত, সকলকেই তিনি বিশ্বাস করেন—এই সমস্ত কথা ডাক্তারবাবু আমাকে অনেকবার শুনাইয়াছেন। লক্ষ্ণৌয়ে প্রফুল্লবাবু নামে ডাক্তারবাবুর কে একজন দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় থাকেন, তাঁহার কন্যা বড়ই সুন্দর গান গাহিতে পারে, সেখানে রেডিওতে গান গাহিয়া সে প্রচুর অর্থ পাইয়া থাকে—ইহা ডাক্তারবাবু আনন্দ-বিস্ফারিত নয়নে আমাকে শুনাইতেন। কে প্রফুল্লবাবু তাহাও জানি না, তাঁহার কন্যা আমার পরিচয়ের আরও অনেক দূরে, তাহার প্রতি গানের পারিশ্রমিক যে টাকার উল্লেখ ডাক্তারবাবু করিতেন তাহা সহজে বিশ্বাস করিতে পারিতাম না, সুতরাং এই প্রশংসা শুনিবার আমার কিছুমাত্র উৎসাহ ছিল না। কিন্তু অন্য-মনস্ক হইবার উপায় ছিল না, ডাক্তারবাবু তৎক্ষণাৎ মনোযোগ আকর্ষণ

করিতেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে আমাকে একদিন বলিলেন রমার এক দেবর পুলীশের ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছেন। রোগের যন্ত্রণায় ডাক্তারবাবু তখন মুহ্যমান তথাপি এই অতিদূরের আত্মীয়ের উন্নতিতে তাঁহার আনন্দের সীমা ছিল না। তাঁহার মুখে কতবার শুনিয়াছি দৌহিত্রী মীরা শ্বশুরবাড়ীর বড়ই প্রিয়, পিত্রালয়ে আসিয়া অধিককাল বাস করিবার তাহার উপায় নাই, শ্বশুর শাশুড়ির অসুবিধা হয়। একদিন বাহিরের ঘরে বসিয়া কাজ করিতেছি একখানি চিঠি হাতে করিয়া ডাক্তারবাবু প্রবেশ করিলেন। চিঠি খানি তাঁহার দৌহিত্রী গৌরী হাজারিবাগ হইতে লিখিয়াছে—মাংস রান্না করিয়া সে স্বামীর নিমন্ত্রিত বন্ধুবান্ধবগণকে খাওয়াইয়াছে, রান্না চমৎকার হইয়াছিল, সকলে প্রশংসা করিয়াছে। ঘটনাটি ক্ষুদ্র কিন্তু ডাক্তারবাবুর স্নেহপূর্ণ বর্ণনা ও আনন্দের ঘটায় সেই তুচ্ছ বিষয়টিই কত বড় হইয়া আমার নিকট দেখা দিয়াছিল। বড় ডাক্তারবাবুর এক জামাতা পূর্ব্বে সাধারণ চাকরী করিতেন, যুদ্ধের মধ্যে উন্নতি হইয়া লক্ষ্ণৌয়ের এক বিখ্যাত সংবাদ-পত্রের সম্পাদক হইয়া হঠাৎ তাঁহার মাহিয়ানা অনেক বাড়িয়া গেল। সেই সংবাদে ছোট ডাক্তারবাবুর কী আনন্দ, সমস্তদিন যতবার আমার সহিত দেখা হইতেছে ততবারই সেই কথা। দৌহিত্রী জয়ারাণীর গায়ের রঙ অন্যান্য বোনেদের তুলনায় মলিন হইলেও বড়ই শান্তস্বভাবা এবং সেবাপরায়ণা, সাংসারিক কার্য্য করিবার উৎসাহও তাহার অসীম। দৌহিত্রী মন্নু যেমন রূপবতী তেমনই কর্ম্মকুশলা, অনায়াসে তাহার বিবাহ হইবে, তাহার পিতাকে কষ্ট স্বীকার করিয়া পাত্র সন্ধান করিতে হইবে না। এইরূপ কত কথা তখন আমার মনে পড়িতেছিল। আবার এই সমস্ত আত্মীয়স্বজনের কাহারও অসুখ করিলে এই বিরাট পুরুষ স্ত্রীলোকের মত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইতেন, সর্ব্বদাই সেই চিন্তা, সর্ব্বদাই

সেই কথা। সান্যাল মহাশয়, সুরেশবাবু সকলে বসিয়া আছি, হাসির গল্পে ডাক্তারবাবুর মন নাই, হয়ত অন্যমনস্ক হইতেছেন অথবা বারংবার উঠিয়া বাটির ভিতরে যাইয়া রোগীর কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। বিশেষতঃ রমার কন্যা রেবার অসুস্থতায় তিনি অস্বাভাবিক উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করিতেন। সাধারণ জ্বর তথাপি তাঁহার দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। একদিন আমি কতকটা অধৈর্য্যসহকারে তাঁহাকে বলিলাম "এই তো একটু জ্বর, এতো ভাবছেন কেন?" মৃদুস্বরে ডাক্তারবাবু বলিলেন—"দেখুন প্রফেসার সাহেব, পরের খুন, রমার ঐ একটি মেয়ে—ওর অসুখ হলে বড্ড আমাকে ভাবায়।" তাঁহার পৌত্র শম্ভুর আমাশয় হইবার পর রাত্রিজাগরণ ও দুশ্চিন্তাতে ডাক্তারবাবুর প্রচ্ছন্ন উদরী রোগ প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল। এইরূপে এই আত্মীয়বৎসল ডাক্তারবাবু অপূর্ব্ব স্নেহের কোমল দৃষ্টিতে নিজ আত্মীয়স্বজন ও দূরসম্পর্কীয় পরিজনবর্গকে সর্ব্বদাই বৃহৎ ও সুন্দর করিয়া দেখিতেন, স্নেহের পক্ষপুটে আচ্ছাদিত করিয়া ইহাদের সকলকে রোগশোক ও দুঃখ হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার সমস্ত শারীরিক ও মানসিক শক্তি প্রয়োগ করিতেন। ঐ সেই দেহ প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখায় দগ্ধ হইতেছে, স্নেহের পক্ষপুট পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছে—আমি বসিয়া বসিয়া দেখিতেছি।

কিন্তু এই অপূর্ব্ব স্নেহের বাহ্যপ্রকাশ ছিল না, অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় এই স্নেহ প্রচ্ছন্নভাবে নিরন্তর প্রবাহিত হইত। অনেক মানুষ দেখা যায়, ভাষা-ভাব-ভঙ্গীতে স্নেহের পাত্রপাত্রীর নিকট তাঁহাদের স্নেহ অনুক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে, আবার কাহারও বা স্নেহ প্রবল হইলেও তাহা চাপিয়া রাখিবার শক্তি অসাধারণ। ডাক্তারবাবু সাধারণতঃ আমি ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট মনের এই কোমলভাব প্রকাশিত করিতেন না; আত্মীয়স্বজনদের নিকটেও বোধ হয় ভাষায় এই স্নেহের বিশেষ

অভিব্যক্তি হইত না। নাতি নাতিনীদের বেশীক্ষণ ক্রোড়ে লইতেন না,—এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম একমাত্র শম্ভুর ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করিয়াছি। ছোট ছোট পৌত্র পৌত্রীগুলিকে আদর করিবার সময় ভাষার কোন উচ্ছ্বাস বা আতিশয্য ছিল না—সেই সময় ডাক্তারবাবু গম্ভীর ও স্বল্পভাষী কিন্তু মনে আঘাত লাগিলে তাঁহার এই দৃঢ়তার বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাইত এবং মনের আবেগ অবিরল ধারায় বাহির হইয়া পড়িত। এইরূপ দুই একটি ক্ষেত্র আমি লক্ষ্য করিয়াছি। ডাক্তারবাবুর স্ত্রীবিয়োগের পর একদিন আমি কথাপ্রসঙ্গে বলিলাম—"নেড়াবাবুর শোকটা বড় লেগেছে—বড্ড রোগা হয়ে গেছেন। মার সঙ্গে বসে রোজ ভাত খাওয়া ওঁর অভ্যাস ছিল।" আমার কথাগুলি শুনিয়া ডাক্তারবাবু কয়েকমুহূর্ত্ত স্থির হইয়া থাকিলেন এবং পরে "নেড়া" "নেড়া" বলিয়া বারংবার ডাকিতে লাগিলেন। নেড়া অর্থাৎ ধীরেনবাবু কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তখন তাঁহাকে নিকটে ডাকিয়া দুইহস্তে বক্ষের নিকট আকর্ষণ করিয়া রোদন করিতে করিতে ডাক্তারবাবু বলিলেন—"সবাইয়ের সব আছে, তোর কেউ নেই।" কথাগুলির অর্থ আমি গ্রহণ করিতে পারিলাম না কিন্তু ডাক্তারবাবুর অন্তরের কোন প্রচ্ছন্ন প্রদেশে এই পুত্রের জন্য যে স্নেহ সঞ্চিত ছিল তাহার প্রকাশ হঠাৎ আমি দেখিতে পাইলাম। ডাক্তারবাবু চাপা প্রকৃতির লোক ছিলেন কিন্তু আমার নিকট শোকের আঘাতে এই সাধারণ স্বভাবের ব্যতিক্রমও আমি লক্ষ্য করিয়াছি।

আমি শ্মশানে বসিয়া ভাবিতেছি, চতুর্দ্দিকে চিতা জ্বলিতেছে, ধূম্রসঙ্কুল উত্তপ্ত বায়ু চক্ষে জল আনিয়া দিতেছে। এই ডাক্তারবাবুর অসীম ধৈর্য্য ছিল। এখন চিতার উপর যেমন নিস্পন্দ হইয়া পড়িয়া আছেন, জীবনেও কঠিন রোগের যন্ত্রণা ঠিক সেইরূপ নীরবতার সহিত সহ্য করিয়াছিলেন। কতদিন দেখিয়াছি গল্প করিতে করিতে মুখটা

একটু কঠিন হইয়া উঠিল, পেটের বামদিক দুইহস্তে টিপিয়া ধরিলেন, কিন্তু মুখ দিয়া কোন ক্লেশসূচক শব্দ বাহির হইল না, অথবা অস্ফুট শব্দ ভাল করিয়া প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই ডাক্তারবাবুর ধৈর্য্যশক্তি তাহা দমন করিয়া ফেলিল। দীর্ঘ কয়েকমাসব্যাপী রোগভোগের সময় পুত্রকন্যা, পুত্রবধূ প্রভৃতি সকলেই অশেষ প্রকারে সেবা করিয়াছিলেন কিন্তু সকলের সেবা তিনি যেন কুন্ঠিত হইয়া গ্রহণ করিতেন। সেবার দাবী তাঁহার ছিল না, সেবা করিবার আদেশ কাহারও প্রতি করিতেন না। আমি বেশ বুঝিতাম যাহার যতক্ষণ ইচ্ছা সে ততক্ষণই বাতাস করিতেছে, যাহার যতক্ষণ ইচ্ছা ততক্ষণই পদসেবা করিতেছে, তাহার অতিরিক্ত এক মুহূর্ত্তও যেন তাঁহার প্রয়োজন নাই। বাস্তবিক সেবা-গ্রহণের আকাঙ্খা তাঁহার ছিল না, সেবাগ্রহণের ছল করিয়া তিনি সকলকে কাছে দেখিতে ভালবাসিতেন। সেবার দাবী যাঁহার উপর ছিল একমাত্র সেই স্ত্রীর সেবা তিনি অনায়াসে ও অকুন্ঠিতভাবে গ্রহণ করিতেন। মৃত্যুর ১২।১৪ দিন পূর্ব্বে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আজকাল পা টিপ্‌তে কেউ আসে না কেন? আগে আগে তো যখনই আসতাম তখনই কেউ না কেউ পা টিপ্‌ছে দেখতে পেতাম।—পা টেপা ভাল লাগে না?" ডাক্তারবাবু বলিলেন "হাতে সব বড় নখ, আমার পায়ে লাগে।" আমি বলিলাম—"কেটে ফেলতে বলেন না কেন?" কিন্তু আর কোন উত্তর পাইলাম না। সেবার দাবী তো ছিলই না, বরং সেবা যেন অপরাধীর মত কুণ্ঠার সহিত গ্রহণ করিতেন, অথচ সামান্য সেবা পাইলেই কতবড় করিয়া আমার নিকট বলিতেন তাহা অপর কেহই জানে না। তাঁহার চরিত্রের এই বিশিষ্টতা লক্ষ্য করিয়া তাঁহার জন্মদিনে একটি গান তাঁহাকে উপহার দিয়াছিলাম। সেই তাঁহার শেষ জন্মদিন, ২৯শে শ্রাবণ, স্ত্রীর মৃত্যুর পরদিন। পূর্ব্ববৎসর ঠিক এই

দিনে আরতি নানাবিধ অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া ডাক্তারবাবুকে খাইতে দিয়াছিল, তিনি কত আনন্দ করিয়া তাহা খাইয়াছিলেন, বারংবার সেই কথা কতদিন আমাকে বলিয়াছিলেন তাহার নির্ণয় নাই। এবারেও জন্মদিনে তাঁহার প্রিয় খাদ্যদ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া দিবার কথা ছিল কিন্তু সেদিন তিনি শোকাচ্ছন্ন, মনের অবস্থা অন্যরূপ। স্ত্রীবিয়োগের পর হইতে এই পত্নীবৎসল স্বামী সর্ব্বদাই ম্রিয়মাণ হইয়া থাকিতেন, তাঁহার বক্ষপঞ্জর ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, আমার সহিত কথা কহিতে কহিতে হঠাৎ নীরব হইতেন এবং অন্য কি ভাবিতেছেন মনে হইত। আমি তাঁহার এই নিস্তব্ধতার আনন্দ ভঙ্গ করিতাম না। কিয়ৎক্ষণ পরে হয়ত তিনি বলিতেন—"আমার স্ত্রী একবার এই বলেছিলেন"—"আমার স্ত্রী অসুখের সময় এই করেছিলেন," তখন আমি বুঝিতে পারিতাম এতক্ষণ তাঁহার মন কোথায় গিয়াছিল। আজ সব সেবা, সব কুণ্ঠা ও সঙ্কোচের অবসান হইয়াছে, যাঁহার সেবাশুশ্রূষা লইয়া ছেলেমেয়েরা দিবারাত্র ব্যস্ত থাকিত আজ তাহাদিগকে অখণ্ড অবসর দিয়া, বহুদিনের পরিচিত কোমল পালঙ্কশয্যা পরিত্যাগ করিয়া সুদূর শ্মশানে প্রজ্জ্বলিত কাষ্ঠস্তূপের উপর অনন্ত বিস্মৃতির মধ্যে ডাক্তারবাবু ধীরে ধীরে দগ্ধ হইয়া যাইতেছেন।

আজ মনে পড়িতেছে ডাক্তারবাবু আমাকে কতই স্নেহ করিতেন, আমাদের উভয়ের অনেক পার্থক্য ছিল, চরিত্রগত কোন মিল ছিল না, পদগৌরবে তিনি আমার অনেক ঊর্দ্ধে ছিলেন, সামাজিক প্রতিষ্ঠায় আমি তাঁহার সমকক্ষ ছিলাম না, তাঁহার সাংসারিক অভিজ্ঞতা ও স্থিরবুদ্ধির নিকট আমি অনেক বিষয় শিক্ষালাভ করিয়াছি। তথাপি বন্ধুর মত তিনি আমার সহিত ব্যবহার করিতেন, আমার মনের কথা শুনিতেন, আমার নিকট মনের কথা অকপটে ব্যক্ত করিতেন। আমার

অসুখ-বিসুখ হইলে বারংবার আসিয়া সন্ধান লইতেন, ঔষধের ব্যবস্থা করিতেন, মনে সাহস দিতেন। ৬ই জুন আমি হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়ি, সে কথা পূর্ব্বে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। সেইদিন ডাক্তারবাবু নিজের অসুস্থতা সত্ত্বেও দ্বিতলের বারান্দায় দাঁড়াইয়া আরতির নিকট বারংবার আমার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। পরদিন অপরাহ্ণে আমি দেখা করিতে যাইলে আমাকে বলিলেন—"একে আমার এই অসুখ, তার ওপর আপনার শরীর খারাপ হ'ল। আমার বড্ড ভয় হয়েছিল। তবে আপনি বলেন এখনও আপনার কয়েক বৎসর আয়ু আছে সেই কথা মনে পড়ে সাহস হ'ল।" তাঁহার হৃদয়ের প্রচ্ছন্ন প্রদেশে আমার জন্য এইরূপ কোমলতা ছিল, তাহার পরিচয় আমি পাইয়াছি। একদিন কোন ঘটনা উপলক্ষ্যে অসুস্থ অবস্থায় আমার বাটীতে আসিয়া দুই হস্তে আমার হাতখানি ধরিয়া স্নেহকোমলকণ্ঠে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে ডাক্তারবাবু বলিয়াছিলেন "আপনাকে আমি ছোট ভাইয়ের মত মনে করি"—তাঁহার সেদিনকার মুখের সুন্দর ছবিটি আজ আমার বারংবার মনে পড়িতে লাগিল। ইহ সংসারে তাঁহার ভরসা আমি অনেক করিতাম—বিপদে আপদে, সুখে সম্পদে। পূর্ণিমার বিবাহের সময় সমস্ত বন্দোবস্তের ভার তাঁহার হস্তে অর্পণ করিয়া আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম। আমি টাকা দিয়া আর কিছুই ভাবি নাই, সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তিনি ক্রয় করাইয়াছিলেন, বিবাহকার্য্য শেষ হইলে নিজ হস্তে হিসাব লিখিয়া আমাকে দিয়া গিয়াছিলেন, আমি কৃতজ্ঞ অন্তরে বসিয়া বসিয়া ভাবিয়াছি,—গভর্ণমেণ্টের উচ্চ রাজকর্ম্মচারী, কলিকাতার কায়স্থসমাজে বনিয়াদীবংশসম্ভূত এই বৃদ্ধ ভদ্রলোক যেন সামান্য কর্ম্মচারীর মত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিজহস্তে হিসাব লিখিয়া আমার কাছে আনিয়া দিয়াছেন। কতবড় আধার হইলে তবে মানুষ



আপনাকে ভুলিয়া এতো ছোট কাজের জঞ্জাল আনন্দের সহিত গ্রহণ করিতে পারে। আমি পূর্ণিমার বিবাহের এই ঘটনা যথাস্থানে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। আরতির বিবাহের জন্য ডাক্তারবাবু কত চিন্তা করিতেন, কত স্থানে নিজেই সম্বন্ধ করিয়াছিলেন। এই ডাক্তারবাবুর আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান অত্যন্ত অধিক ছিল তথাপি আমার মেয়েদের প্রস্তুত খাদ্যদ্রব্য অথবা ব্যঞ্জন অতি সমাদরে গ্রহণ করিতেন, এমন কি কতদিন নিজে চাহিয়াও খাইয়াছিলেন। এতবড় একজন সম্মানী ব্যক্তি সামান্য ব্যঞ্জন চাহিয়া খাইতেছেন—ইহার পশ্চাতে কী স্নেহ ও প্রীতি ছিল তাহা আমি জানিতাম, অপর কেহ জানিত না। ডাক্তাববাবুর স্ত্রী উৎকৃষ্ট মাংস রান্না করিতে পারিতেন, এরূপ মাংস রান্না সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। এই মাংস কতদিন ডাক্তারবাবু আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন তাহার নির্ণয় নাই। তাঁহার কোন প্রিয় ব্যঞ্জন রান্না হইলে অনেক সময় নিজে হাতে করিয়া আমাকে দিয়া যাইতেন। মণ্টু যখন মাতৃগর্ভে তখন তাহার মাতার সাধভক্ষণ উপলক্ষে তাহাদের বাড়ীতে মাছ রান্না হইয়াছিল—সেদিন মাছ দুর্ম্মূল্য, ডাক্তারবাবু অল্পই মাছ কিনিয়াছিলেন। তথাপি সকালবেলা আমাকে বলিয়া যাইলেন আমি যেন একটু বেলা করিয়া খাই, মাছ রান্না হইতেছে তিনি পাঠাইয়া দিবেন। আমার প্রতি তাঁহার এতই প্রীতি ছিল। আমি কলেজ হইতে ফিরিয়া আসিলে আমার সারাদিনের কর্ম্মতালিকা আগ্রহ সহকারে শ্রবণ করিতেন, কোথাও ছাত্র পড়াইবার কথাবার্ত্তা হইলে মাসিক পারিশ্রমিক স্থির করা সম্বন্ধে আমাকে উপদেশ দিতেন, আমি বেশী টাকার ছাত্র-পড়ান পাইলে আনন্দ প্রকাশ করিতেন। প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে অনেকগুলি ছাত্র-পড়ান পাইয়াছিলাম, মাসে অনেক টাকা আয় হইতে লাগিল অথচ অতিরিক্ত পরিশ্রমে ক্লান্তি অনুভব

করিতে লাগিলাম। একদিকে ডাক্তারবাবুর অপরিসীম আনন্দ, অন্যদিকে আমার শরীরের জন্য উদ্বেগ! কোন্ খাদ্যদ্রব্য সহজে পরিপাক হইবে, কি ঔষধ সেবন করিলে শরীরে বল পাইব তাহা আমাকে উপদেশ দিতেন। আমার ছাত্রগণের সহিত ডাক্তারবাবু আলাপ করিতেন, তাহাদের কৃতকার্য্যতার সংবাদে বারংবার আনন্দ প্রকাশ করিতেন। এই বৎসর ছাত্র শ্রীমান তারাপদ বি. এ. পরীক্ষা দিয়াছিল, দেখা হইলেই ডাক্তারবাবু তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিতেন, মৃত্যুর দুইদিন পূর্ব্বেও সেই সংবাদ আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

একদিনের ঘটনা লিপিবদ্ধ করিতেছি। আমার বাড়ীতে বাজার হইতে সরিষার তৈল আনিবার কোন বৃহৎ পাত্র ছিল না। ডাক্তারবাবুর বাড়ীতে একটি বৃহৎ পাত্র দেখিয়া ডাক্তারবাবুর পাচককে ডাকিয়া বলিলাম—“ঠাকুর, দিদিমণি কিংবা বৌদিদের জিজ্ঞাসা কর যদি এই টিনটি আমাকে দিতে পারেন। তবে তাঁদের অসুবিধা হলে দরকার নেই।” ডাক্তারবাবু নীরবে আমার কথাগুলি শুনিতেছিলেন। ঠাকুর ফিরিয়া আসিয়া বলিল—“দিদিমণিরা বল্লেন ওরকম টিন ঐ একটিই আছে, ওটা আমাদের দরকার,—একটা ছোট টিন দিতে পারেন।” আমি কিছু বলিবার পূর্ব্বেই ডাক্তারবাবু বিরক্তিপূর্ণকণ্ঠে বলিলেন—“ওদের দরকার! ওদের সবই দরকার। আপনি ওটা নিয়ে যান।” আমি যত বুঝাই যে ডাক্তারবাবু নিজে সংসার করেন না, মেয়েরাই সংসারের খবর রাখে, সুবিধা অসুবিধা তাহারাই বুঝে, ততই ডাক্তারবাবু অধিকতর উত্তেজিত হইয়া উঠেন এবং টিনটি লইয়া যাইতে আমাকে অনুরোধ করেন। অগত্যা টিনটি আমাকে লইতে হইল। ঘটনাটি সামান্য, বিষয়-বস্তুটি অতি তুচ্ছ কিন্তু এই সাধারণ একটা ঘটনার ভিতর দিয়া যে মহৎ প্রাণ দেখিতে পাওয়া যাইল তাহা আমার দৃষ্টি অতিক্রম করিতে



পারিল না। ডাক্তারবাবুর মৃত্যুতে আমার মনের সমস্ত কথা বলিবার এবং আমাকে স্নেহ করিবার একজন অকৃত্রিম বন্ধু আমি চিরদিনের জন্য হারাইয়াছি।

শ্মশানে শ্রীভূতেশ্বরের মন্দিরের ঘড়িতে প্রায় ৩টা বাজিল, আমি গঙ্গার ধারে ঘাটের সিঁড়িতে যাইয়া বসিলাম। অতীন্দ্র ও সুভাষ পূর্ব্ব হইতেই সেখানে বসিয়াছিল, তাহাদের সহিত পরলোক সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলাম। মৃত্যুর পর আত্মার গতি ও পরিণতি সম্বন্ধে ডাক্তারবাবুর সহিত আমার অনেকবার যে সমস্ত কথাবার্ত্তা হইয়াছিল তাহাই আলোচনা করিলাম। শীতল বাতাস বহিতেছে—একজন সাধু শ্রীমহাদেবের স্তব করিতে করিতে স্নান করিতেছেন। আমি লক্ষ্য করিতেছি ডাক্তারবাবুর দেহের সমস্তই পুড়িয়া গিয়াছে, কেবলমাত্র বক্ষপঞ্জরটি এখনও দগ্ধ হয় নাই—বক্ষসংলগ্ন প্রত্যেকটি অস্থিখণ্ড দেখা যাইতেছে। ভাবিতেছি তাঁহার মহৎ অন্তঃকরণের আধারস্বরূপ এই বক্ষপঞ্জরই তাঁহার সর্ব্বস্ব ছিল, এই অন্তঃকরণই তাঁহার চরিত্রের বিশিষ্টতা প্রকাশ করিত। তাই এই বিশাল বক্ষ সর্ব্বভূক অগ্নিশিখাকেও যেন বাধা দিতেছে, সহজে বিলুপ্ত হইতে চাহিতেছে না। দেখিলাম ছেলেরা শ্মশানের বাহিরে কোথায় কাষ্ঠের সন্ধানে চলিয়া যাইল, পুঞ্জ পুঞ্জ কাষ্ঠভার স্কন্ধে লইয়া ফিরিয়া আসিল। এইবার চিতা দ্বিগুণ দীপ্তিতে পুনরায় জ্বলিয়া উঠিল, বক্ষপঞ্জরটি অগ্নির আবেষ্টনে আর দেখা যাইল না, ডাক্তারবাবুর দেহের সর্ব্বশেষ বিশিষ্ট অংশ ভস্মরাশিতে পরিণত হইল। আমি ভাবিলাম পরবর্ত্তী যুগের আত্মীয়গণ কেহই এই অন্তঃকরণের পরিচয় পাইবে না, স্নেহের তরঙ্গে এই বক্ষপঞ্জর কিরূপ কম্পিত হইত তাহা কেহই জানিবে না, শম্ভু, মণ্টু যখন বড় হইবে তখন সকলের যেমন পিতামহ থাকে সেইরূপ তাহাদেরও ছিল, ইহাই মাত্র শুনিবে, তাহাদের পিতামহের কোথায়

যে বিশিষ্টতা ছিল, কোথায় তিনি সকলের ঊর্দ্ধে দাঁড়াইয়া থাকিতেন তাহা ইহারা উপলব্ধি করিতে পারিবে না। বিরাট দেহ মুষ্টিমেয় ভস্মরাশিতে পরিণত হইল, গঙ্গাজল দিয়া চিতা নির্ব্বাপিত করিয়া চিরদিনের মত পিতা, স্নেহশীল আত্মীয় ও অকৃত্রিম বন্ধুকে হারাইয়া আমরা সকলে ৯া৹টার সময় বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

(৪৬)

দিন চলিয়াছে, আজ ২৫শে সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার, ডাক্তারবাবুর শ্রাদ্ধ দিবস। কিছুদিন পূর্ব্বে পুত্রগণ মাতার শ্রাদ্ধোপলক্ষ্যে মস্তক মুণ্ডন করিয়াছিল, পুনরায় পিতার শ্রাদ্ধোপলক্ষ্যে মস্তক মুণ্ডিত করিয়াছে—বাহিরের এই শোকচিহ্ন স্নেহের সর্ব্বরিক্ততাকে নির্ম্মমভাবে প্রকাশ করিতেছে। এই দীনবেশ অন্তরের গভীর বেদনার কথঞ্চিৎ অভিব্যক্তি মাত্র। ডাক্তারবাবু কীর্ত্তন শুনিতে ভালবাসিতেন, মৃত্যুর কয়েক দিবস পূর্ব্বেও কন্যা রমাকে ডাকিয়া কীর্ত্তন গাহিতে বলিয়াছিলেন। তাই আজ কীর্ত্তনের ব্যবস্থা হইয়াছে। ডাক্তারবাবুর স্ত্রীর মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধ-দিবসে ডাক্তারবাবুর অভিপ্রায় অনুসারে শ্রীহরি সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল, বৈষ্ণব শ্রীগোপীনাথ কীর্ত্তন গাহিয়াছিলেন। সেদিন বৈষ্ণবের সঙ্গী কেহই ছিল না, যন্ত্রও আসে নাই। ডাক্তারবাবু ইহাতে দুঃখপ্রকাশ করেন এবং যন্ত্র ও সহযোগীর সমবেত স্বরে কীর্ত্তন হইলে আরও ভাল হইত বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম যে যন্ত্র অথবা অন্য কেহ না থাকিলেও ভাব ও ভক্তির সহিত বৈষ্ণব কীর্ত্তন গাহিয়াছিলেন, সুতরাং শ্রাদ্ধবাসরে শ্রীহরিনাম সার্থক হইয়াছিল। আমার কথা শুনিয়া ডাক্তারবাবু এই বৈষ্ণবের কীর্ত্তন শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন কিন্তু মধ্যে মধ্যে এই বৈষ্ণব মহাশয় আমার নিকট

আসিলেও ডাক্তারবাবুকে ইঁহার গান শুনাইবার সুবিধা করিয়া উঠিতে পারি নাই। বিশেষ করিয়া সেই কারণে আজ ২৫শে সেপ্টেম্বর ডাক্তারবাবুর শ্রাদ্ধবাসরে শ্রীগোপীনাথ বৈষ্ণব মহাশয়ের কীর্ত্তনের ব্যবস্থা করা হইল, সঙ্গে আরও দুইজন বৈষ্ণব আসিলেন, কীর্ত্তনের সহিত মধুর স্বরে যন্ত্র বাজিতে লাগিল। ভাব ও ভক্তির সহিত বৈষ্ণব মহাশয় কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন, কক্ষের সমস্ত বাতাস শ্রীহরিধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিল। কিন্তু অসংখ্য নিমন্ত্রিত আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের মধ্যে মাত্র কয়েকজন ব্যতীত আমি আর কাহাকেও সেদিন কীর্ত্তন সভায় উপস্থিত হইতে দেখিলাম না। সভায় পরচর্চ্চাকলুষিত একখানি সংবাদ-পত্র পড়িয়াছিল, কোন কোন আত্মীয় হরিনাম শ্রবণ না করিয়া এই সংবাদপত্রে চক্ষুনিবিষ্ট করিয়া বসিয়াছিলেন, কেহ বা অস্ফুটস্বরে গল্প করিতেছিলেন। আমি বিস্মিত হইয়া ভাবিলাম যে এই ডাক্তারবাবুর মত আত্মীয়বৎসল লোক সংসারে বিরল, ইঁহার নিকট আত্মীয় বন্ধুগণ কতভাবে ঋণী, অথচ ইঁহার শেষ পারলৌকিক কার্য্যের সময় শ্রীহরিনাম শ্রবণ করিয়া তাঁহার আত্মার কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করিতে কেহই উপস্থিত হইলেন না, উপস্থিত হইয়াও কেহ সেই নামকীর্ত্তনে অন্তরের সহিত যোগ দিলেন না। ডাক্তারবাবুর স্ত্রীর শ্রাদ্ধবাসরেও আত্মীয়-স্বজনগণের এই উদাসীনতা আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম। কক্ষের প্রাচীর গাত্রে ডাক্তারবাবু ও তাঁহার স্ত্রীর দুইখানি বৃহৎ আলোকচিত্র পত্রপুষ্প-বেষ্টিত হইয়া শোভা পাইতেছিল। তপেন্দ্রবাবুর কনিষ্ঠপুত্র মণ্টু সেখানে উপস্থিত হইয়া পিতামহের ছবিখানির দিকে কিয়ৎক্ষণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া হঠাৎ হাসিমুখে "দাদা" "দাদা" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। ডাক্তার-বাবুর যে আলোকচিত্রখানি সেখানে রাখা হইয়াছিল তাহার সহিত ডাক্তারবাবুর বর্ত্তমান সময়ের আকৃতির বিশেষ মিল ছিল না। অথচ

আমি লক্ষ্য করিলাম বালক পিতামহীর চিত্রের দিকে তাকাইতেছে না, পুনঃ পুনঃ পিতামহের দিকেই তাহার বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টি, বারংবার সেই চিত্রের প্রতি তাহার কোমল হস্ত প্রসারিত, পুনঃ পুনঃ "দাদা" "দাদা" বলিয়া তাহার আনন্দের অভিব্যক্তি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইল আজ এই শ্রাদ্ধবাসরে ডাক্তারবাবুর আত্মার আবির্ভাব হইয়াছে, এই এক বৎসর বয়স্ক সরল শিশুর নিকট তিনি আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। গান তখন বেশ জমিয়া উঠিয়াছে, ভাবের স্রোতে বৈষ্ণব সকলকে সিক্ত করিতেছেন, চক্ষের জল রোধ করা কঠিন হইতেছে। আমি বসিয়া বসিয়া শ্রীহরিনামের সহিত প্রার্থনা করিলাম ডাক্তারবাবুর কীর্ত্তন শ্রবণ করার শেষ বাসনা আজ সার্থক হউক এবং তাঁহার জীবনের সমস্ত বাসনা এই এক বাসনায় পর্য্যবসিত হইয়া ডাক্তারবাবুকে পুনর্জন্ম দুঃখ হইতে মুক্তি প্রদান করুক।

২৭শে সেপ্টেম্বর, শনিবার, ডাক্তারবাবুর পারলৌকিক কার্য্যের শেষ দিন, আজ নিয়ম ভঙ্গ, রাত্রিতে আত্মীয়স্বজন নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। সন্ধ্যাবেলা বৈষ্ণব সম্মিলনীতে শ্রীভাগবত পাঠ শ্রবণ করিতে যাইতেছি, পথে ডাক্তারবাবুর পুত্র ধীরেন্দ্রবাবুর সহিত দেখা হইল, ভ্রাতুষ্পুত্র মণ্টুকে ক্রোড়ে লইয়া কোথা হইতে গৃহাভিমুখে ফিরিয়া আসিতেছেন। ধীরেন্দ্রবাবু আমাকে বলিলেন—"সেবার যেমন দাঁড়িয়ে সব করিয়েছিলেন সেই রকম থাকবেন।" "সেবার" অর্থাৎ তাঁহার মাতার শ্রাদ্ধকার্য্যের সময়। আমি সাংসারিক কার্য্যে বিশেষ পটু নহি তথাপি এই অপ্রত্যাশিত সম্মানে প্রীত হইলাম। পূর্ব্ব হইতেই সঙ্কল্প ছিল নিয়মভঙ্গের সময় আমি উপস্থিত থাকিয়া সমস্ত কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিব, সুতরাং ধীরেন্দ্র বাবুকে শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবার আশ্বাস দিয়া আমি সম্মিলনীগৃহে চলিয়া যাইলাম। রাত্রি প্রায় ৮টার সময় ডাক্তারবাবুর বাড়ীতে যাইয়া দেখিলাম

তখনও নিমন্ত্রিত জনসমাগম হয় নাই, আমি ডাক্তারবাবুর শয়ন কক্ষে যাইয়া বসিলাম। ডাক্তারবাবুর মৃত্যুর পর আমি দুইদিন সন্ধ্যাবেলা সেই বহুপরিচিত কক্ষে যাইয়া বসিয়াছিলাম, কত পুরাতন কথা মনে পড়িতেছিল, তাঁহার আত্মার কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলাম। হিন্দুশাস্ত্রে বলে জীবাত্মা মৃত্যুর পর অশৌচকালাবধি সংসারের অতি নিকটে অবস্থান করে, বাসনা কামনাযুক্ত মন লইয়া সূক্ষ্মদেহ আত্মীয় স্বজনগণের সমস্ত কার্য্যই দেখিতে পায়; কত কি মনের কথা অভিব্যক্ত করে তাহা স্থুলদেহ আত্মীয়স্বজনের শ্রুতিগোচর হয় না। পারলৌকিক সমস্ত ক্রিয়ার পরিসমাপ্তি হইলে জীবাত্মার উদ্ধগতি হয়, সংসারের সহিত সম্বন্ধ হঠাৎ একেবারে বিচ্ছিন্ন হয় না। তাই ডাক্তারবাবুর জীবনের শেষ বিশ্রামস্থল এই শয্যাকক্ষে আমি মধ্যে মধ্যে যাইয়া বসিতাম, আজিও সেইরূপ চেয়ারে যাইয়া উপবেশন করিলাম। সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে কালী ও লক্ষ্মীর সেই চিত্রপট, ঘরের ভিতর সেই সরস্বতীর ছবি, সেই চেয়ার দুইখানি, সেই সুকোমল শুভ্রশয্যা—পার্থক্যের মধ্যে দেখিলাম চেয়ারের পাশে ধূপ জ্বলিতেছে, কয়েকটি ছোট ছোট ভাঁড় সেখানে সংরক্ষিত।

আমি বসিয়া আছি, ক্রমে ক্রমে নিমন্ত্রিত জনসমাগম হইতেছে। আত্মীয়গণের মধ্যে স্ত্রীলোক ও বালকদিগের বসিবার স্থান দ্বিতলের একটি প্রশস্ত কক্ষে হইয়াছিল, পুরুষগণ নীচে বাহিরের ঘরে অপেক্ষা করিতেছিলেন। অন্যমনস্ক হইয়া বসিয়া আছি, হঠাৎ এসেন্সের তীব্র গন্ধ আমার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল, বিস্মিত হইয়া দেখিলাম কয়েকটি মহিলা দরজার সম্মুখ দিয়া অপর গৃহের দিকে চলিয়া যাইতেছেন। প্রথমেই স্ত্রীলোক ও বালকবালিকাদিগের আহারের ব্যবস্থা করা হইল। আমি দুঃখিত অন্তঃকরণে লক্ষ্য করিলাম অধিকাংশ আত্মীয় স্ত্রীলোক-

গণের বেশভূষা অতি পরিপাটী, তীব্র আলোকে তাঁহাদের দেহের কনক-রতনে যেন বিজলী প্রতিফলিত হইতেছে, মুখে পাউডারের ঘন প্রলেপ। ইঁহারা যাতায়াত করিতেছেন, নানাবর্ণ বিচিত্র মূল্যবান সাড়ির খস্‌খসানি শব্দ, কনকবলয়ের মৃদু রিণিঝিণি, এসেন্সের গন্ধে বাতাস যেন ঘন ও ভারি। ইঁহাদের দেখিয়া ক্ষণকালের জন্য আমার মনে ভ্রম হইতেছে—বাড়ীতে আজ আনন্দ উৎসব, অথবা শোকের অভিব্যক্তি! সেদিন এই মহিলাগণকে কি কুৎসিতই দেখিয়াছিলাম! আজ যে বাড়ীতে ইঁহারা আসিয়াছেন সেই বাড়ীর কিরীট খসিয়া পড়িয়াছে, আজ যে উপলক্ষ্যে ইঁহারা আসিয়াছেন তাহা শোকের, আনন্দের নহে—ইহা তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন। ডাক্তারবাবু কোলাহল সহ্য করিতে পারিতেন না, অনেক সময় দেখিয়াছি, সুস্থ অথবা অসুস্থ অবস্থায় হঠাৎ কোন শব্দ হইলে তিনি চমকিয়া উঠিতেন, বিরক্তি প্রকাশ করিতেন। এমন কি পথের কোলাহলও তাঁহার বিরক্তির উদ্রেক করিত। তাঁহার এই স্বভাব অনুযায়ী সমস্ত বাড়ীটি গড়িয়া উঠিয়াছিল—এত বড় সংসার, অনেক পরিজন, অথচ কখনও উচ্চধ্বনি অথবা বাক্‌বিতণ্ডার শব্দ আমার শ্রুতিগোচর হয় নাই। কিন্তু আজ এই শ্রাদ্ধবাড়ীতে কী কোলাহল!—ছেলেমেয়েদের কলরব নহে, ছেলেমেয়েদের মায়েরা কোলাহল করিতেছে। নারীকণ্ঠউত্থিত অর্থহীন তীব্র হাস্যধ্বনিও মধ্যে মধ্যে শ্রুতিগোচর হইতেছে। আমি চতুর্দ্দিকে যাইতেছি কিন্তু মন আমার ভারাক্রান্ত, আমি কেবলই ভাবিতেছি কত সহজে মানুষ মানুষকে ভুলিয়া যায়। আমি দেখিলাম যে পুরুষসিংহের মৃত্যুর পর এক বিরাট শূন্যতা এই বাড়ীর প্রতি রন্ধ্রে অহঃরহঃ বিরাজ করিতেছিল তাহা এখন এক কুৎসিত কোলাহল, দুর্গন্ধ এসেন্স-মিশ্রিত বিষাক্ত বায়ু এবং বেশভূষার রুচিবিহীন বর্ণ-বৈচিত্র্য অধিকার করিয়া বসিয়াছে।

নির্ব্বিঘ্নে আত্মীয়স্বজনের আহারাদি সম্পন্ন হইল, গভীর রাত্রিতে আবার বাড়ীটি নিস্তব্ধ হইয়া গেল, ডাক্তারবাবুর ইহজীবনের উপর একটা ঘন কৃষ্ণবর্ণ যবনিকা পতিত হইল, আমি দেখিলাম আজই যেন ডাক্তারবাবু ধীরে ধীরে অতীতের বিস্মৃতির মধ্যে মিশাইয়া যাইতেছেন।

(৪৭)

২০শে সেপ্টেম্বর। চালদাবাগান বৈষ্ণব সম্মিলনীগৃহে সন্ধ্যাবেলা কীর্ত্তনিয়া শ্রীনন্দকিশোর "দানলীলা" কীর্ত্তন করিলেন। কীর্ত্তন বেশ জমাট বাঁধিয়া উঠিল। মধ্যে মধ্যে কোন কোন অবিবেচক লোক দেরীতে আসিয়া অপর সকলকে অতিক্রম করিয়া সম্মুখে যাইয়া বসিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, ইহাতে লোকের ভাব ভঙ্গ হইতেছিল এবং কীর্ত্তনের স্রোতে ব্যাঘাত পড়িতেছিল। মানুষ সাধারণ ভদ্রতা ও শিষ্টাচার ভুলিয়া গিয়া অনেক সময় ধর্ম্মস্থানেও বাধার সৃষ্টি করে। রাত্রি প্রায় ৯৷৷০ পর্য্যন্ত কীর্ত্তন শুনিয়া বাড়ীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

২২শে সেপ্টেম্বর সকালে কার্য্যোপলক্ষে বালীগঞ্জে গিয়াছিলাম। কার্য্যসমাপনান্তে রায় বাহাদুর শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। খগেন্দ্রবাবু সুন্দর কীর্ত্তন করেন এবং বৈষ্ণব শাস্ত্রে তাঁহার যথেষ্ট জ্ঞান আছে। অনেকক্ষণ শ্রীভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচনা হইল। বহুক্ষণ আনন্দে কাটাইয়া বেলা প্রায় ১২টার সময় বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম।

(৪৮)

২৩শে সেপ্টেম্বর। অনেক দিন হইতে শ্রীভাগবতে শ্রীভরত মহাশয়ের উপাখ্যান শুনিবার বাসনা ছিল। আচার্য্য মহাশয়ের পাঠ

এবং ব্যাখ্যা এই অপূর্ব্ব কাহিনীকে আরও মধুর করিয়া তুলিবে আমার বিশ্বাস ছিল। অনেকবার আচার্য্য মহাশয় এবং নগেন্দ্রবাবুকে এই বিষয়ে অনুরোধ করিয়াছিলাম কিন্তু নানাবিধ কারণে এই উপাখ্যানের পাঠ আরম্ভ করা সম্ভবপর হয় নাই। নগেন্দ্রবাবুর অনুরোধে আজ সন্ধ্যাবেলা হইতে শ্রীভরত উপাখ্যান পাঠ আরম্ভ হইল। নগেন্দ্রবাবু সম্মিলনীকক্ষে বলিলেন "একজন বিশিষ্ট ভক্তের অনুরোধে" শ্রীভরত মহাশয়ের কাহিনী অদ্য আরম্ভ করা হইতেছে। "বিশিষ্ট ভক্ত"— এই কথার উল্লেখে আমি বিশেষ লজ্জিত হইলাম, তবে আমাকে অধিকাংশ লোকেই চেনেন না এবং নগেন্দ্রবাবু আমার নাম উল্লেখ করেন নাই সুতরাং আমি কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলাম। আচার্য্য শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্র গোস্বামী মহাশয় অপূর্ব্ব মধুর কণ্ঠে সাধারণভাবে আজ শ্রীভরত মহাশয়ের সমস্ত ঘটনাবলী বুঝাইয়া দিলেন এবং পরদিন হইতে শ্রীভাগবত বর্ণিত শ্লোকগুলি ব্যাখ্যা আরম্ভ হইবে বলিলেন। প্রায় দেড়ঘণ্টা পর শ্রীশচীনন্দনের কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। এই বৈষ্ণব ভাবের সহিত কীর্ত্তন করিলেন এবং সকলে মুগ্ধ হইয়া শ্রবণ করিলাম। রাত্রি প্রায় ৯৷৷৹টার পর বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম। আজ ফিরিতে অন্যদিন অপেক্ষা অনেক দেরী হওয়ায় পূর্ণিমা ও আরতি উৎসুক হইয়া আমার জন্য জানালায় অপেক্ষা করিতেছিল দেখিতে পাইলাম।

(৪৯)

৫ই অক্টোবর রবিবার, পূর্ণিমা ও উমাশশী সুকুমারের সহিত বেলা ২টার সময় শ্বশুরবাড়ী চলিয়া যাইল। পূর্ণিমা ৪ঠা আগষ্ট সোমবার আমার সহিত এখানে আসিয়াছিল। এবার দুই মাস পূর্ণিমা এখানে ছিল, সাধারণতঃ সে শ্বশুরবাড়ী হইতে এতদিনের ছুটি পায় না। উমাশশী

আমার খুব কাছে কাছে থাকিত এবং সর্ব্বদাই খেলা করিয়া বেড়াইত। উমা চলিয়া যাইবার পর কিছুদিন বাড়ীটি নিঝুম হইয়া রহিল।

১৭ই অক্টোবর শ্রীদুর্গাপূজার ছুটিতে কলেজ বন্ধ হইল, ১৭ই নভেম্বর কলেজ খুলিবার কথা আছে। অন্যান্য বৎসরেব তুলনায় এইবার পূজার ছুটি কম। কলিকাতায় দাঙ্গাহাঙ্গামার জন্য অনেক দিন কলেজ বন্ধ ছিল, ছাত্রদের পড়াশুনার ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষ ছুটি কমাইতে বাধ্য হইলেন।

(৫০)

১৮ই অক্টোবর, ৩১শে আশ্বিন, শনিবার শ্রীভরত মহাশয়ের উপাখ্যান-পাঠ বৈষ্ণব সম্মিলনীতে সমাপ্ত হইল। প্রায় এক মাস এই পাঠ চলিয়াছিল এবং আমারই অনুরোধে এই পাঠ আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়া আমি প্রতিদিন নিয়মমত এই পাঠ শ্রবণ করিতে যাইতাম। এই কাহিনী অতি অপূর্ব্ব, বিশেষতঃ আচার্য্যপ্রবর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গোস্বামী মহাশয়ের ভাব ও সুমধুর কণ্ঠসংযোগে সমস্ত বিষয়বস্তুটি অতীব হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। পাঠ পরিসমাপ্তিব পর রায়বাহাদুর নগেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সভাস্থিত ভদ্রমণ্ডলীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "যাঁহার অনুরোধে এবং চেষ্টায় আমরা সকলে শ্রীভরত উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া ধন্য হইলাম তাঁহাকে এই সম্মি-লনীর পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।" আমি লজ্জায় অবনত মস্তকে জড়ের মত বসিয়া রহিলাম, ভাবিলাম নগেন্দ্রবাবু আমার নাম করেন নাই ইহাই আমাব সৌভাগ্য। নগেন্দ্রবাবুর কথাগুলি শেষ হইলে আচার্য্য শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় সভাগৃহস্থিত ভদ্রমহোদয়গণকে বলিলেন "শ্রীমান বিনোদবিহারী আমার পুত্রতুল্য, আমি আর ধন্যবাদ কি দিব? আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি হরিভক্তি হউক। হরিভক্তি তাহার

হইয়াছে তথাপি আমি সেই আশীর্ব্বাদই তাহাকে করিতেছি।" এইবার আমার চক্ষের জল রোধ করা কঠিন হইল। আচার্য্য মহাশয় সকলের সম্মুখে আমার নাম করায় আমি লজ্জায় অত্যন্ত ম্রিয়মান হইয়া পড়িলাম, হরিভক্তি হইবে এই আশীর্ব্বচন শ্রবণ করিয়া আমার চক্ষে অবিরল ধারায় অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। আমার সেই সময়কার মনের অবস্থা আমি ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিব না। বাড়ীতে ফিরিয়া নগেন্দ্রবাবু ও আচার্য্য মহাশয়ের কথাগুলি বারংবার মনে পড়িতে লাগিল, নিজের অযোগ্যতা চিন্তা করিয়া আপনাকে অত্যন্ত অপরাধী মনে হইল। পরদিন এই বিষয়ে নিজের মনোভাব কথঞ্চিৎ ব্যক্ত করিয়া নগেন্দ্রবাবুকে যে পত্র লিখিয়াছিলাম তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

শ্রীহরি শরণম্

১৯শে অক্টোবর, ১৯৪৭
রবিবার

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

গতকাল রাত্রিতে শ্রীভরত মহাশয়ের আখ্যান শেষ হবার পর আপনি আমার কথা উল্লেখ করেছিলেন। আপনি আমার নাম করেন নি কিন্তু আপনার পর আচার্য্য মহাশয় আপনার বারণ উপেক্ষা করে আমার নাম করে যা বলেছিলেন তাতে সেই জনাকীর্ণ কক্ষে আমি লজ্জায় ম্রিয়মান হয়েছিলাম। কিছু ভরসা ছিল আমাকে অধিকাংশ শ্রোতাই চেনেন না কিন্তু তথাপি গত রাত্রির লজ্জা আমি আপনার কাছে ভাষায় প্রকাশ কর্ত্তে পারব না। আপনি আমাকে বিশ্বাস করেন তাই সরলভাবে আমার মনের সত্য কথা আমি আপনাকে জানাচ্ছি।

আমি সর্ব্বদাই মনে রাখি যে ঐ হরিসঙ্কীর্ত্তন কক্ষ শত শত সাধু বৈষ্ণবের পদরেণুতে পবিত্র, শ্রীরাধাবিনোদ, শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র

প্রভৃতি বৈষ্ণবের কণ্ঠধ্বনি এখনও ঐ সভাগৃহের বাতাসে তরঙ্গায়িত, বহুবর্ষব্যাপী অমোঘ ভগবৎসেবায় ঐ কক্ষের প্রতি ইষ্টকখণ্ডের প্রতি অনুপরমাণু মধুর ও উজ্জ্বল। সেই কক্ষে আমার মত বিষয়কীটের প্রবেশের অধিকার নেই। তাই আমি সকলের পশ্চাতে সিংহের মধ্যে শৃগালের মত সঙ্কুচিতভাবে আমার বসবার স্থান ক'রে নিই। আমি ঐ কক্ষের শ্রোতৃবৃন্দ সকলের হরিনামকরা দেহকে মনে মনে নিত্য প্রণাম করে তবে শ্রীভাগবতপাঠে মনঃসংযোগ করি। আপনি বৈষ্ণব, তাই তৃণ অপেক্ষাও তুচ্ছ এই বদ্ধজীবকে মানুষের সম্মান দিয়ে আপনার পাশে বসতে আহ্বান করেন। আপনার কাছে মিথ্যা বিনয় কর্ব্বনা, বিনয়ের ভান করা মিথ্যা অপেক্ষাও ঘৃণিত। আপনি বিশ্বাস করুন আপনার এই প্রীতিসূচক আহ্বানে আমি প্রতিদিনই লজ্জিত হই, কিন্তু গত রাত্রির লজ্জা আমার সকল লজ্জাকে অতিক্রম করে গেছে।

ঐ ধর্ম্মক্ষেত্রের পথ আপনি আমাকে চিনিয়েছেন, আপনার সাহসে এই বিষয়কীট শ্রীবিষ্ণুমন্দিরে প্রবেশাধিকার লাভ করেছে। আপনি অকুণ্ঠমেধা, আপনার অসাধারণ স্মৃতিশক্তি, আপনার দেহ ভাবোজ্জ্বল-কান্তিময়। আপনার অনন্যসাধারণ ভক্তিরও পরিচয় আমি কিছু কিছু পেয়েছি। আপনি আমাকে কার্ত্তিক মাসে শ্রীদামোদরাষ্টক স্তোত্র পড়তে শিখিয়েছেন—শ্রীদামোদর স্তোত্র কি এবং কেন তখন আমি জানতাম না। "মনস্তত্ত্ব ও মনোজয়"-এর কথা আপনি ছাপার অক্ষরে আমাকে বারংবার শুনিয়েছেন, শ্রীগীতার কত ভাল ভাল শ্লোকের প্রতি আপনি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আপনাকে সাধারণ লোকে এমন কি নিকট বন্ধুবান্ধবেরাও "রায় বাহাদুর" বলেন। আমি কত দিন মনে মনে হেসেছি যে রায় বাহাদুরের মলিন আবরণের অন্তরালে আপনার মধ্যে যে উজ্জ্বল বৈষ্ণব লুকিয়ে আছেন তাঁকে বেশীর ভাগ লোকই

চেনে না। ঐ রায় বাহাদুরের আচ্ছাদন পর্য্যন্তই সাধারণ চক্ষুর গতি। দুরন্ত শোকের দিনে আপনি হরিনামের সংখ্যা পূরণ করেছিলেন সে কথা আমি ভুলিনি, সে কথা কতবার মনে পড়েছে, কত লোককে বলেছি, আমার "স্মৃতি-কথায়" লিপিবদ্ধ করেছি। "মনস্তত্ত্ব ও মনোজয়" লেখবার অধিকার আপনার আছে। আপনি আমাকে পাঠমঞ্চের পাশে বসতে ডাকেন কিন্তু আমার বহুজন্ম লাগবে আপনার মত বৈষ্ণবের পাশে বসবার অধিকার লাভ কর্ত্তে। আমি জানি জোর করে লোক ঠেলে এগিয়ে গিয়ে বসলেই সেখানে অধিকার জন্মায় না, ভেতর পরিশুদ্ধ না হলে বাইরের সম্মান আঁকড়ে থাকা তুষাবঘাতের মতই বৃথা।

ছোট ডাক্তারবাবুর ঘরে যখন সান্যাল মশাই, সুরেশবাবু প্রভৃতি সকলে এক সময়ে বসতাম তখন প্রায়ই রাত্রিতে আপনি আসতেন, আমি কোন কোন দিন কার্য্যগতিকে হয়ত অনুপস্থিত থাকতাম। একদিন আপনি আমাকে বললেন—"এখানে কদিন আসেন নি কেন? আমি আপনার জন্যই এখানে আসি।" সে কথা শুনে আমার চোখে জল এসেছিল—আমি আজও সেকথা ভুলিনি। আপনার কাছে আমি ঋণী, সে ঋণ কত ভারি আপনি জানেন, আমি জানি। আপনি আমাকে যে সম্মান দেখান তাতে আমি ভুলি না, মনে মনে হাসি। ২।৩ খানা চিঠি লিখেছেন তাতে "শ্রীচরণেষু" এবং "প্রণত" লেখা আছে। এই রকম সম্মান দেখিয়ে আপনি আমাকে লজ্জিত করতে পারেন কিন্তু ভোলাতে পার্ব্বেন না।

আচার্য্য শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে পরিচয়ের মূলে আপনি। অধ্যাপকের কাজ করি, অধ্যাপক বলে সুখ্যাতি আছে, মনে কর্ত্তাম ভাল করেই পড়াই, ভাল করে দুরূহ জিনিষ বুঝিয়ে দিতে পারি। কিন্তু এই আচার্য্য মহাশয়ের অসাধারণ পাণ্ডিত্য এবং ততোধিক

বিশদভাবে ব্যাখ্যা কর্ব্বার শক্তি দেখে নিজের অধ্যাপনা কার্য্যের ওপর ধিক্কার হয়েছে, সমস্ত অহঙ্কার আমার চূর্ণ হয়ে গেছে। অবশ্য তাঁর বিষয়বস্তু অতুলনীয় তা আমি জানি। কত কথা তাঁর মুখ থেকে শুনে এসে খাতায় লিখে রেখেছি তার সংখ্যা নেই। তাই যখন আপনার প্রসাদে বহুদিনের আকাঙ্খিত শ্রীভরত মহাশয়ের আখ্যান শোনবার সৌভাগ্য হল তখন গৃহীর নিত্য বাধা অতিক্রম করেও সমগ্র আশ্বিন মাস রোজ গিয়ে উপস্থিত হয়েছি। যথেষ্ট গ্রহণ কর্ব্বার শক্তি আমার নেই তথাপি শেষ দিনে রাজা রহুগণের কথা-গুলি আমার নিজের কথা হয়ে বারংবার অন্তরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল।

জ্বরাময়ার্ত্তস্য যথাগদং সৎ,
নিদাঘদগ্ধস্য যথা হিমাম্ভঃ।
কুদেহমানাহিবিদষ্টদৃষ্টেঃ
ব্রহ্মন্. বচস্তেঽমৃতমৌষধং মে॥

আমার সব লজ্জা ও দীনতাকে ছাপিয়ে এক আশীর্ব্বাদ কাল আমি শ্রবণ করেছি—"আশীর্ব্বাদ করি হরিভক্তি হউক।" আমি অবনত মস্তকে চোখের জলে এই আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করেছি। আমি জানি যে কক্ষে এই আশীর্ব্বচন উচ্চারিত হয়েছে সে কক্ষের বাতাস হরিনামের ধ্বনি প্রতিধ্বনিতে নিরন্তর মুখরিত, সাধু বৈষ্ণবের পদরজঃ ধারণ করে সে কক্ষের প্রতি অনুপরমাণু চিন্ময়, কলিযুগের শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ পরমার্থপ্রদ শ্রীভাগবতগ্রন্থ সম্মুখে বিরাজমান, যিনি এই আশীর্ব্বাদ আমাকে করেছেন তিনি বৈষ্ণব সুতরাং অমোঘবাক্। আমার জীবনে এমন কৃতার্থতা আর কখনও হয় নি।

আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। ইতি

বিনীত—

শ্রীবিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়।

(৫১)

২১শে অক্টোবর লিখিত কালীঘাট হইতে একখানি পোষ্টকার্ড পাইলাম। অরুণার ছোট ননদ মায়া আরতিকে লিখিয়াছে—"কাল বিকালে ৩-১০ মিনিটে শঙ্কুর একটি বোন হয়েছে এবং ওরা দুজনেই ভাল আছে। তুমি নান্তুদিদি ও বুজিকে খবর দিও।........." সংক্ষিপ্ত এই পোষ্টকার্ড পাইয়া বুঝিতে পারিলাম অরুণার এই চতুর্থ কন্যা নীরব অপ্রসন্নতার মধ্য দিয়াই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহার সূতিকাগৃহের ভিতরে অথবা বাহিরে সেদিন আনন্দের কোন অভিব্যক্তি ছিল না। নবজাতকের মাতামহ তাহাকে আশীর্ব্বাদ ও প্রীতিসহকারে অভ্যর্থনা করিল।

(৫২)

২২শে অক্টোবর, বুধবার, মহাষ্টমী। এবার দুর্গাপূজায় কলিকাতায় খুব ধুম। অপরাহ্ণকালে বাহিরের ঘরে বসিয়া কাজ করিতেছি এমন সময় শ্রীঅশোক চৌধুরী আমার সহিত দেখা করিতে আসিল। এক সময়ে এই যুবক আমার নিকট প্রতিবাসী ছিল, তাহার I. Sc. পরীক্ষার সময় ইহার সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়। কৃতিত্বের সহিত I. Sc. পাস করিয়া অশোক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে Chemistryতে Honours লইয়া B. Sc. পড়ে এবং তথায় প্রথম শ্রেণীর Honours-এর সহিত B. Sc. পাশ করিয়া গভর্ণমেণ্টের বৃত্তি পাইয়া কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য ইংলণ্ডে গমন করে। ঢাকায় চলিয়া যাইবার পরও মধ্যে মধ্যে অশোক আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিল, বিলাত যাইবার কয়েকদিন পূর্ব্বেও আমার নিকট আসিয়া তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের উন্নতির

সম্ভাবনা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিল। মধ্যে মধ্যে এইরূপ যাতায়াত করায় অশোকের সহিত আমার প্রীতির বন্ধন দৃঢ় হয় এবং বিলাতে অবস্থানকালীন তাহার কথা আমার প্রায়ই মনে পড়িত। আজ অশোক আসিয়া আমাকে বলিল সে বড়জাগুলির নিকট হরিণঘাটায় গভর্ণমেণ্টের বিরাট গোশালায় উচ্চপদবী প্রাপ্ত হইয়া কর্ম্মজীবন আরম্ভ করিয়াছে। এই প্রিয়দর্শন যুবকের উচ্চপদ প্রাপ্তিতে আমি বড়ই আনন্দিত হইলাম। অশোকের চক্ষুদ্বয় দেখিলে তাহাকে সহজেই বুদ্ধিমান বলিয়া অনুমান করা যায় সুতরাং তাহার ভবিষ্যৎ উন্নতির সূত্রপাত হইল মনে করিয়া সুখী হইলাম। আমাব জীবনে ছাত্র ও বন্ধুরাই অনেক সময় পরমাত্মীয়ের মত আমাকে গ্রহণ করিয়াছে, জীবনেব বহু নিষ্ফলতার মধ্যে ইহাই আমার আনন্দ ও সার্থকতা।

(৫৩)

২৩শে অক্টোবর, বৃহস্পতিবার, মহানবমী। এবার কলিকাতায় পাঁচ সহস্রাধিক দুর্গাপ্রতিমার পূজা হইতেছে, অধিকাংশই সার্ব্বজনীন। রাস্তায়, ট্রামে বাসে অসম্ভব ভিড়। গত বৎসর হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার জন্য শারদীয়া পূজা নিরানন্দের মধ্যেই হইয়াছিল, এবার হিন্দুদের নিজস্ব গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় পরম আনন্দ ও নিশ্চিন্ততার মধ্যে হিন্দুগণ দেবীর পূজার আয়োজন করিয়াছে। এবার অসংখ্য নূতন সার্ব্বজনীন পূজা হইতেছে, স্ত্রী, বৃদ্ধ, বালক বালিকার স্রোত অনুক্ষণ রাস্তা দিয়া চলিতেছে। গতকাল সন্ধ্যাবেলা Carmichael Medical College-এ সাঁইথিয়ার ডাক্তার শ্রীযুক্ত ননীগোপাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে দেখিতে গিয়াছিলাম। তিনি ঘোড়া হইতে পড়িয়া গিয়া পা ভাঙ্গিয়া চিকিৎসার জন্য আজ কয়েকদিন হাসপাতালে রহিয়াছেন। ট্রামে উঠিবার এবং

ফিরিবার সময় আমার অনেক অসুবিধা হইল, এত ভিড় যে কয়েকখানি ট্রাম ও বাস ছাড়িয়া দিয়া তবে একখানিতে কোনরকমে উঠিতে পারিলাম। বস্ত্র ও অলঙ্কারে সজ্জিত স্ত্রীলোকদিগের ভিড়ই বেশী—দূর দূরান্তরে বিভিন্ন পল্লীতে সকলে দেবী দর্শন করিতে যাইতেছে। বহু বর্ষ পরে এইবার পূজায় বাধা ও ভয়বিহীন নির্ম্মল আনন্দ লক্ষ্য করিলাম।

(৫৪)

২৫শে অক্টোবর, শনিবার, বিজয়া দশমীর পরদিন। সকাল প্রায় ৯টার সময় শ্রীবেচারাম দে আমাকে ৺বিজয়া দশমীর প্রণাম জানাইতে আসিল—হাতে কাঁসার একখানা নূতন ডিস্, এক ঠোঙ্গা উৎকৃষ্ট সন্দেশ। বেচারাম আমার ভূতপূর্ব্ব ছাত্র। ইহার পিতা শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র দে মহাশয়ের রাজাবাজারের নিকট ৮৬ আপার সার্কুলার রোডে বাসনের দুইখানি বৃহৎ দোকান ছিল। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার সময় এই বাসনের দোকান দুইটি সম্পূর্ণভাবে লুণ্ঠিত হয় এবং মুসলমান দস্যুগণ বাড়ীটি পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া স্থানে স্থানে অগ্নি প্রদান করে। বহুবৎসরের এই দোকানে বহু সহস্র মুদ্রার জিনিষপত্র ছিল, একখানি বাসনও রক্ষা করিতে পারা যায় নাই, কোনরূপে প্রাণ লইয়া দোকানের কর্ম্মচারীগণ হিন্দু পল্লীতে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। বেচারাম প্রায় ৯ মাস কাল আমার নিকট পড়িতে আসিয়াছিল এবং এই বৎসর সিটি কলেজ হইতে I. A. পরীক্ষা দিয়াছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অকৃতকার্য্য হয়। সাধারণতঃ ছাত্রেরা অকৃতকার্য্য হইয়া পড়াশুনা ছাড়িয়া দিলে শিক্ষকের সহিত দেখাশুনা করে না কিন্তু বেচারাম মিষ্টান্ন লইয়া বিজয়াদশমীর প্রণাম করিতে আসিয়াছে দেখিয়া বিস্মিত হইলাম।

পূর্ব্বে অনেকবার সে আমাকে মিষ্টান্ন আনিয়া দিয়াছিল, কিন্তু তখন সে আমার ছাত্র। অল্পদিনের মধ্যেই শ্যামবর্ণ, ক্ষীণকায়, স্বল্পভাষী এই যুবকের চরিত্র ও স্বভাবের প্রকৃত পরিচয় পাইয়া আমি তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। বেচারাম বলিল গতকল্য তাহারা "দে পাল এণ্ড ব্রাদার্স" নামে ৮৯, হ্যারিসন রোডে একটি নূতন বাসনের দোকান খুলিয়াছে। আমি বেচারামকে বলিলাম "আমি তোমার জন্য কিছুই করিতে পারি নাই, তুমি পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়াছ, পড়াশুনা ছাড়িয়া দিয়াছ অথচ তুমি আমাকে বিস্মৃত হও নাই, তুমি আমার জন্য নূতন দোকানের বাসন আনিয়াছ, প্রচুর সন্দেশ আনিয়াছ। আমি তোমার কোন উপকারে লাগি নাই, কিন্তু আজ তোমার প্রীতিতে আনন্দিত হইয়া শ্রীভগবানকে স্মরণ করিয়া তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমার জীবন সার্থক হ'ক, তোমার নূতন ব্যবসার উন্নতি হ'ক, তোমার আশা পূর্ণ হ'ক। আমি মনে প্রাণে তোমাকে আজ এই আশীর্ব্বাদ করিতেছি।" বেচারাম প্রণাম করিয়া গৃহে ফিরিয়া যাইল, সমস্ত দিন ক্ষণে ক্ষণে এই যুবকের মিষ্ট ব্যবহার, নিঃস্বার্থ প্রীতি ও উদার হৃদয়ের কথা আমার মনে পড়িতে লাগিল।

(৫৫)

১লা নভেম্বর, শনিবার। এখনও শারদীয়া পূজার অবকাশ চলিতেছে। আজ সকালে বন্ধুবান্ধবগণের সহিত দেখা করিবার জন্য এবং ভবানীপুরের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র গুণেন্দ্রের বাড়ীতে শ্রীগোপাল বিগ্রহ দর্শন করিবার জন্য প্রথমে বালীগঞ্জ অভিমুখে যাত্রা করিলাম। প্রথমেই বালীগঞ্জে Fern Road-এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, আমার বাল্যবন্ধু শ্রীকুমুদ বন্ধু রায়ের বাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। কুমুদের বাল্য-

কালেই একটি চক্ষু নষ্ট হইয়াছিল কিন্তু নষ্ট স্বাস্থ্য লইয়াই অসীম অধ্যবসায় সহকারে বিশ্ববিদ্যালয়ের B. A. ও M. A. পরীক্ষায় ইংরাজীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া কুমুদ M. A. Class-এর ইংরাজির অধ্যাপক নিযুক্ত হয়। সম্প্রতি কুমুদের সুস্থ চক্ষুটিতে ছানি পড়িতেছে বলিয়া অস্ত্রচিকিৎসার প্রয়োজন হইয়াছে। নিজের শারীরিক অসুস্থতা, তাহার উপর সাংসারিক নানাবিধ দুশ্চিন্তায় কুমুদের মন অবসন্ন বলিয়া মনে হইল। আমরা বহরমপুরে যখন প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতাম তখনকার নানাবিধ পুরাতন প্রসঙ্গ উত্থিত হইল, ধর্ম্ম বিষয়েও অনেক আলোচনা করিলাম। কুমুদ বলিল জীবন যত অগ্রসর হয় ততই যেন দুঃখের বোঝা বাড়িয়া চলে, পূর্ব্বের সুখের স্মৃতিই তখন মধুর লাগে। কুমুদের বাড়ী হইতে তাহার ঠিক পাশের বাড়ীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্ত্তীর সহিত দেখা করিতে যাইলাম। ইঁহার কথা পূর্ব্বে স্থানান্তরে উল্লেখ করিয়াছি। ধর্ম্মশাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত এই বন্ধুর সহিত দেখা করার ইচ্ছা আমার প্রায়ই হয় কিন্তু দূর বলিয়া এবং কাজের চাপে ইচ্ছামত সেখানে যাইতে পারি না। আজ আমাকে দেখিবামাত্র ত্রিপুরারিবাবু দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া আমাকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন। বহুক্ষণ শাস্ত্র আলোচনা হইল—আলোচনা কিছুই নয়, আমি শ্রোতা তিনি বক্তা। মহাভারতের উদ্যোগ পর্ব্বের একটি শ্লোক তিনি আমাকে পড়িয়া শুনাইলেন। যুদ্ধের পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ কুরুসভায় যাইবার সময় কুন্তীদেবীর সহিত সাক্ষাৎ করিতেছেন। কুন্তীদেবী কুরুসভায় দ্রৌপদীকে বিবস্ত্র করার চেষ্টার তীব্র নিন্দা করিয়া বলিলেন যে সেই সভায় বহুবীর যোদ্ধা ও পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে একমাত্র দাসীপুত্র বিদুর এই নিন্দনীয় কার্য্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, অপর সকলে রাজসভায় নির্ব্বাক। কুন্তীদেবী শ্রীকৃষ্ণকে

বলিলেন সেই সভাস্থ সকলের মধ্যে একমাত্র দাসীপুত্র বিদুরই তাঁহার প্রণম্য।

তস্যাং সংসদি সর্ব্বেষাং ক্ষত্তারং পূজয়াম্যহম্
বৃত্তেন হি ভবত্যার্য্যো ন ধনেন ন বিদ্যয়া।

কী চমৎকার কথা! অথচ ইহা একজন নারীর মুখ হইতে বাহির হইয়াছিল। ত্রিপুরারিবাবু আরও নানাবিধ ধর্ম্মকথা আমাকে শুনাইলেন, তাহার ভিতর আর একটি শ্লোক এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। শর-শয্যায় মহাবীর ভীষ্ম শয়ন করিয়া আছেন, কর্ণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইলেন। ভীষ্ম সূতপুত্র কর্ণকে পৌত্র বলিয়া সম্বোধন করায় কর্ণ বিস্মিত হইলে সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ভীষ্ম তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—

যৌনাৎ সম্বন্ধকাৎ লোকে বিশিষ্টং সঙ্গতং সতাম্
সদ্ভিঃ সহ নরশ্রেষ্ঠ! প্রবদন্তি মনীষিণঃ।

[শরীরজাত আত্মীয়তার সম্বন্ধ অপেক্ষা সৎ লোকের সহিত সৎ লোকের সম্বন্ধ অধিকতর সত্য ও দৃঢ়, ইহাই পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন।]
এই একই কথা যীশুখৃষ্ট, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও বলিয়াছিলেন—বিশুদ্ধ আত্মার সম্বন্ধ দৈহিক সম্বন্ধ অপেক্ষা অধিক সত্য ও প্রীতিপদ। ত্রিপুরারিবাবুর সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে জানিলাম যে তাঁহার একটি কন্যা মেডিক্যাল কলেজে রোগশয্যায় শায়িত—উদরের ভিতর ফোড়া হইয়া তাহাতে অস্ত্রোপচার করিতে হইয়াছে। মনের উপর কতবড় বিপদের দুশ্চিন্তা রহিয়াছে অথচ এতক্ষণ কথাবার্ত্তার মধ্যে আমি একবারও ত্রিপুরারিবাবুর মনের সেই চিন্তাভার সন্দেহ করিতে পারি নাই। আমাকে বক্ষে জড়াইয়া ধরা, আনন্দ ও উৎসাহ সহকারে ধর্ম্মকথা আলোচনা

করা সমস্তই চলিতেছিল অথচ পিতার স্নেহের কন্যা গৃহ হইতে দূরে একাকিনী হাসপাতালের রোগশয্যায় জীবন মরণের ভিতর দিয়া সময় অতিবাহিত করিতেছে! আমি বিস্মিত হইয়া ভাবিলাম যে শাস্ত্রপাঠ এই গৃহী অধ্যাপকের সার্থক হইয়াছে, ভূমার আনন্দ তিনি আস্বাদন করিতে শিখিয়াছেন, কিয়ৎক্ষণের জন্যও সংসার ভুলিবার সৌভাগ্য ভগবান তাঁহাকে দিয়াছেন।

(৫৬)

ত্রিপুরারিবাবুর নিকট বিদায় লইয়া ভবানীপুর ৯, জাষ্টিস্ চন্দ্রমাধব রোডে ভূতপূর্ব্ব ছাত্র শ্রীমান গুণেন্দ্রের বাড়ীতে তাহাদের গৃহদেবতা শ্রীগোবিন্দজিউকে দর্শন করিতে যাইলাম। তাহাকে গত বৎসর প্রায় ৭ মাস পড়াইয়াছিলাম কিন্তু শ্রীগোবিন্দের দর্শনলাভ হয় নাই। পরীক্ষার পর যখন বিদায় গ্রহণ করি তখন মনে মনে গোবিন্দকে প্রণাম করিয়া জানাইয়াছিলাম যে যদি গুণেন্দ্র পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হয় এবং গোবিন্দ আমার মুখ রক্ষা করেন তাহা হইলে একদিন আসিয়া তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করিব নতুবা এই বাটীতে আর প্রবেশ করিব না। গোবিন্দ আমার প্রাণের কথা শুনিয়াছিলেন, গুণেন্দ্র কৃতকার্য্য হইল, আমার মুখরক্ষা হইল কিন্তু এতদিন কোন না কোন অসুবিধার জন্য শ্রীগোবিন্দ দর্শন আমার হইয়া উঠে নাই। আজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া বাহির হইয়াছিলাম শ্রীগোবিন্দকে দেখিয়া তবে বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিব। ট্রামে করিয়া যাইতে যাইতে মনে হইল গোবিন্দ কি এত সহজেই আমাকে দেখা দিবেন? আমি গোবিন্দের নিকট অপরাধী, বহুদিন পূর্ব্বেই তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করা উচিত ছিল, আমি অবহেলা করিয়াছি সুতরাং তিনি সহজে আমাকে নিকটে যাইতে দিবেন না। কার্য্যেও ঠিক

তাহাই হইল. গুণেন্দ্রের পিতা সুরেশবাবু বলিলেন যে তখন দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে, গোবিন্দ ভোগ গ্রহণ করিয়া বিশ্রাম করিতেছেন, আজ তাঁহার দর্শন পাওয়া যাইবে না। আমি মনে মনে হাসিলাম এবং গোবিন্দকে বলিলাম "তুমি অভিমান করিয়া আমাকে আজ ফিরাইয়া দিতেছ, ভাল, কিন্তু আমার মন তোমার শ্রীচরণে বাঁধিয়া দিতেছি তুমি আমাকে কতদিন বঞ্চিত করিয়া রাখিবে! আমি অধম হইলেও তোমার দাস, আমি দাসের অধিকারে বলবান, আমি আবার আসিব, আমি জোর করিয়া তোমার শ্রীচরণ বক্ষে ধারণ করিব।" আমি অন্যমনস্ক হইয়া ভাবিতেছি দেখিয়া সুরেশবাবু আমাকে বলিলেন যে অপর কোন দিন বেলা ১১টার পূর্ব্বে আসিলে শ্রীগোবিন্দ দর্শন অবশ্যই হইবে। গুণেন্দ্রের কথামত ৩রা নভেম্বর সোমবার দিন স্থির হইল, আমি শ্রীগোবিন্দ দর্শন করিব, এবং গোবিন্দের প্রসাদ গ্রহণ করিব। ৩রা নভেম্বর যথাসময়ে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। শুভ কার্ত্তিক মাস, নানাবস্ত্র অলঙ্কারে বিভূষিত চিণ্ময় বিগ্রহ দর্শন করিলাম, চক্ষের জলে চরণ বিধৌত করিয়া দিলাম, কাছে বসিয়া শ্রীদামোদরাষ্টক পড়িয়া গোবিন্দকে শুনাইলাম। আজ গোবিন্দ আমাকে বড়ই আদর করিলেন, সেদিন প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন আজ শ্রীচরণে স্থান দিলেন, অপূর্ব্ব সুস্বাদু তাঁহার উচ্ছিষ্ট অন্ন ভোজন করিয়া আমি ধন্য হইলাম। ভোগ গ্রহণের পর বাহিরের ঘরে বসিয়া গুণেন্দ্র, সুরেশবাবু ও গুণেন্দ্রের ভগ্নীপতি ঢাকার উকিল নন্দলালবাবুর সহিত নানাবিধ কথাবার্ত্তা কহিয়া আমি বেলা প্রায় ৩॥০টার সময় বাড়ীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

(৫৭)

রিপণ কলেজ, কমার্স বিভাগে যখন সন্ধ্যাবেলা পড়াইতাম তখন শ্রীবিভূতিভূষণ রায় চৌধুরী নামক জনৈক ছাত্রের সহিত আমার পরিচয়

হয়। বিভূতির দেশ বরিশাল জেলা, গ্রাম কুলকাটি। আমার অধ্যাপক জীবনে সহস্র সহস্র ছাত্রগণের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক ছাত্রের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। আমি স্বভাবতঃ মিশুক নহি কিন্তু যাহাদের সহিত আমার হৃদয়ের মিল হয় তাহারা আমার পরম আত্মীয়ের স্থান সহজেই অধিকার করিয়া বসে। এইরূপ আত্মীয়স্থানীয় ছাত্রগণের মধ্যে বিভূতিভূষণ অন্যতম। বিভূতি এখন হাবড়ায় Jardine Henderson Ltd কোম্পানীর অধীনে Store keeper-এর চাকরি করে। সে আমাকে প্রায়ই চিঠিপত্র লেখে। চিঠির ভিতর দিয়া তাহার মন আমার কাছে খুলিয়া দেয়, তাহার সমস্ত জীবনটা আমি পরিষ্কার দেখিতে পাই। আমি চিঠিপত্র দিতে দেরী করিলে বিভূতি অভিমান করে, পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিয়া আমার সংবাদ লয়। ৩১শে অক্টোবর একখানি চিঠিতে বিভূতি লিখিয়াছিল—"আমি মনে করিয়াছিলাম আমার কোন অপরাধ হইয়াছে যার জন্য আপনার চিঠি এতদিন পাই নাই। ·····একদিন ইতিমধ্যে আপনাকে রাস্তায় যেতে দেখেছিলাম, ইচ্ছা ছিল আলাপ করি, কিন্তু কেন যেন ভয় হল।··· আপনার আশীর্ব্বাদী চিঠি পেলে সত্যই আমি নিজেকে খুব ধন্য মনে করি। মাঝে মাঝে ২।১ খানি চিঠি দিলে আমার দুর্গম যাত্রাপথ অনেকটা সুগম বলে মনে করি।" বিভূতির চিঠি পড়িয়া আমি বসিয়া বসিয়া ভাবি—২।৩ বার চিঠিখানি পড়ি। আমাকে দেখিয়া তাহার ভয় হইয়াছিল লিখিয়াছে, তাহার এই লেখা পড়িয়া লজ্জিত হইলাম—হয়ত কোথাও আমার চরিত্রের কোনও ত্রুটি আছে যাহা পথিমধ্যেও আমার আকৃতিতে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। তবু ভাবি বিভূতি আমাকে কত ভালবাসে, সে পূর্ব্বে পড়িত এখন ছাত্র নয়, সংসার করিতেছে, তথাপি আমাকে ভোলে নাই। আমি শিক্ষক, সে সওদাগরী আপিষে কর্ম্মচারী—অনেক

প্রভেদ। আমি তাহার কোন উপকার জ্ঞাতসারে করি নাই, ইহ-জীবনে কোন উপকার করিবার সম্ভাবনাও নাই। তথাপি বিভূতি আমার চিঠি চায়, আমার প্রতি প্রীতিবশতঃ আমার কথা শুনিতে ভালবাসে। একবার চিঠিতে বিভূতি লিখিয়াছিল—"প্রথম যেদিন 1st year class-এ আপনি পড়াতে ঢোকেন সেই দিন হইতেই আমি আপনার মধ্যে নূতন এমন কিছু দেখেছি যা কোনদিন ভুল্‌বনা বা ভোলার নয়।···আপনার Photograph আমার কাছে আছে।" বিভূতি আমাকে অসংখ্য এইরূপ চিঠি লেখে, খুব বড় চিঠি ৪।৫ পাতায় ভর্ত্তি। চিঠি আরম্ভ করে—"শ্রীশ্রীচরণ কমলেষু, প্রণামান্তে সেবকের নিবেদন·· ···", চিঠি শেষ করে "ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন। ইতি প্রণত বিভূতি।" আমি ছাত্রদের ভক্তি এবং প্রণাম কতটা দাবী করিতে পারি, ভগবান দয়া করিয়া সে বিষয় আমার কোন ভুল ধারণা রাখেন নাই। অথচ ইহারা ভক্তি ও প্রণাম আমাকে জানায়। আমি চিঠি পড়ি, একাকী বসিয়া নিজের কাছেই নিজের লজ্জা হয়, মানুষের এই নিঃস্বার্থ প্রীতির ভিতরে ভগবানের দয়া দেখিয়া চক্ষুদ্বয় অশ্রুতে প্লাবিত হইয়া যায়।

এই বিভূতিভূষণ শ্যামবর্ণ, সাধারণ বাঙ্গালীর মত আকৃতি, কিন্তু চক্ষুদ্বয় শান্ত ও কোমল। শরীরের গঠন দেখিয়া মনে হয় পরিশ্রমী এবং কর্ম্মক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য। একবার বিভূতি একখানি চিঠিতে তাহার আয়ব্যয় সম্বন্ধে এমন একটি কথা লিখিয়াছিল যে তাহার সরলতা দেখিয়া আমি বারংবার একাকী বসিয়া হাসিয়াছিলাম। বিভূতি মাতৃভক্ত, ইহা আমি অপরের মুখেও শুনিয়াছিলাম। একবার তাহার মায়ের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া আমি চিঠি লিখিলে বিভূতি তাহার উত্তরে আমাকে লিখিয়াছিল—"মা আমাকে খুব বেশী ভালবাসেন কিন্তু আমি মাকে প্রকাশ্যে ভালবাসি না, তবে অন্তরে আমি মাকে সবচেয়ে

বেশী ভালবাসি।” কি সরলতার সহিত বিভূতি তাহার মনের অতি নিভৃতকক্ষ আমার নিকট উন্মোচন করে তাহা এই লেখা হইতে সহজেই অনুমান করা যায়। বিভূতির বয়স প্রায় ৩৫ বৎসর। এইরূপ চিঠির আদানপ্রদানের ভিতর দিয়াই বিভূতির সহিত আমার নিবিড় পরিচয়—বিভূতি আমার কাছে বেশী আসে না, দূর হইতেই সে আমার প্রীতি দাবী করে, আমাকে তাহার প্রীতি জানায়। বিভূতি জোর করিয়া আমার মন অধিকার করিয়াছে, তাহার কথা কত সময় অকারণে মনে পড়ে, আমি কোন কোন দিন রাত্রিতে শয়নকক্ষে রুদ্ধদ্বারের ভিতর বিভূতির সুখ ও শান্তির জন্য দেবীর চরণে আমার কাতর প্রার্থনা নিবেদন করি—সংসারে প্রত্যক্ষভাবে এই স্নেহশীল ছাত্রবন্ধুর কোন উপকার করিবার শক্তি ভগবান আমাকে দেন নাই।

(৫৮)

৮ই নভেম্বর, শনিবার। বহুদিন হইতে আরতির তারকেশ্বরে ৺তারকনাথকে দর্শন করিবার ইচ্ছা ছিল। আরতি পূর্ব্বে আর কখনও শ্রীতারকনাথকে দেখে নাই। এইবার আমার দুর্গাপূজার ছুটি আরম্ভ হইতেই আরতি তারকেশ্বরে যাইবার ব্যবস্থা করিতে বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে একদিন হাবড়া হইতে প্রফুল্ল দেখা করিতে আসিল। প্রফুল্ল পুলীশ ইন্‌স্পেক্টার, সে পূর্ব্বেও একবার তারকনাথ দর্শন করিবার সমস্ত সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিল। আরতি দেব দর্শন করিতে চায় বলায় প্রফুল্ল সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিবে প্রতিশ্রুতি দিল। যথাসময়ে প্রফুল্লর চিঠি আসিল, গিরীন্দ্রবাবু নামক জনৈক পুলীশ ইন্‌স্পেক্টরের ভাগিনেয় শ্যামাপদবাবু তারকেশ্বরে বাস করেন, তিনি ৮ই নভেম্বর ষ্টেসনে উপস্থিত থাকিয়া আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া দেবদর্শনের

সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। প্রফুল্লর নির্দ্দেশমত আজ সকাল ৬টার সময় বাসে করিয়া আমি ও আরতি হাবড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। শ্রীতারকনাথকে দর্শন করিবার আশায় আরতির উৎসাহের সীমা নাই।

বেলা প্রায় ১০॥০টার সময় তারকেশ্বর ষ্টেশনে পৌছিলাম। শ্যামাপদবাবু উপস্থিত ছিলেন না, অনুসন্ধান লইয়া জানিলাম তিনি নিজদেশে চলিয়া গিয়াছেন। প্রথমটা নিজেকে একটু বিব্রত মনে হইল, কিন্তু পরক্ষণেই তারকনাথ মনে সাহস দিলেন। ষ্টেশনে শ্রীবিশ্বনাথ সিংহ রায় নামে জনৈক তরুণবয়স্ক, গৌরবর্ণ পূজারীর সহিত পরিচয় হইল, তিনি আমাদের ঠাকুরদর্শন ও পূজা দিবার সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিবেন বলিলেন। আমি তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে অগ্রসর হইলাম। ইতিমধ্যে শ্রীযুক্ত কমলাক্ষ চৌধুরীর কথা আমার মনে পড়িল। ইনি আমার বন্ধু ডাক্তার শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী চৌধুরী মহাশয়ের ভগিনীপতি শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জামাতা। জ্ঞানবাবু বর্দ্ধমানের উকিল, তাঁহার সহিত আমার গিরিডিতে পরিচয় হইয়াছিল। কমলাক্ষবাবু মহন্ত মহারাজের সেক্রেটারী। ইঁহার সহিত আমার পূর্ব্বে পরিচয় ছিল না, তথাপি ইঁহার শরণাপন্ন হওয়াই স্থির করিলাম। আমি কমলাক্ষবাবুর নিকট লইয়া যাইবার জন্য বিশ্বনাথবাবুকে অনুরোধ করিলাম। কমলাক্ষবাবুর সহিত দেখা হইলে তাঁহার শ্বশুরের কথা উল্লেখ করিয়া আমার ও আরতির দেবদর্শনের ব্যবস্থা করিয়া দিতে অনুরোধ করিলাম। কমলাক্ষবাবু অতি ভদ্রতাসহকারে আমাদের পূজাপ্রদান প্রভৃতি কার্য্যের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তারকনাথের মন্দিরে যে কর্ম্মচারী বসিয়া পূজা বা দক্ষিণা গ্রহণ করেন কমলাক্ষবাবু তাঁহাকে একখানি চিঠি লিখিয়া বিশ্বনাথবাবুর সহিত আমাদিগকে প্রেরণ করিলেন এবং বলিয়া দিলেন যে পূজা দেওয়া হইলে আমরা

কমলাক্ষবাবুর নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া অন্ন প্রসাদ গ্রহণ করিব। সেদিন বাবার মন্দিরে অত্যন্ত ভিড়। স্নানাদি সমাপনান্তে মন্দিরে প্রবেশ করিলাম, পুরোহিত কমলাক্ষবাবুর পত্রমত ব্যবস্থা করিয়া দিলেন, একদিকের ভিড় সরাইয়া দিলেন, কেবলমাত্র আরতি ও আমি তারকনাথের অতি নিকটে বসিয়া তাঁহাকে দর্শন করিলাম, তাঁহার মস্তকে বিল্বপত্র ও ধুতুরা ফুল দিয়া প্রণাম করিলাম। পূর্ণিমার বিবাহের সময় শ্রীশ্রীতারকনাথের পূজার জন্য রাখা দশ টাকারও পূজা দেওয়া হইল। পুরোহিত মহাশয় মন্ত্রোচ্চারণ করিতে বলিলেন কিন্তু সে মন্ত্রের অধিকাংশই আমার কর্ণে প্রবেশ করিল না, আমার বক্ষ ভরিয়া তখন আনন্দের এক অপূর্ব্ব বেদনা বিরাজ করিতেছিল। নিকটেই কালীমূর্ত্তি ও অন্যান্য দেবদেবী মূর্ত্তি দর্শন করিয়া পুরোহিতের সহিত কমলাক্ষবাবুর নিকট ফিরিয়া আসিলাম। পথে শ্রীমহন্ত মহারাজের দুইটি হস্তী দাঁড়াইয়াছিল, একটি হস্তীর শুণ্ডে আরতি পয়সা দিবামাত্র শুণ্ডটি উত্তোলন করিয়া হস্তী মাহুতকে পয়সাটি দিল দেখিয়া আরতি খুব বিস্মিত ও আনন্দিত হইল।

কমলাক্ষবাবুর বন্দোবস্তমত আমি ও আরতি অন্ন সেবন করিলাম। তখন ট্রেনের অনেক দেরী, এইবার বাজারে যাইয়া আরতি খেলনা কিনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। আমি ও আরতি বাজারের দোকানে ঘুরিয়া কয়েকটি কাষ্ঠের খেলনা কিনিলাম, ৺তারকনাথের মাহাত্ম ছাপান পুস্তক ক্রয় করিলাম। ইতিমধ্যে পুরোহিত মহাশয় আমাদিগকে দেখিতে পাইয়া বাবার রাজবেশ ও পূজা দেখিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। আরতি ও আমি বিশ্বনাথবাবুর সহিত যাইয়া মন্দির দ্বারের অতি নিকটে দাঁড়াইয়া তারকনাথের রাজবেশ ও পূজা আরতি দর্শন করিলাম। ভস্মাঙ্গরাগা তনু সুবর্ণ অলঙ্কারে সুশোভিত, কত মূল্যবান বস্ত্র ও

অলঙ্কার শ্মশানবাসী দেবতাকে ভক্ত মানব পরাইয়া দিয়াছে! উজ্জ্বল বস্ত্র, দীপ্তিময় সুবর্ণ সেই দেব অঙ্গের কান্তি স্পর্শে ম্লান হইয়া গিয়াছে, আমি দেখিতে পাইলাম। কিয়ৎক্ষণ এই সন্ন্যাসীকে মহারাজাধিরাজ মূর্ত্তিতে অবলোকন করিয়া আমরা কিয়দ্দূর চলিয়া আসিয়াছি এমন সময় প্রধান পুরোহিত মহাশয় আমাকে ভাল করিয়া দেবদর্শন করিবার জন্য পুনরায় আহ্বান করিলেন। আমরা ফিরিয়া যাইয়া পুনরায় মন্দির দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অতি সুন্দরভাবে দেবাধিদেবকে দর্শন করিতে লাগিলাম। আমার মনে হইল বাবা আজ আমাদের অশেষ স্নেহ ও দয়া করিলেন, আমরা চলিয়া যাইতেছিলাম তিনি পুনরায় হাত ধরিয়া ফিরাইয়া আনিলেন, যেন আরও কিছুক্ষণ তাঁহার নিকট দাঁড়াইয়া তাঁহাকে দর্শন করি। মহেশ্বরের এই দুর্ল্লভ ভালবাসার ইঙ্গিত আমি বুঝিতে পারিলাম, অবনত মস্তকে তাঁহার সুশীতল স্নেহআশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলাম। মধ্যাহ্নের পূজা শেষ হইল, দ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল, আমি ও আরতি ভোগের প্রসাদ লইয়া ফিরিয়া আসিলাম। পূজারী শ্রীবিশ্বনাথ সিংহ রায় মহাশয় আমাদিগকে ষ্টেশনে পৌঁছাইয়া দিলেন। শ্রীতারক-নাথের অসীম দয়ায় অতি সহজে, অতি পরিপাটীরূপে, নির্ব্বিঘ্নে ও নিশ্চিন্ত মনে তাঁহাকে দর্শন করিয়া, পূজা দিয়া, জীবন কৃতার্থ করিয়া সন্ধ্যা ৬৷০টার সময় বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। ট্রেনে, পথে, বাড়ীতে এবং রন্ধন করিতে করিতে ক্ষণে ক্ষণে আরতি শ্রীতারকনাথের কথাই বলিতেছিল। আমি দেখিলাম শ্রীতারকনাথ আরতির সমস্ত মন অধিকার করিয়া আছেন, তাহার দেবদর্শন সার্থক হইয়াছে।

(৫৯)

১৭ই নভেম্বর, সোমবার, শারদীয়া পূজার ছুটির পর কলেজ খুলিল।

২০শে নভেম্বর, বৃহস্পতিবার, ছাত্র তারাপদর ভগ্নী অন্নপূর্ণা ও

জ্যোৎস্না এবং দমদম নিবাসী বন্ধু শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ সান্ন্যালের কন্যা প্রণতি আমাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইতে আসিয়াছিল। সকলেই নির্দ্দেশমত সকাল ৮টার মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। অন্নপূর্ণা I. A. দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী, জ্যোৎস্না প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ে। এই উভয় ভগ্নীই আমার ছাত্রী, সপ্তাহে চারদিন ৫২, সার্পেণ্টাইন লেনে ইহাদিগকে পড়াইতে যাই। প্রণতি I. A. দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী, দমদম হইতে মধ্যে মধ্যে আমার কাছে পড়াশুনা জিজ্ঞাসা করিতে আসে। সিটিকলেজের বোটানীর খ্যাতনামা অধ্যাপক বন্ধু শ্রীহেমেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহিত সকালে কলেজে দেখা হইয়াছিল, হেমেন্দ্র ভাত খাইয়া আসে নাই, তাই হেমেন্দ্রকেও মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম। বেলা ১১টার মধ্যে আরতি নানাবিধ অন্নব্যঞ্জন একাকী রন্ধন করিল—মাছের মুড়া দিয়া ডাল, চিংড়ি ও কপির কালিয়া, ভেটকী মাছের ঝাল, ভেটকী মাছের চপ ও রুই মাছের অম্বল। আমি কার্ত্তিক মাসে নিয়মসেবা উপলক্ষ্যে নিরামিষ ভোজন করিতেছি বলিয়া আমার জন্য নিরামিষ ব্যঞ্জনও পৃথক ভাবে আরতি রন্ধন করিয়াছিল। সমস্তই সে একাকী কুটিয়া রন্ধন করিয়া ১১টার পূর্ব্বেই খাইতে দিয়াছিল। হেমেন্দ্র ও অন্যান্য মেয়েরা বলিল সমস্ত ব্যঞ্জনই সুস্বাদু হইয়াছে, এবং আরতির কর্ম্মতৎপরতা দেখিয়া জ্যোৎস্না বারংবার প্রশংসা করিতে লাগিল। অন্নপূর্ণা ও জ্যোৎস্না বেলা ২টার পর তারাপদর সহিত তাহাদের মোটরে করিয়া বাড়ী ফিরিয়া যাইল, সন্ধ্যার পূর্ব্বে সচ্চিদানন্দ আসিয়া প্রণতিকে বাড়ী লইয়া যাইল।

(৬০)

২১শে নভেম্বর, শুক্রবার। সকালে সাঁইথিয়া হইতে ডাক্তার শ্রীযুক্ত ননীগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীঅনাদি নাথ চট্টোপাধ্যায় কৃষ্ণর

জনৈক কর্ম্মচারীর সহিত আসিয়া উপস্থিত হইল। অনাদি সিটি কলেজে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইয়াছে। ননীবাবু অনাদির হাতে আমার জন্য পুকুরের প্রায় ৭।৮সের একটি কাত্‌লা মাছ দিয়াছিলেন, কৃষ্ণপ্রসন্ন ১৩টি কই মাছ ও একটিন আখের গুড় দিয়াছিল। প্রচুর দ্রব্যাদি পাইয়া, বিশেষতঃ মাছটি দেখিয়া আরতির আনন্দের সীমা নাই। মাছ কুটিয়া পাড়ায় প্রতিবাসীদের মধ্যে কিছু কিছু দেওয়া হইল, যথেষ্ট পরিমাণে আরতির জন্য রাখিয়া দেওয়া হইল। আজ ৫ই অগ্রহায়ণ হইলেও কার্ত্তিক মাসের নিয়মসেবা এখনও চলিতেছে বলিয়া আমি মাছ খাইলাম না। সুতরাং বাড়ীতে মাছ খাইবার লোক একমাত্র আরতি। মাছের উপর আমার অত্যন্ত লোভ, এ লোভ আমি কিছুতেই দমন করিতে পারি না, সম্মুখে প্রচুর সুস্বাদু মাছ রহিয়াছে দেখিতে লাগিলাম। আমি মনে মনে ভাবিলাম দেবী আমাকে পরীক্ষা করিতেছেন, আমার চিত্ত যে কত দুর্ব্বল, আমি তাঁহার পরীক্ষার কত অযোগ্য তাহা যেন বিশ্বজননী জানেন না! তথাপি মনে মনে বিশ্বমাতাকে শ্রীভাগবতের শ্লোক শুনাইলাম। উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন

উচ্ছিষ্ট ভোজিনো দাসাস্তবমায়াং জয়েমহি।

[হে দেব, আমি তোমার উচ্ছিষ্ট প্রসাদান্ন ভোজী দাস। তোমার উচ্ছিষ্ট প্রসাদ গ্রহণ করিয়াই তোমার দয়ায় তোমার মায়া জয় করিবার শক্তিলাভ করিব। প্রভুর দয়াতেই দাসের শক্তি, সেই শক্তিতেই প্রভুর মায়া পরাজিত হইবে।]

আমিও দেবীকে বলিলাম "মা, আমি তোমার দেখান লোভকে কেয়ার করি না। তোমার দাস আমি। তোমার দয়া ও নামের শক্তিতে তোমাকে পরাজিত করিব।" মধ্যে মধ্যে মাছ কুটা, ভাজা, রন্ধনকরা

দেখি, জিহ্বায় লালসার সঞ্চার হয়, আবার হাসিয়া ঢোক গিলিয়া বুক ফুলাইয়া দেবী প্রতিমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াই, আর মাকে বলি—"মা তুমি হেরে গেলে।" আরতি ২।৩ দিন ধরিয়া পরমতৃপ্তি সহকারে সেই মাছ খাইল।

(৬১)

২৮শে নভেম্বর, সার্পেনটাইন লেনে পড়াইয়া ট্রামে করিয়া বাড়ী ফিরিতেছি, বেলা প্রায় ৩টা। ট্রামখানি শিয়ালদহের নিকট দাঁড়াইয়াছে, লক্ষ্য করিলাম একটা জনস্রোত ষ্টেসনের দিক হইতে সার্কুলার রোড অতিক্রম করিয়া হ্যারিসন রোডের দিকে আসিতেছে। বুঝিতে পারিলাম তখন কোন ট্রেন আসিয়াছে, এই ভিড় তাহারই যাত্রীদল। নরনারীগণ রাস্তা পার হইতেছে, তাহাদের সকলের মুখে ভীত ও সতর্কদৃষ্টি, কারণ চতুর্দ্দিকে ট্রাম, বাস, লরী, মোটর অবিরত যাতায়াত করিতেছে। ইহাদের মধ্যে একটি রমণীর ক্রোড়ে একটি ঘুমন্ত শিশু আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। মাতার ভীতিবিহ্বল দৃষ্টি, সতক পদবিক্ষেপ, কিন্তু ক্রোড়ে নিশ্চিন্তমনে শিশু শয়ন করিয়া আছে, মুখে ভীতি অথবা চিন্তাব লেশমাত্র চিহ্ন নাই, অপূর্ব্ব প্রসন্নতা সমস্ত ক্ষুদ্র দেহটিকে পরিব্যাপ্ত করিয়া বিরাজ করিতেছে। শিশু জানে সে মাতৃক্রোড়ে শায়িত, মাতৃবক্ষ নিরাপদ, সব ভয় হইতেই সেখানে রক্ষা পাওয়া যায়। এই বিশ্বাসই ভক্তের আশা ও লক্ষ্য।

৮ই ডিসেম্বর, বেলা প্রায় ১০টার সময় কলেজ যাইতেছি। হ্যারিসন রোডের উপর একটি বিহারী পানের খিলি বিক্রেতার দোকানের নিকট পৌছিয়াছি, এমন সময়ে শুনিতে পাইলাম সে তাহার কোন ক্রেতাকে কথাপ্রসঙ্গে বলিতেছে—"আদমিসে বড়কে দুনিয়ামে কোই চিজ নেহি

হায়।” অর্থাৎ চণ্ডীদাসের সেই অমর বাণী—“সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।” মনে মনে ভাবিলাম একজন নিরক্ষর পান ব্যবসায়ীও এমন অমূল্য কথা কত সহজ ও সরলভাবে ব্যক্ত করিতে পারে। ইউরোপের কোনও দেশে এই শ্রেণীর লোকের মুখ হইতে এরূপ কথা বাহির হওয়া অসম্ভব। কলেজে যাইয়া ঘটনাটি সহকর্ম্মী অধ্যাপকদের শুনাইলাম।

(৬২)

১২ই ডিসেম্বর, ২৬শে অগ্রহায়ণ অমাবস্যা, রাত্রি ৯টা। আজ সমস্ত দিন মেঘ করিয়া আছে, ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছে, মধ্যে মধ্যে অল্প অল্প বৃষ্টি হইতেছে। আমি ও আরতি সকাল সকাল খাইয়া শুইয়া পড়িয়াছি। লেপের ভিতর শুইয়া বই পড়িতেছি, আবদ্ধ ঘরের মধ্যেও যথেষ্ট ঠাণ্ডা। সন্ধ্যা হইতেই রাস্তায় লোক চলাচল বিরল হইয়াছে। রাত্রি ৯টার সময় আমাদের বাড়ীর সম্মুখের রাস্তায় একজন চানাচুরওয়ালা “চাই চানাচুর” বলিয়া যাইতেছে আমি শুনিতে পাইলাম। গলার ধ্বনি স্বাভাবিক মনে হইল না বলিয়া আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। উদরের তাড়নায় এই দুরন্ত শীতে সে সামান্য চানাচুর বিক্রয় করিয়া বেড়াইতেছে,—গলার স্বর যেন চাপা ক্রন্দনধ্বনি। “চাই চানাচুর” শব্দ দূর হইতে দূরে মিশাইয়া যাইল, আমি বই বন্ধ করিলাম, নানা চিন্তা মনে উদিত হইতে লাগিল। হয়ত ইহার স্ত্রীপুত্রকন্যা আছে, সংসারে অনটন, কত দুঃখে শীত সহ্য করিয়া আজ মেঘ-ঢাকা আকাশের নীচে জনবিরল রাস্তায় সামান্য কিছু অর্থোপার্জ্জনের আশায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আজ আমার বড়ই লজ্জা হইল। আমি অবিরত “দেহি দেহি” করিয়া দেবীর নিকট প্রার্থনা করিতেছি, মনের মত কিছু না পাইলে অভিযোগ করিতেছি, একবার

ভাবিয়া দেখি না বিশ্বজননীর এইরূপ চানাচুরওয়ালার মত কত দীনদরিদ্র সন্তান আছে, তাহাদের অন্নবস্ত্রের সংস্থান নাই, তাহারা হয়ত কোনও অভিযোগ করে না, বিধাতার বিধানকে নিজ কর্ম্মফল বলিয়া নীরবে সহ্য করিয়া থাকে। ভগবানের দয়ায় আমি আজ পথপ্লাবিনী এই "চাই চানাচুর" ধ্বনির অর্থ বুঝিতে পারিলাম। এই পথের ধারের বাড়ীগুলিতে বিধাতার কত বিদ্বান ও অর্থবান সন্তান বাস করেন, তাঁহাদের মনে হয়ত এই ধ্বনি কোন প্রতিধ্বনির সৃষ্টি করিল না, দেবীর ইহাও দয়া যে আমি ইহা বুঝিতে পারিলাম এবং শব্দের পশ্চাতে যে অনটনের সংসার রহিয়াছে তাহার সুস্পষ্ট চিত্র দেখিতে পাইলাম। আমি বুঝিতে পারি কিন্তু দুর্ব্বলচিত্ত বলিয়া এই জ্ঞান কার্য্যে পরিণত করিতে পারি না। চক্ষে জল আসিল, দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া এই সংসারভারক্লিষ্ট জীবকে ভাই বলিয়া বক্ষে গ্রহণ করিলাম।

২৩শে ডিসেম্বর। আজ সার্পেণ্টাইন লেনে তারাপদদের বাড়ীতে আমার ও আরতির মধ্যাহ্নভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল। কিছুদিন হইতে অন্নপূর্ণা ও জ্যোৎস্না আরতিকে তাহাদের বাড়ীতে লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু কোন না কোন কারণের জন্য এই নিমন্ত্রণ কার্য্যে পরিণত হয় নাই। পূর্ব্বদিন স্থির হইল এখন কলেজের বড়দিনের ছুটি, আমার অবসর আছে, সুতরাং আজ ১০॥টা হইতে ১১টার মধ্যে তারাপদদের মোটরগাড়ি আসিয়া আমাদের লইয়া যাইবে এবং আহারাদির পর যথা-সময়ে বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিবে। সময়মত কাজ করা আমার চিরদিনের অভ্যাস, সুতরাং পাছে মোটরগাড়ি আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকে এই ভাবিয়া ১০—১৫ মিনিটের মধ্যে আমি স্নান করিয়া প্রস্তুত হইলাম, আরতি বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া বাহিরের ঘরে আসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। ১১টা বাজিয়া গেল গাড়ি আসিল না সুতরাং আমাদের উনানে তাড়াতাড়ি

আগুণ দেওয়া হইল এবং খিচুড়ি ও কপিভাজা রাঁধার ব্যবস্থা হইল। বেলা প্রায় ১২টার সময় তারাপদর ভাই বিশ্বনাথ আসিয়া বলিল "মোটর চালক সকাল ৯টার সময় পেট্রোল কিনিতে বাহির হইয়াছে ১১টা পর্য্যন্ত সে ফিরিয়া আসে নাই, তাই আমি আসিলাম।" এই মোটর চালক স্বভাবতঃই অলস এবং কাজে ফাঁকি দেওয়া তাহার অভ্যাস। বিশ্বনাথের সময়মত অন্য গাড়ি আনা উচিত ছিল, তাহা আনে নাই, অথচ আজকাল ট্রামে বাসে মেয়েদের উঠা অসম্ভব, আমি নিজেই সাধারণতঃ হাঁটিয়া অথবা রিক্সা করিয়া কলেজে যাই। ইহা ব্যতীত তখন আমাদের খিচুড়ি প্রায় প্রস্তুত, সেই অন্ন পরিত্যাগ করিয়া আমি নিমন্ত্রণ খাইতে যাইলাম না। বিশ্বনাথ দুঃখিত হইল কিন্তু তাহাদের অব্যবস্থা দেখিয়া আমিও যুগপৎ বিস্মিত ও দুঃখিত হইলাম। আমার তখন অত্যন্ত ক্ষুধা পাইয়াছে দেখিয়া আরতি অতি দ্রুতগতিতে রন্ধনকার্য্য শেষ করিল। বেলা ১২—৩০ মিনিটের সময় আহারাদি শেষ করিয়া আমি বাহিরের ঘরে আসিয়া বসিলাম। আরতি আজকাল খুব কর্ম্মকুশল হইয়াছে দেখিয়া আমি আনন্দিত হইলাম।

(৬৪)

৩১শে ডিসেম্বর, বুধবার। আজ বিছানা হইতে উঠিতে একটু দেরী হইয়া গেল। মুখহাত ধুইয়া গীতাপাঠ করিয়া ৭টার সময় অনিলকে পড়াইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। অনিল প্রায়ই সময়মত আসে না, অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর ৭॥০টার পর অনিল পড়িতে আসিল। অনিলকে পড়াইয়া স্নান আহার সারিয়া বেলা ১১॥০টার সময় সার্পেণ্টাইন লেনে পড়াইতে যাইলাম। জ্যোৎস্না পড়িল, তাহার পর অন্নপূর্ণা। বাড়ী ফিরিতে প্রায় ৩টা। রাস্তাঘাটে ট্রামেবাসে বড়ই ভিড়—আজ বর্ষশেষের

ছুটির দিন বলিয়া দলে দলে নরনারী বেড়াইতেছে দেখিতে পাইলাম। বেলা ৩৷৹টার সময় অচিন্ত্য পড়িতে আসিল। অচিন্ত্য ঠিক সময়মতই আসে। ৫টার সময় অচিন্ত্য চলিয়া যাইলে ৫৷৹টার সময় জামাজুতা পরিয়া ইংরাজি থিয়েটার দেখিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। শ্রীযুক্ত কালীকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমার প্রতিবাসী; তিনি হাইকোর্টে চাকুরী করেন এবং কলেজের পাঠ্যপুস্তকের অর্থপুস্তকও লিখিয়া থাকেন। সম্প্রতি একদল ইংরাজ নরনারী St. Xaviers কলেজের ভিতরে সেক্ষপীয়রের নাটকগুলি অভিনয় করিতেছেন। কালীবাবু পূর্ব্ব হইতেই আমাদের উভয়ের টিকিট কিনিয়া রাখিয়াছিলেন, আমরা সন্ধ্যা ৫৷৹টার সময় সেই অভিনয় দেখিতে যাইলাম।

সন্ধ্যা ৬৷৹টায় Othello-র অভিনয় আরম্ভ হইল। Iago-র চরিত্রের অভিনয় করিলেন Peter Meriton নামে জনৈক সুদক্ষ ইংরাজ, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা ভাল লাগিল Geoffrey Kendal-র Othello-র অভিনয়। অতি নিপুণভাবে উভয়েই অভিনয় করিলেন, নাটকের বিশেষ বিশেষ স্থানগুলি চক্ষের সম্মুখে যেন বিশদভাবে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। Desdemona সাজিয়াছিলেন Laura Liddel, Emilia-র অংশ লইয়াছিলেন Eileen Garner—ইঁহারাও ভালই করিলেন। উৎপল দত্ত নামক জনৈক বাঙ্গালী যুবক Roderigo-র অভিনয় করিলেন। মোটের উপর সমস্ত নাটকটিই সুষ্ঠুরূপে অভিনীত হইল। বাড়ী ফিরিলাম রাত্রি ১০টা। আরতি খাইয়া লইয়াছিল, আমি আহার করিয়া শয়ন করিতে প্রায় ১১৷৹টা বাজিল। ১৯৪৭ সাল নানাবিধ কর্ম্ম ও আনন্দের ভিতর দিয়াই পরিসমাপ্ত হইল।

নির্ঘণ্ট